ISSN-1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪৩
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১৫

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪৩

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১৫

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
web : www.ilrcbd.org

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
MSA 11051
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:
পল্টন শাখা, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ : ল' রিসার্চ সেন্টার

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

সূচিপত্র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সম্পাদকীয়

দীর্ঘ প্রায় এক যুগ যাবৎ বাংলাভাষী গবেষকগণের গবেষণাকর্ম প্রকাশ করে আসছে ত্রৈমাসিক "ইসলামী আইন ও বিচার" জার্নাল। এরই ধারাবাহিকতায় জার্নালটির ১১শ বর্ষ, ৪৩তম সংখ্যা প্রকাশ পাচ্ছে। দেশের প্রথিতযশা পাঁচজন গবেষকের পাঁচটি প্রবন্ধ ও একটি বুক রিভিউ এ সংখ্যায় প্রকাশিত হলো। এ সংখ্যাটির প্রবন্ধসমূহে অর্থনীতি, ব্যাংকিং বিষয়ক আলোচনার পাশাপাশি রয়েছে রাজনীতি ও আইন বিষয়ক তাত্ত্বিক আলোচনা, মানব পাচারের মত সাম্প্রতিক আলোচিত বিষয় এবং নবজাতকের নামকরণের মত জীবন-ঘনিষ্ঠ বিষয়। এ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের পাশাপাশি দীর্ঘ বুক রিভিউটি পাঠকের বাড়তি আগ্রহ সৃষ্টি করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ইসলামী আইন-গবেষণার জগতে বর্তমানে সর্বাধিক আলোচিত বিষয়সমূহের অন্যতম হচ্ছে মাকাসিদুশ শরী'আহ্। শরী'আহ্র দর্শনতাত্ত্বিক দিকটিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এ বিষয়টি উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা তথা ইজতিহাদের জন্য খুবই জরুরী বিষয়। ইসলামী আইন-গবেষণার তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে পৃথক শাস্ত্রহিসেবে মাকাসিদুশ শরী'আহ্ কয়েকশ বছর পূর্ব থেকেই চর্চিত হলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এর পদচারণা বেড়েছে বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে এসে। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে মিসরে প্রাথমিকভাবে এবং সত্তরের দশকের মাঝামাঝি দোহায় বাণিজ্যিকভাবে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এর ফলে ব্যাংকিং ক্ষেত্রে শরী'আহ্ প্রতিপালনে বাধা চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণের জন্য গবেষণা অব্যাহত থাকে। সেসব গবেষণার ক্ষেত্রেই মাকাসিদুশ শরী'আহ্ এক অনন্য ভূমিকা পালন করে। আশির দশকে বাংলাদেশে চালু হওয়া শরী'আহ্ ভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার কার্যক্রম মাকাসিদুশ শরী'আহ্র আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে "'মাকাসিদুশ শরী'আহ'-এর আলোকে ব্যাংকিং : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে শরী'আহ্র উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হচ্ছে তার একটি প্রাথমিক অথচ তথ্যবহুল চিত্র পাঠকগণের সামনে উপস্থাপন করবে।

ইসলামী আইন ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে মুসলিমদের মনে কোন প্রশ্ন না থাকলেও কিছু অমুসলিম প্রাচ্যবিদ এবং পাশ্চাত্যের গবেষক প্রায়শই এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন এবং প্রশ্ন তোলেন। তেমনি একটি প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামী আইন কি রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত? প্রবন্ধকার এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন "ইসলামী আইনে রোমান আইনের প্রভাব : একটি বিশ্লেষণ" প্রবন্ধে। লেখক প্রবন্ধটিতে প্রাচ্যবিদদের দাবী

উত্থাপন করে ঐতিহাসিকভাবে বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামী আইন রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত এ দাবী যথার্থ ও প্রামাণ্য নয়। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামী আইনব্যবস্থা স্বয়ংসম্পূর্ণ আইনব্যবস্থা। ইসলামী আইন অন্য কোন আইনব্যবস্থা বা সভ্যতা থেকে কোন কিছু গ্রহণের মুখাপেক্ষী নয়। কুরআন-সুন্নাহ্ ও ইজতিহাদ ভিত্তিক এ আইনব্যবস্থার সাথে রোমান আইন বা অন্য কোন আইন ব্যবস্থার কোন মিল বা সাদৃশ্য পাওয়া গেলে তা একান্তই কাকতালীয়।

ইসলামে মানবশিশুর নামকরণ ধর্মীয় ও সামাজিক উভয় দিক দিয়েই যথেষ্ট গুরুত্ববহ। কিন্তু যথাযথ জ্ঞান ও বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে না পারায় মুসলিম সমাজে শিশুর নামকরণে ইসলামী ভাবধারা প্রতিফলিত হচ্ছে না। ফলে মুসলিম পরিচিতির স্বকীয়তা ব্যাহত হচ্ছে। নব্বই শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার একটি বড় ক্ষেত্র হচ্ছে পরিবার। আর ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম প্রাথমিক ধাপ হচ্ছে শিশুর নামকরণ। ইসলামে নামকরণের গুরুত্ব, পদ্ধতি, এক্ষেত্রে করণীয় ও বর্জনীয়সহ বিভিন্ন জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়ের অবতারণা ঘটেছে "ইসলামে নবজাতকের নামকরণ সংশ্লিষ্ট বিধান ও বাংলাদেশে মুসলিম সমাজে এর অনুশীলনের ধারা : একটি বিশ্লেষণ" শীর্ষক প্রবন্ধে। এ প্রবন্ধটি নামকরণের ক্ষেত্রে ইসলামী নির্দেশনা জানতে সহায়তা করবে।

রাজনীতি মানবজীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত একটি বিষয়। বর্তমান বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই রাজনীতিতে ধর্মের উপস্থিতি বিশেষ করে ইসলাম-এর উপস্থিতি থাকবে কি থাকবে না- তা বহুল বিতর্কপূর্ণ বিষয়। মুসলিমদের রাজনীতিকে ইসলামহীন করা কিংবা ইসলামকে রাজনীতিহীন করার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। ইসলাম যেহেতু একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা সেহেতু মানব জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিকগুলোতে যেমন ইসলামী নির্দেশনা রয়েছে তেমনি রাজনীতির ক্ষেত্রেও ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে বলে মুসলিমরা বিশ্বাস করেন। তবে রাজনীতির সাথে ইসলামের সম্পর্ক কেমন এবং কতটুকু- তা গভীর গবেষণার বিষয়। "রাজনীতি : ইসলামী দৃষ্টিকোণ" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক এ দিকটির প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি ইসলামের সাথে রাজনীতির সম্পর্ক কেমন? ইসলামে রাজনীতির গুরুত্ব-প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়াবলি কুরআন, সুন্নাহ্ ও মনীষীবৃন্দের উদ্ধৃতির মাধ্যমে প্রামাণ্য করে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। প্রবন্ধটি রাজনীতি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে এবং প্রচলিত অনেক বিভ্রান্তি নিরসনে সহায়তা করবে বলে আমরা মনে করি।

বর্তমান পৃথিবীতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে যে কয়টি অপরাধ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে সেগুলোর মধ্যে মানব পাচার অন্যতম। সাম্প্রতিক সময়ে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়াসহ কয়েকটি দেশে বাংলাদেশিসহ বেশ কিছু নাগরিকের

গণকরব আবিষ্কার, সমুদ্রে ডুবে মৃত্যুবরণ ও মানবেতর জীবন যাপনের চিত্র গণমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পরে প্রসঙ্গটি আলোচনায় আসে। মানব পাচার শুধু বাংলাদেশ বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ারই সমস্যা নয়, এটি এখন একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানে বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে "মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন" আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু আইনটির যথাযথ প্রয়োগ না হওয়া এবং সরকারের নেয়া কঠোর পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়িত না হওয়ায় মানব পাচার হ্রাস পাচ্ছে না। এই প্রেক্ষিতে "মানব পাচার প্রতিরোধে প্রচলিত আইন ও ইসলাম : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রবন্ধটিতে লেখক সমস্যাটি সমাধানে প্রচলিত আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়নের সুপারিশ করেছেন। এছাড়াও তিনি এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। মানব পাচারের বিরূদ্ধে জনমত তৈরিতে এবং সাধারণ জনগণ ও নীতিনির্ধারকদের সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধিতে এ প্রবন্ধটি বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোস্থ ডি'পল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ল'-এর প্রফেসর এ্যামেরিটাস এম. শরীফ বাসিউনি প্রণীত এবং ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত সাড়া জাগানিয়া গ্রন্থ The Sharia and Islamic Criminal Justice in Time of War and Peace-এর পর্যালোচনা ছাপা হয়েছে। জনাব মুহাম্মদ রাশেদ কৃত এ বুক রিভিউটি ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের বর্তমান সংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। বুক রিভিউটি পাঠান্তে পাঠক একদিকে যেমন সুবৃহৎ এ গ্রন্থটি সম্পর্কে ধারণা পাবেন অপরদিকে একজন মিসরীয়-আমেরিকান মুসলিম গবেষকের দৃষ্টিতে শান্তি ও সংঘাতে শরী'আহ্ এবং ইসলামী দণ্ডবিধির ভূমিকা সম্পর্কে বিশ্লেষণ জানতে পারবেন, যা আজকের সংঘাতময় পৃথিবীতে ইসলামের ভূমিকাকে উপস্থাপন করেছে।

সর্বশেষে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট উত্তম প্রতিদান কামনা করছি। সাথে সাথে আল্লাহর তা'আলার কাছে ভুল-ভ্রান্তি মার্জনা করে আমাদের এ কর্মটি কবুল করার দু'আ করছি। আশা করছি সম্মানিত পাঠকবর্গ বরাবরের মত এ সংখ্যাটিও সাদরে গ্রহণ করবেন।

– ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১, সংখ্যা : ৪৩
জুলাই - সেপ্টেম্বর : ২০১৫

'মাকাসিদুশ শরী'আহ'-এর আলোকে ব্যাংকিং : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান*

[**সার-সংক্ষেপ:** *ইসলামী আইন সংকলনের বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন নামে মাকাসিদুশ শরী'আহকে ব্যক্ত করা হয়েছে, যেমন হিকমাহ, সবাব, ইল্লাহ ইত্যাদি। বর্তমানে পরিভাষাটি স্বনামেই প্রসিদ্ধ। শরী'আত প্রণেতা মানবতার সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি বিধানের পিছনে নানামুখি উদ্দেশ্য গ্রহণ করেছেন। শরী'আহ ভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা যে নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত তার পিছনেও শরী'আতের উদ্দেশ্য বিদ্যমান। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ মাকাসিদুশ শরী'আহর আলোকে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম মূল্যায়নের প্রয়াস। প্রবন্ধটি বর্ণনামূলক ও প্রায়োগিক পদ্ধতিতে রচিত। এতে প্রায়োগিক তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং এবং বিশেষভাবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। মাকাসিদুশ শরী'আহর আলোকে বর্তমান ব্যাংকিং কার্যক্রমের অবস্থা, ঘাটতি, করণীয় ও আনুষাঙ্গিক বিষয়সমূহের পর্যালোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।*]

ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য হলো আর্থিক ক্ষেত্রে মাকাসিদুশ শরী'আহ বাস্তবায়ন। ইসলামী ব্যাংক ইসলামী অর্থনীতির একটি প্রায়োগিক ক্ষেত্র। ব্যাংকিং-এ শরী'আহর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ইসলামী ব্যাংকিং-এর মূল উদ্দেশ্য। গত তিন দশকে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং 'পদ্ধতিগত' সফলতা প্রমাণ করেছে। এই সাফল্যের পথ ধরে দেশের সার্বিক ব্যাংকিং কারবারের এক চতুর্থাংশ এবং বেসরকারি ব্যাংকিং-এর এক তৃতীয়াংশ ইসলামী পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। দেশের ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রবৃদ্ধি সাবেকি ধারার ব্যাংকিং-এর চেয়ে বেশি।

এই পটভূমিতে মাকাসিদুশ শরী'আহর আলোকে 'উদ্দেশ্যগত সাফল্য' অর্জনে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং কতটা সফল হয়েছে তার মূল্যায়ন করা সময়ের দাবি। প্রবন্ধটি মাকাসিদুশ শরী'আহর আলোকে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম মূল্যায়নের একটি প্রাথমিক ও সীমিত উদ্যোগ। এই মূল্যায়নের শুরুতে মাকাসিদুশ শরী'আহ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

* ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

মাকাসিদুশ শরী'আহ (مقاصد الشريعة)

'মাকসাদ' শব্দটি বাংলাভাষায় সুপরিচিত। এটি মূলত আরবী শব্দ। এর বহুবচন 'মাকাসিদ'। শাব্দিকভাবে 'মাকসাদ' বা 'মাকসিদ' মানে কোনো কিছুর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, ইচ্ছা, হেতু বা তাৎপর্য এবং শরী'আহ অর্থ পথ, নিয়মনীতি। পরিভাষায় মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে বিধি-বিধান জারী করেছেন তাকে শরী'আহ বলা হয়। অতএব শরী'আহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই মাকাসিদুশ শরী'আহ।

ইমাম গাযালী [১০৫৮-১১১১খ্রি.] বলেন, মূলগতভাবে মাকাসিদুশ শরী'আহর সম্পর্ক কল্যাণের সাথে। যা কিছুর দ্বারা মানুষের বিশ্বাস, জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি, বংশধারা ও সম্পদের সুরক্ষা হয় তা-ই মাসলাহা বা কল্যাণ। এ নিরিখে কল্যাণকর সবকিছুর সহায়তা করা এবং যাবতীয় অকল্যাণ দূর করাই মাকাসিদুশ শরী'আহ ।[১]

ইমাম শাতিবী [মৃ. ১৩৮৮খ্রি.] বলেন, বহু ক্ষেত্রে মানুষ বাধ্য হয়ে আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়ম ও বিধানের অনুসরণ ও আনুগত্য করে থাকে। জীবনের অন্য সব ক্ষেত্রেও তাকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের অনুগামী করা শরী'আহর উদ্দেশ্য।[২]

ইবনে আশূর [১৮৭৯-১৯৭৩খ্রি.]-এর মতে, ইসলামী শরী'আহর উদ্দেশ্য হলো মানব জাতির কল্যাণ। আর কল্যাণ সাধিত হয় মানুষের বিবেক-বুদ্ধির সুস্থতা, কর্মের যথার্থতা ও জীবনোপকরণের উৎকর্ষের দ্বারা।[৩]

বর্তমান শতকের চিন্তানায়ক ড. ইউসুফ আল-কারযাভী [জ. ১৯২৬খ্রি.] মাকাসিদুশ শরী'আহকে আরো সরলভাবে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেনঃ শরী'আহর লক্ষ্য হলো কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং অকল্যাণ দূর করা।[৪]

এই মতের সমর্থনে প্রফেসর ড. মুহাম্মদ সাদ আল ইউবী[৫] বলেন : মানুষের কল্যাণের জন্য যে সব উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, তাৎপর্য ও কৌশলের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে তা-ই মাকাসিদুশ শরী'আহ।[৬]

---

১. আবু হামিদ আল-গাযালী, *আল-মুস্তাসফা মিন ইলম আল-উসূল*, কায়রো : আল-মাকতাবাহ আল-তিজারিয়্যাহ, ১৯৭৩, খ. ১, পৃ. ১৩৯-১৪০

২. আশ-শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত*, কায়রো : দারুল হাদীস, ২০০৬, পৃ. ৩৭৯

৩. মুহাম্মদ আত-তাহির ইবনে আশূর, *ট্রিটিজ অন মাকাসিদ আল-শরী'আহ*, ওয়াশিংটন : দি ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০৬, পৃ. ৯১

৪. ইউসুফ আল কারাযাভী, *ফিকহুয-যাকাত*, বৈরূত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০০, খ. ১, পৃ. ৩১

৫. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ সা'দ বিন আহমদ বিন মাস'উদ আল-ইউবী একজন সমসাময়িক মাকাসিদ গবেষক। বর্তমানে তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আহ অনুষদের একজন ফ্যাকাল্টি হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

৬. মুহাম্মদ সা'দ আল-ইউবী, *মাকাদিসুশ শরী'আহ আল-ইসলামিয়্যাহ ওয়া 'আলাকাতুহা বিল আদিল্লাতিশ শার'ঈয়্যাহ*, রিয়াদ : দারুল হিজরাত, ১৯৯৮খ্রি., পৃ. ৩৭

মাকাসিদ (مقاصد) ও মাসলাহা (مصلحة)

মাকাসিদ আলোচনায় 'মাসলাহা' পরিভাষাটিও গুরুত্ব পেয়েছে। আরবী 'মাসলাহা' শব্দের অর্থ জনকল্যাণ। এর বহুবচন 'মাসালিহ্'। 'মাসলাহা' বা জনকল্যাণের পরিপন্থী সকল ক্ষতিকর উপাদান এক কথায় 'মাফসাদা' (مفسدة)। সকল কাজে 'মাসলাহা' বা জনকল্যাণ অন্বেষণ করা এবং 'মাফসাদা' বা অকল্যাণ দূর করা মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ইমাম গাযালীর শিক্ষক ইমামুল হারামাইন আল-জুয়াইনীর [১০২৮-১০৮৫খ্রি.] মতে, মাকাসিদুশ শরী'আহ্ ও মাসালিহ্ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত ও পরিপূরক।[৭] ইমাম গাযালী মনে করেন, বিশ্বাস, জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি, বংশধারা ও সম্পদ সুরক্ষার সব কাজই মাসালিহ্ বা জনকল্যাণ।[৮]

তেরো শতকের ইমাম আল-কারাফী [১২২৮-১২৮৫খ্রি.] মাকাসিদুশ শরী'আহ ও মাসালিহকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত মনে করেন। তাঁর মতে, এই দুটি বিষয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে অভিন্ন বা সমার্থক। মানুষের সকল উদ্দেশ্য হতে হবে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা ও অকল্যাণ দূর করার জন্য। এ দু'য়ের কোনো একটিও পূরণ না হলে উদ্দেশ্যটি শরী'আহ্ সম্মত হবে না। কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ নিরসনের দুই উদ্দেশ্য এক সাথে সম্পন্ন করা অতি উত্তম। একই সাথে দু'টি কর্তব্য সম্পাদন সম্ভব না হলে অন্ত ত যে কোনো একটি উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্য অবশ্যই থাকতে হবে। অন্যথায় সে উদ্দেশ্য শরী'আহ্ সম্মত হবে না।[৯]

মাকাসিদ তত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ

আল-কুরআনের নানা স্থানে নানাভাবে মাকাসিদুশ শরী'আহ্ উল্লেখ রয়েছে। ইমাম শাতিবী তার 'আল-মুওয়াফাকাত ফি উসূলিশ শরী'আহ' নামক গ্রন্থের সূচনাতে মাকাসিদ অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ায় রাসূল পাঠিয়েছেন। তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾

আমি কল্যাণের সুসংবাদ ঘোষণাকারী এবং সতর্ককারীরূপে রাসূল পাঠিয়েছি, যেনো তাদের আগমনের পর আল্লাহর সামনে মানুষের কোনো অজুহাত তোলার সুযোগ না থাকে।[১০]

---

৭ আবুল মা'আলী আব্দুল মালিক আল-জুয়াইনী, *আল-বুরহান ফী উসূলিল ফিক্হ*, খ. ২, পৃ. ৯১৫

৮. আবু হামিদ আল-গাযালী, *আল-মুস্তাসফা*, পৃ. ২৫১

৯. আবুল 'আব্বাস আহমাদ আল-কারাফী, *আল-ফুরূক*, খ. ১, পৃ. ১১৮ ও খ. ২, পৃ. ৩২

১০. আল-কুরআন, ৪ : ১৬৫

একইভাবে শেষ নবী সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾

আমি আপনাকে পাঠিয়েছি বিশ্ববাসীর জন্য করুণার আধাররূপে।[১১]

মানুষ ও জিন সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ﴾

আমি জিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছি এই উদ্দেশ্যে যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে।[১২]

জীবন ও মৃত্যুর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾

তিনি (আল্লাহ) মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে দায়িত্ব পালনে কে উত্তম তা পরীক্ষা করার জন্য।[১৩]

শরী'আহর বিধানসমূহের উদ্দেশ্য কী? এ সম্পর্কে কুরআন বলছে,

﴿مَايُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে চান না। তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান আর তোমাদের ওপর তার নেয়ামত পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।[১৪]

সলাতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে,

﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

নিশ্চয় সলাত অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।[১৫]

সিয়ামের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা তাকওয়ার গুণ অর্জন করতে পারো।[১৬]

তেমনি কিসাসের শাস্তি বিধান সম্পর্কে বলা হয়েছে,

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾

তোমাদের জন্য কিসাসে রয়েছে জীবন।[১৭]

---

১১. আল-কুরআন, ২১ : ১০৭
১২. আল-কুরআন, ৫১ : ৫৬
১৩. আল-কুরআন, ৬৭ : ২
১৪. আল-কুরআন, ০৫ : ০৬
১৫. আল-কুরআন, ২৯ : ৪৫
১৬. আল-কুরআন, ২ : ১৮৩
১৭. আল-কুরআন, ২ : ১৭৯

রাসূলুল্লাহ স. এবং তার সাহাবী ও তাবিয়ীগণের কার্যক্রমে মাকাসিদুশ শরী'আহর বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। প্রাথমিক যুগের আলিমগণ মাকাসিদুশ শরী'আহর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। হিকমত বা প্রজ্ঞা, ইল্লত বা কার্যকারণ, মাসালিহ্ বা কল্যাণ, মাফাসিদ বা অকল্যাণ বিষয়ে তখনকার বিভিন্ন গ্রন্থে কিয়াস, ইসতিহ্সান, মাসলাহা ইত্যাদি পরিভাষায় ব্যবহার করা হয়েছে।

ইসলামী শরী'আহ্র বিধিবিধানের উদ্দেশ্য বুঝাতে 'মাকাসিদ' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন তাবিয়ী যুগের চিন্তাবিদ আল-হাকিম আত-তিরমিযী (মৃ. ২৯৬ হি./৯০৮খ্রি.)। দশম শতকের আবু যায়েদ আল-বালখী (মৃ. ৯৩৩ খ্রি.) মুয়ামালাহ্ বা আচরণ বিষয়ে শরী'আহ্র উদ্দেশ্য (Maqasid of Dealings) আলোচনা করেন। তার সমসাময়িক ইবনে বাবাউয়্যাহ্ আল-কুম্মী (মৃ. ৯৯১ খ্রি.) শর'য়ী বিধানের হেতুবাদ বা মাকাসিদ নিয়ে আলোচনা করেন। একই সময়ে মুহাম্মদ ইবনু ইউসূফ আল-আমিরী আল-ফাইলাছুফ (মৃ. ৯৯১ খ্রি.) শর'য়ী বিধানের উদ্দেশ্যের স্তরবিন্যাসের উদ্যোগ নেন।[১৮]

মাকাসিদ বিষয়ক আলোচনা কাঠামোগতভাবে দশম শতক পর্যন্ত ছিলো প্রাথমিক পর্যায়ে। পরবর্তী তিনশো বছরে বিষয়টি কাঠামোগত রূপ পায়। চৌদ্দ শতক নাগাদ এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ উসূল বা নীতিশাস্ত্র তৈরি হয়। এই সময়ে বেশ ক-জন মনীষী মাকাসিদের তাত্ত্বিক ভিত্তি ও কাঠামো নির্মাণে অবদান রাখেন :

একাদশ শতকের মনীষী আল-জুয়াইনী মাকাসিদের আলোকে মানুষের চাহিদাকে পাঁচ স্তরে বিন্যাস করেন। সেগুলি হলো : ১. অপরিহার্য প্রয়োজন, ২. সাধারণ প্রয়োজন, ৩. নৈতিক আচরণ, ৪. সাধারণ অনুমোদন এবং ৫. এমন প্রয়োজন যা নির্দিষ্টভাবে বিন্যাস করা যায় না। জুয়াইনীর মতে, ঈমান, জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি, বংশধারা ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা শরী'আহ্র উদ্দেশ্য বা মাকাসিদ। তাঁর স্তর বিন্যাস 'প্রয়োজনীয়তা স্তর তত্ত্ব' (Theory of levels of necessities) নামে পরিচিত। এই বিন্যাসের আলোকে তার ছাত্র ইমাম গাযালী শরী'আহ্র উদ্দেশ্যকে পাঁচ স্তরে বিন্যস্ত করেন। গাযালী তার স্তর বিন্যাসে বিশ্বাস, জীবন, বিবেক, বংশধারা ও সম্পদ সুরক্ষার কথা বলেন।[১৯]

তেরো শতকের চিন্তাবিদ আল-ইয্য বিন আবদুস সালাম (১১৮১-১২৬২ খ্রি.) মাকাসিদুশ শরী'আহর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে নতুন মাত্রা যোগ করেন। তাঁর ছাত্র শিহাব

---

১৮. আহমদ আর-রায়সূনী, *নাজরিয়্যাতুল মাকাসিদ ইনদাল ইমাম আশ-শাতিবী*, ওয়াশিংটন : আইআইআইটি, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৯৫খ্রি., পৃ. ৪০-৪৭

১৯. আল-জুয়াইনী, *আল-বুরহান*, খ. ২, পৃ. ৯২৩; গাযালী, *আল-মুস্তাসফা*, পৃ. ২৫১

উদ্দীন আল-কারাফী রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর সুন্নাহকে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের আলোকে শ্রেণিবদ্ধ করার কথা বলেন।[২০]

চৌদ্দ শতকে শামসুদ্দীন ইবনুল কাইয়িম (১২৯২-১৩৫০ খ্রি.) আর্থিক কারবারে ন্যায়সঙ্গত মূল্য, যুক্তিসম্মত ক্ষতিপূরণ, উপযুক্ত মজুরি ও সঙ্গত মুনাফা বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি একচেটিয়া কারবার বা দুর্বল বাজার ব্যবস্থাপনার প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম-কৌশল নিয়ে কাজ করেন। এই লক্ষ্যে এবং বাজার দর নিয়ন্ত্রণে তিনি তদারককারী প্রতিষ্ঠান 'হিসবাহ্' প্রচলনের প্রস্তাব করেন। তাঁর মতে, শরী'আহ্র উদ্দেশ্য হলো মানুষের জ্ঞানগত উৎকর্ষ সাধন। সার্বিক ন্যায়বিচার, দয়া, সমৃদ্ধি ও জ্ঞানের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত। কোনো সমাজে ন্যায়বিচারের পরিবর্তে যুলুম, দয়ার পরিবর্তে কঠোরতা, কল্যাণের পরিবর্তে কার্পণ্য আর জ্ঞানের স্থলে মূর্খতা প্রবল হলে শরী'আহ্র উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। তিনি শরী'আহ্র উদ্দেশ্যের আলোকে আর্থিকক্ষেত্রে সুবিচার (আদল) এবং জনস্বার্থ (মাসলাহা আল আম্মাহ্) সুরক্ষা করার কথা বলেন। তিনি বলেন, সুবিচার ও জনস্বার্থ বিরোধী সব কিছু থেকে মানুষকে মুক্ত করতে হবে।[২১]

চৌদ্দ শতকের অপর চিন্তানায়ক আবু ইসহাক আশ-শাতিবী মাকাসিদুশ শরী'আহ্র ব্যাখ্যায় জুয়াইনী ও গাযালীর স্তর বিন্যাস সমর্থন করেন। তবে তিনি মাকাসিদ হাসিলের পদ্ধতি ও কর্ম-কৌশল নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করেন। ইমাম শাতিবী পূর্বোক্ত পাঁচটি প্রয়োজনকে তিন স্তরে পুনর্বিন্যাস করেন। সেগুলি হলো ১. জরুরিয়াত, ২. হাজিয়াত ও ৩. তাহসিনিয়াত।[২২]

পরবর্তী যুগে ইজতেহাদের ধারা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আঠারো শতকের শেষ নাগাদ এক্ষেত্রে কার্যত বন্ধ্যাত্ব নেমে আসে। এরপর বিশ শতকে এসে এক্ষেত্রে নব জাগরণের সূচনা হয়। এ শতকের শুরু থেকেই ক-জন মনীষী এ বিষয়ে কাজ করেন। তাদের মধ্যে মুহাম্মদ আল তাহির ইবনে আশূর, রশিদ রিদা (১৮৬৫-১৯৩৫ খ্রি.), মুহাম্মদ আল-গাযালী (১৯১৭-১৯৯৬ খ্রি.), ড. ইউসুফ আল-কারযাভী (জ. ১৯২৬ খ্রি.) ত্বাহা আল-'আওয়ানী (জ. ১৯২৬ খ্রি.) ও ত্বাহা জাবির আল-'আলওয়ানী (জ. ১৯৩৫ খ্রি.) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শাতিবীর মাসলাহা পিরামিড

মাকাসিদুশ শরী'আহর আলোকে মানুষের চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়নে শাতিবীর স্তর বিন্যাস 'মাসলাহা পিরামিড' নামে অধিক পরিচিত হয়েছে। আধুনিক

---

২০. আল-ইয্য বিন আব্দুস সালাম, *কাওয়াঈদুল আহকাম ফী মাসালিহিল আনাম*, খ. ১, পৃ. ৭, ৯, ১৬৭, ১৭৫ ও খ. ২, পৃ. ৬৬, ১২২, ১২৯, ১৬০; কারাফী, *আল-ফুরূক*, খ. ১, পৃ. ১১৮

২১. তাঁর প্রণীত *শিফাউল 'আলীল, মিফতাহু দারিস সা'আদাহ, ইগাছাতুল লাহফান, ই'লামুল মুয়াক্কীয়ীন* গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে তিনি এ ধারণার উল্লেখ করেছেন।

২২. আশ-শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত ফী উসূলিশ শরী'আহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮-

চিন্তাবিদগণ এই কাঠামোটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকিং-এর নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে চাহিদার এই অগ্রাধিকার স্তর বিন্যাসের বিবেচনাটি গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে।

ক) জরুরিয়াত :

ইমাম শাতিবীর মতে জরুরিয়াত হলো সেসব অতি আবশ্যকীয় বিষয়, যা ছাড়া মানব কল্যাণের গতিধারা ব্যাহত হয়। জরুরিয়াত পূরণ না হলে জন-জীবনে বিপর্যয় দেখা দেয়। জরুরিয়াত এমন বিষয় যা মানুষের টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য।[২৩]

জরুরিয়াতের পাঁচ শাখা

ইমাম শাতিবী জরুরিয়াত বা অপরিহার্য চাহিদাকে পাঁচ ভাগ করে তার প্রতিটি প্রয়োজন পূরণ অত্যাবশ্যক কর্তব্য বিবেচনা করেন। সেগুলি হলো : ১. হিফযুদ দ্বীন বা বিশ্বাসের সংরক্ষণ, ২. হিফযুন নাফ্স বা জীবনের সংরক্ষণ, ৩. হিফযুন নাসল বা বংশধারার সংরক্ষণ, ৪. হিফযুল মাল বা সম্পদের সংরক্ষণ এবং ৫. হিফযুল 'আকল বা বুদ্ধিবৃত্তির সংরক্ষণ। তিনি মনে করেন, সকল নাগরিকের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এই পাঁচটি চাহিদা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারমূলক দায়িত্ব। রাষ্ট্র এই দায়িত্ব পালন করবে। এতেই শান্তি, সফলতা ও কল্যাণ এবং আখিরাতের মুক্তি নিহিত।

১. হিফযুন নাফ্স বা জীবন সংরক্ষণ

ইসলামের দৃষ্টিতে নাফ্স বা জীবন আল্লাহর দেয়া মূল্যবান আমানত। এর সংরক্ষণ, সুস্থতা বিধান এবং জীবনের অধিকার যথাযথভাবে পূরণ করা সকল মানুষের কর্তব্য। জীবনের সুরক্ষা ও বিকাশ সাধন করতে হবে এবং সকল প্রকার ক্ষতি ও বিপর্যয় থেকে জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য অন্যায় হস্তক্ষেপ, অবৈধ হত্যাকাণ্ড, আত্মহত্যা, গর্ভপাত ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

২. হিফযুদ দ্বীন বা দ্বীন সংরক্ষণ

দ্বীনের অনুসরণ ছাড়া মানবিক প্রশান্তি, সামাজিক শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। দ্বীন বিবর্জিত সমাজ মানবিকতা ও নৈতিকতা হারিয়ে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। দ্বীন সংরক্ষণের মাধ্যমে মানুষের জীবনকে সহজ করা এবং সরল পথে পরিচালিত করার মাধ্যমে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করা শরী'আহ্র উদ্দেশ্য বা মাকাসিদ। দ্বীন পরিপালন এবং এক্ষেত্রে যাবতীয় সীমালঙ্ঘন, অন্যায় ও যুলুম থেকে দ্বীনি জীবনের সুরক্ষা শরী'আহ্র উদ্দেশ্য।

---

[২৩] আশ-শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১

৩. হিফযুল আকল বা বুদ্ধি-বিবেক সংরক্ষণ

আল্লাহ মানুষকে বুদ্ধি-বিবেক ও ইচ্ছাশক্তি দিয়ে অন্য সব প্রাণীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ফয়সালা করার সামর্থ্য দেয়া হয়েছে। সেই সামর্থ্য কাজে লাগিয়ে তাকে কল্যাণ বৃদ্ধি ও অকল্যাণ দূর করে মাকাসিদুশ শরী'আহ অর্জন করতে হবে। আকল বা বিবেক-বুদ্ধি সঠিকভাবে প্রয়োগ করে মানুষ কল্যাণ লাভ ও অকল্যাণ দূর করার জন্য কাজ করবে। যুক্তিপূর্ণ চিন্তা এবং সত্য উপলব্ধি ছাড়া সাফল্য লাভ সম্ভব নয়।

৪. হিফযুন নাসল বা বংশধারা সংরক্ষণ

মানুষ আল্লাহর খলীফা হিসাবে এ দুনিয়া আবাদ করবে। মানুষের বংশধারা রক্ষার জন্য আল্লাহ তা'আলা নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করেছেন এবং সুস্থ ও পবিত্র জীবনযাপনের জন্য বৈবাহিক সম্পর্কভিত্তিক পারিবারিক ব্যবস্থা দিয়েছেন। এই প্রক্রিয়ায় তাদেরকে সামাজিক শৃঙ্খলাভিত্তিক সুসভ্য উম্মাহ গঠনের সুযোগ দেয়া হয়েছে। মানুষকে বংশধারা সংরক্ষণে সব অনুমোদিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

৫. হিফযুল মাল বা সম্পদের সংরক্ষণ

হিফযুল মাল বা সম্পদ সংরক্ষণ মানুষের একটি অপরিহার্য মৌলিক চাহিদা। এ জন্য ন্যায়-নীতি, নিরাপত্তা ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে সম্পদ অর্জন ও লেনদেনের নিরাপদ উপায় ও ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস ও রাহাজানিসহ অধিকার হরণকারী সকল সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ থেকে সম্পদ রক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। ইমাম শাতিবী সম্পদ সংরক্ষণকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলেছেন। দারিদ্র্য দূর করা এবং ধনীর সম্পদে বঞ্চিত ও অভাবীর অধিকার নিশ্চিত করাও সম্পদ সংরক্ষণের পর্যায়ভুক্ত।

খ) হাজিয়াত :

হাজিয়াত হলো পরিপূরক কল্যাণ। মানব জীবনে কঠোরতা বা সমস্যা ও অসুবিধা দূর করে স্বাচ্ছন্দ্য আনতে যেসব উপকরণ প্রয়োজন সেগুলি হাজিয়াতের পর্যায়ভুক্ত। ফলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রয়োজনগুলির বড় অংশই হাজিয়াতমূলক। রাস্তাঘাট, যানবাহন, খেলার মাঠ, পার্ক ইত্যাদি মানুষের জীবন-যাত্রাকে সহজ ও আরামদায়ক করে। এগুলি মানুষকে কষ্ট ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। হাজিয়াতমূলক চাহিদা পূরণ না হলে জন-জীবন অচল হয় না। তবে এর অভাবে জীবনধারার গতিময়তা ও স্বাচ্ছন্দ্য ব্যাহত হয়। জীবনকে সহজ সুন্দর আরামদায়ক করতে হাজিয়াতের যোগান ও সংরক্ষণ মাকাসিদ শরী'আহ্র দ্বিতীয় অগ্রাধিকার।

গ) তাহসিনিয়াত :

তাহসিনিয়াত মানে সুন্দর ও উত্তম। অপরিহার্য ও পরিপূরক কল্যাণ বা হাজিয়াত অর্জনের পর জীবনকে আরো সুন্দর, পরিপাটি ও অধিকতর সৌন্দর্যমণ্ডিত ও উৎকর্ষমণ্ডিত

করতে যা কিছু দরকার, সেগুলি তাহ্সিনিয়াতের পর্যায়ভুক্ত। তাহ্সিনিয়াত মানুষের রীতি-নীতি ও আচার-আচরণে পরিশুদ্ধতা ও পরিপূর্ণতা আনার সহায়ক। মানুষের জীবনে তাহ্সিনিয়াত সসীম নয়, বরং ব্যাপ্তিশীল। সমাজের মানুষের জরুরী চাহিদা পূরণের পর হাজিয়াতমূলক চাহিদাপূরণ এবং এরপর তাহ্সিনিয়াত পর্যায়ের চাহিদাসমূহ পূরণের দ্বারা সমাজে ক্রমশ কল্যাণ বাড়তে থাকবে।

শাতিবী ও মাসলোর চাহিদা সোপানের তুলনা

শাতিবীর চাহিদা তত্ত্ব আলোচনায় মাসলোর বিবেচনাটি মূল্যায়ন করা যেতে পারে। বিশ শতকের বিখ্যাত মানবতাবাদী মনস্তত্ত্ববিদ আব্রাহাম হ্যারল্ড মাসলোর (১৯০৮-১৯৭০ খ্রি.) 'চাহিদা সোপান তত্ত্ব' (Need Hierarchy) আধুনিক ব্যবস্থাপনায় খ্যাতি পেয়েছে।

মাসলোর মতে, মানুষের পাঁচটি চাহিদা সুনির্দিষ্ট এবং এ ক্ষেত্রে একটি চাহিদা পূরণ হওয়ার পর পরবর্তী ধাপের চাহিদা সৃষ্টি ও তা পূরণের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়। সেগুলি হলো : ১. জৈবিক চাহিদা (Physiological Needs), ২. নিরাপত্তামূলক চাহিদা (Safety & Security Needs), ৩. সামাজিক চাহিদা (Social Needs), ৪. মর্যাদাগত চাহিদা (Self esteem needs) এবং ব্যক্তি পরিপূর্ণতা চাহিদা (Self Actualization Needs)।[২৪]

এসব চাহিদা নিচ থেকে ক্রমশ পিরামিডের মতো পরবর্তী ধাপে ওপরের দিকে যায়। মাসলোর এই চাহিদাতত্ত্ব বিষয়ভিত্তিক (Subjective)। তার এই মডেলে দেখানো চাহিদা পূরণ একান্তভাবে ব্যক্তির স্ব অর্জিত সুযোগ ও সামর্থ্যের ওপর ভিত্তিশীল।

মাসলোর চাহিদা সোপান তত্ত্ব

শাতিবীর মাসলাহা পিরামিড

---
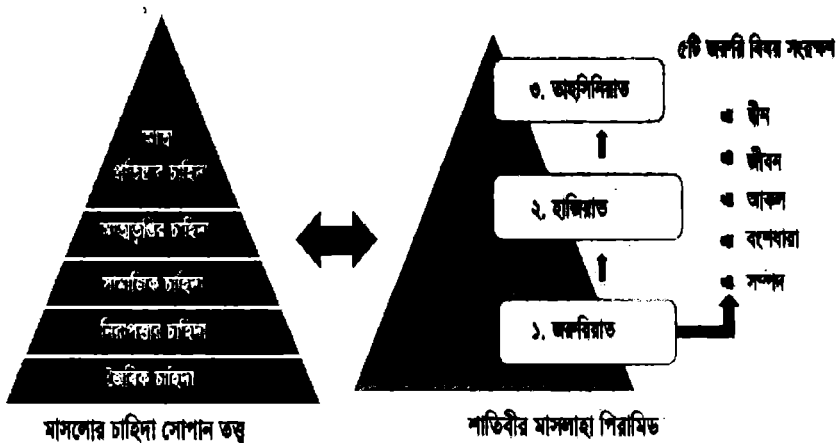
২৪. A.H. Maslow, "A theory of human motivation", *Pyschological Review,* 50 (4) 370–396

মাসলোর চাহিদা সোপান তত্ত্বের বিপরীতে ইমাম শাতিবীর চাহিদা স্তর বিন্যাস বা 'মাসলাহা পিরামিড' সার্বজনীন কল্যাণকেন্দ্রিক এবং ব্যক্তির অভাব বা চাহিদাসমূহ অগ্রাধিকার অনুসারে পূরণের উদ্দেশ্যভিত্তিক (Objective Oriented)। শাতিবীর চাহিদা সোপান অনুযায়ী এসব প্রয়োজন পূরণ ব্যক্তির 'সামর্থ্য'-এর ওপর নির্ভরশীল নয়। বরং তা সর্বজনীন 'প্রয়োজন'-এর ক্রম অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিন্যস্ত। এসব চাহিদা পূরণে সমাজ ও রাষ্ট্রের অনস্বীকার্য দায়িত্ব রয়েছে। শাতিবীর মতে, মানুষের সকল জরুরী প্রয়োজন বা চাহিদা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পূরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সামর্থ্য যার যতো কম, তার প্রতি রাষ্ট্র, সমাজ ও কল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠান ততো বেশি দরদি হয়ে দায়িত্ব পালন করবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী 'মাসলো মডেলে' অনুপস্থিত।

মাসলোর চাহিদা সোপান তত্ত্বে দেখানো হয়েছে, মানুষ তার চাহিদার এক স্তর পূরণ হওয়া মাত্রই অন্য স্তরের চাহিদা পূরণের তাগিদ অনুভব করে। এই মনস্তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে সেই চাহিদা পূরণের প্রেরণা দিয়ে ব্যবস্থাপকগণ কর্মীদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবেন, যা ব্যবস্থাপনার একটা মনস্তাত্ত্বিক কৌশল। মাসলো ব্যক্তির সার্বজনীন মৌলিক অপরিহার্য চাহিদা বা তার কল্যাণ নিয়ে কথা বলেন নি। তার মনস্তত্ত্ব কাজে লাগানোর দিকে নযর দিয়ে তার চাহিদার সোপান আলোচনা করেছেন। কিভাবে এই চাহিদা পূরণ হবে তা এখানে গুরুত্ব পায়নি। অন্য দিকে, শাতিবীর মাসলাহা পিরামিড মানুষের চাহিদা বা প্রয়োজন পূরণের বিস্তৃত ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে। এটি প্রায়োগিক ও মানবিক।

মাকাসিদুশ শরী'আহর আলোকে ইসলামী ব্যাংকিং

ইসলামী ব্যাংকিং একটি আধুনিক কার্যক্রম। প্রাথমিক যুগে এ ধরনের ব্যাংকিং-এর প্রচলন ছিল না। তবে তখনকার যুগের উপযোগী লেনদেন ও অর্থায়ন ছিলো। ব্যাংকিং ও অর্থায়নের ক্ষেত্রে মাকাসিদুশ শরী'আহ মূলত হিফয আল-মাল-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়। পারিভাষিক অর্থে হিফয আল-মাল বা সম্পদ সংরক্ষণ বলতে বুঝায় চুরি, ডাকাতি ও অন্যান্য সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ থেকে সম্পদের সুরক্ষা ও তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করা এবং ন্যায়নীতি ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে সম্পদ অর্জন ও লেনদেন পরিচালনা নিশ্চিত করা। সম্পদ অর্জনের হালাল পথ ও পদ্ধতিগত সীমানার সুরক্ষাও শরী'আহর উদ্দেশ্য।

ইসলামী আইনের নির্দিষ্ট অধ্যায়ভিত্তিক যেসব উদ্দেশ্য রয়েছে তাকে বিশেষ উদ্দেশ্য বা মাকাসিদ খাস্সাহ বলা হয়। অর্থাৎ যে বিষয়ের মাকাসিদ নির্ণয় করা হবে সে বিষয়টি ইসলামী আইনের যে অধ্যায়ভুক্ত উক্ত অধ্যায় সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ। ইসলামী ব্যাংকিং ও ইসলামী অর্থনীতি শরী'আতের আর্থিক বিধি-বিধান বিষয়ক অধ্যায়ের অন্তর্গত। ইমামুল মাকাসিদ ইব্ন আশুর-এর মতে আর্থিক বিধিবিধানের পিছনে শরী'আহর উদ্দেশ্য পাঁচটি:[২৫]

---

২৫. ইবনু আশূর, *ট্রিটিজ অন মাকাসিদুশ শরী'আহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৪

ক. সম্পদের গতিশীলতা (Circulation)
খ. সম্পদের সুস্পষ্টতা (Transparency)
গ. সম্পদ সংরক্ষণ (Preservation)
ঘ. সম্পদের দৃঢ়তা (Durability)
ঙ. ন্যায়পরায়ণতা (Equity)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী শরী'আহর উদ্দেশ্য মানবতার কল্যাণ নিশ্চিত করা। ইসলামী অর্থনীতি সেই উদ্দেশ্য পূরণ করবে। ইসলামী অর্থনীতির অংশরূপে ইসলামী ব্যাংক তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্ম-পদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামী শরী'আহর নীতিমালা ও আদর্শ ভিত্তিক সেই অর্থনীতির উদ্দেশ্য সাধনে কাজ করবে। সেই নিরিখে ইসলামী ব্যাংকের উদ্দেশ্য হলো ব্যাংকিং ক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণ সাধন এবং অকল্যাণ দূর করা।

ইসলামী ব্যাংক তার কর্মকাণ্ডের সকল প্রক্রিয়ায় সুদসহ সব ধরনের নিষিদ্ধ উপাদান পরিহার করে ও শরী'আহ্সম্মত পন্থায় সম্পদের বৈধতা ও পবিত্রতা নিশ্চিত করবে এবং জনগণের সম্পদের নিরাপত্তা বিধান ও সর্বজনীন বৃহত্তর কল্যাণে কাজ করবে।

ড. এম উমর চাপড়া [জ. ১৯৩৩] আর্থিক ক্ষেত্রে শরী'আহ্র এই উদ্দেশ্যকে সংক্ষেপে ও সহজভাবে উপস্থাপন করে বলেছেন, ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো কল্যাণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা। সে সমাজে সকল প্রতিষ্ঠান ন্যায়, সমতা ও স্বাধীনতার জন্য কাজ করবে। ইসলামী ব্যাংক ইসলামী অর্থনীতির মাকাসিদ বা উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে কাজের সকল ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কল্যাণ, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও আর্থিক সুবিচার নিশ্চিত করবে।[২৬]

ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে মাকাসিদুশ শরী'আহ্র আলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

এক. সাধারণ উদ্দেশ্য,
দুই. প্রায়োগিক উদ্দেশ্য।

১. সাধারণ উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে :

১.১ সম্পদের ইনসাফভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবিচার, শোষণ, জুলম ও বৈষম্য দূর করা।

১.২ ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক লেনদেনসহ সকল ব্যাংকিং কার্যক্রমে ন্যায়নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা।

---

২৬. এম উমর চাপড়া, *ইসলাম এন্ড দ্যা ইকোনোমিক চ্যালেঞ্জ*, লন্ডন : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৫ খ্রি. পৃ. ৭

১.৩. ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া।

১.৪. মানবসম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের সঠিক ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে সকলের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।

১.৫. সুদের কুফল থেকে অর্থনীতিকে মুক্ত করে প্রকৃত পণ্যভিত্তিক লেনদেন নিশ্চিত করে একটি স্বভাবসম্মত কল্যাণধর্মী অর্থব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করা।

১.৬. সামষ্টিক সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সমাজের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নে সহযোগিতা করা।

১.৭. জনগণের ছোট-বড় সব ধরনের পুঁজি সমাবেশ করে তা উৎপাদন ও অন্যবিধ আর্থিক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনীতিতে গতিশীলতা সৃষ্টি করা।

২. প্রায়োগিক উদ্দেশ্য :

মাকাসিদুশ শরী'আহর আলোকে ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রায়োগিক উদ্দেশ্যের প্রধান দুটি দিক হলো ১. সঞ্চয় বা জমা সংগ্রহ এবং ২. সে সম্পদ শরী'আহর উদ্দেশ্যের আলোকে বিনিয়োগ।

২.১. সঞ্চয় সংগ্রহের ক্ষেত্রে মাকাসিদুশ শরী'আহ

২.১.১. ইসলামী ব্যাংকের দায়িত্ব হলো মুদারাবাসহ সকল জমাগ্রাহকের অর্থ-সম্পদ নিরাপদে সংরক্ষণ করা।

২.১.২. সঞ্চয়ে ধনী ও গরিব সকলকে সুযোগ প্রদান করা।

২.১.৩. জনগণের উদ্বৃত্ত ও অলস অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করে তার দ্বারা মূলধন গঠন এবং তা শরী'আহ অনুমোদিত পন্থায় বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন।

২.১.৪. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে উৎসাহিত করে নিম্নআয়ের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আপৎকালীন অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে সহযোগিতা করা।

২.২. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মাকাসিদুশ শরী'আহ

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মাকাসিদুশ শরী'আহর আলোকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হলো :

২.২.১. সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার : সম্পদ অলসভাবে ফেলে রাখা ইসলামের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য। সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ সাধন করা ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি ইয়াতিমের সম্পদের যথাযথ ব্যবহারে গুরুত্ব দিয়ে রাসূলুল্লাহ স. বলেন :

ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة

সম্পদশালী ইয়াতিমের অভিভাবক যেনো সেই সম্পদ ফেলে না রেখে তা ব্যবসায় নিয়োজিত করে; অন্যথায় যাকাত দিতে দিতে তার সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাবে।[২৭]

২.২.২. ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণ বিবেচনা : সম্পদ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণের প্রতি খেয়াল রাখবে। ব্যক্তির জন্য আর্থিকভাবে লাভজনক কিন্তু সমাজের জন্য তা ক্ষতিকর হলে সে ধরনের কোনো খাতে বিনিয়োগ করা মাকাসিদুশ শরী'আহর পরিপন্থী।

২.২.৩. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার খাত বিবেচনা : শুধু মুনাফা নয়, বরং সমাজের সার্বিক কল্যাণ ও প্রয়োজন পূরণের দিক থেকে অগ্রাধিকার খাতে বিনিয়োগ করা শরী'আহ্র একটি উদ্দেশ্য।

২.২.৪. বিনিয়োগ বহুমুখীকরণ : কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যসহ সর্বজনীন চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সকল খাতকে এবং অপেক্ষাকৃত কম উন্নত ও বঞ্চিত এলাকাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিনিয়োগ সম্প্রসারণ করা ইসলামী ব্যাংকিংয়ের একটি উদ্দেশ্য।

২.২.৫. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন : অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও মন্দা দূর করা ইসলামী ব্যাংকের কর্মনীতি ও কর্ম কৌশলের সাথে যুক্ত। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের প্রকৃত সম্পদভিত্তিক অর্থায়ন পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইসলামের অর্থায়ন পদ্ধতিসমূহ (অংশীদারি, ক্রয়বিক্রয় ও ভাড়া পদ্ধতি) প্রকৃত সম্পদভিত্তিক (Asset Backed) হওয়ার ফলে তা সুদভিত্তিক টাকা বেচাকেনার কুফল থেকে মুক্ত এবং এর ফলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও স্বাভাবিকতা বজায় থাকে।

এখানে আরো একটি বিষয় বিবেচ্য। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক দর্শন মানুষের অসীম অভাব ও সসীম সম্পদের কথা বলে। অসীম চাহিদার সাথে সসীম সম্পদের ভারসাম্য রক্ষা পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রধান চ্যালেঞ্জ। অন্যদিকে ইসলামী দর্শনে সম্পদের মালিক আল্লাহ অভাবহীন ও অমুখাপেক্ষী। অভাবহীন ও অমুখাপেক্ষী আল্লাহর খলিফা বা ট্রাস্টিরূপে মানুষ তার মালিক ও পালনকর্তার আদেশ ও নিষেধের অনুবর্তী হয়ে সম্পদ অর্জন ও ব্যবহারে 'আদল' বা ন্যায়বিচার এবং 'ইহসান' বা দয়ার নীতি অনুসরণ করবে। তারা কল্যাণমূলক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা 'মা'রূফ' কায়েম করবে। মানুষের জীবনকে বোঝা-বন্ধন ও কষ্ট-যাতনা বা 'মুনকার' থেকে

---

২৭. ইমাম তিরমিযী, *আল-জামি*, অধ্যায় : আয-যাকাত আন রাসূলিল্লাহ্ স., অনুচ্ছেদ : মা জায়া ফি যাকাতি মালিল ইয়াতিম, ঢাকা : মাকতাবাতুল ফাতাহ, খ. ১, পৃ. ১৩৯, হাদীস নং ৬৪১; হাদীসটির সনদ যঈফ।

মুক্ত করবে। দরদি মানুষরূপে তারা পৃথিবীর সম্পদে সকল মানুষের প্রকৃত চাহিদা পূরণের জন্য অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এর ফলে সম্পদের যোগান ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা সহজ হবে।

মানুষের দায়িত্ব হলো কল্যাণ অর্জনের জন্য কাজ করা। সকল মানুষের আর্থিক প্রয়োজন পূরণ সেই কল্যাণেরই অংশ। যে উপাদান মানুষের জন্য যত বেশি প্রয়োজন, পৃথিবীতে সেগুলি তত বেশি মওজুদ রয়েছে। অক্সিজেন, সূর্যের আলো কিংবা পানির মতো অপরিহার্য সম্পদের যোগান ও চাহিদার মধ্যে চমৎকার ভারসাম্য রয়েছে। এ ধরনের সকল অপরিহার্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য।

মানুষ তার উৎপাদন ও বন্টনে আল্লাহর সৃষ্টি জগতের এই নৈতিক শৃঙ্খলা অনুসরণ ও মান্য করলে জীবন সহজ ও সুন্দর হবে। লোভ বা GREED-এর পরিবর্তে প্রকৃত চাহিদা বা NEED-কে অগ্রাধিকার দিয়ে দরদ ও দায়িত্ববোধের সাথে সম্পদ উৎপাদন, ভোগ ও ব্যবহার করলে সম্পদ ও চাহিদার টানাপোড়েন কমে যাবে। একজন লোভী মানুষের লোভ পূরণ পৃথিবীর সব সম্পদ দিয়েও সম্ভব নয়। কিন্তু সকল মানুষের প্রকৃত চাহিদা পূরণে পৃথিবীর সম্পদ পর্যাপ্ত।

ইসলামী ব্যাংক সম্পদের বৈধতা, পবিত্রতা, নিরাপত্তা ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করবে। মানুষের আর্থিক প্রয়োজন মিটিয়ে জীবনকে সহজ ও সুন্দর করার জন্য নানা প্রকার কল্যাণকর সেবা ও পণ্য প্রচলন করবে। সেই সাথে আর্থিক কর্মকাণ্ডে যাবতীয় অকল্যাণ দূর করবে।

১৯৭৮ সালে ওআইসি প্রণীত ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞায় মাকাসিদুশ শরী'আহর দৃষ্টিকোণ প্রতিফলিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে :

"ইসলামী ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা তার মৌলিক বিধান ও কর্মপদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামী শরী'আহর নীতিমালা মেনে চলবে এবং কর্মকাণ্ডের সকল পর্যায়ে সুদকে বর্জন করবে।"[২৮] এই সংজ্ঞার দুটি দিক। এক. মাকাসিদুশ শরী'আহর আলোকে কল্যাণ আহরণ। দুই. সুদসহ যাবতীয় অকল্যাণ দূরীকরণ।

মাকাসিদের আলোকে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং-এর মূল্যায়ন

এই দুটি উদ্দেশ্যের আলোকে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের কিছু দিক এখানে আলোচনা করা হচ্ছে। এই আলোচনায় বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং কাঠামোর ওপর আলোকপাত করা হচ্ছে।

---

২৮. Definnition by the general secretariat of the Organization of Islmic Conference accepted in the Foreign Ministers conference held in Dakar in 1978.

ব্যাংকের মুখ্য দুটি কাজ হলো জনগণের কাছ থেকে জমা সংগ্রহ এবং তাদের সেই অর্থ বিনিয়োগ করার মাধ্যমে সঙ্গত লাভ করা। এ কার্যক্রমে জমাকারী ও বিনিয়োগ গ্রাহক এবং ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডারগণ নানাভাবে সম্পৃক্ত হন। ব্যাংক এক্ষেত্রে আর্থিক মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে।

মাকাসিদের আলোকে ইসলামী ব্যাংকের জমা কার্যক্রম

ইসলামী ব্যাংক সকল স্তরের জনগণকে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে। শুধু বড় সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহী না হয়ে ছোট-বড় সকল জমাকারীর সম্পদ জাতীয় আর্থিক প্রবাহে নিয়োজিত করে। ইসলামী ব্যাংক তার জমানীতির আলোকে জনকল্যাণের জন্য নতুন নতুন সেবা তৈরির মাধ্যমে সমাজে ভালো কাজে বেশি মানুষের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করে।

ইসলামী ব্যাংক জনগণের সঞ্চয় শরী'আহসম্মত খাতে শরী'আহসম্মত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে গ্রাহককে হালাল মুনাফা অর্জনে সাহায্য করে। আর্থিক লেনদেনের সকল ক্ষেত্রে অকল্যাণকর সুদ সম্পূর্ণ পরিহার করে কল্যাণকর বা হালাল পদ্ধতি অনুসরণের ফলে মাকাসিদের আলোকে ঈমান সংরক্ষণের (হিফযুদ দ্বীন) পাশাপাশি জীবন-জীবিকার বৈধ ও ন্যায়ানুগ পথ প্রসারিত হয়।

সঞ্চয়ী জমার ক্ষেত্রে ব্যাংক লাভ-লোকসান অংশীদারি বা শিরকাত-এর 'মুদারাবা' পদ্ধতি অনুসরণ করে। এই পদ্ধতির আওতায় ব্যাংক ও গ্রাহক ব্যবসায়ে অংশীদার হয়। গ্রাহক 'রব্বুল মাল' (সম্পদের মালিক) রূপে মূলধন যোগায়। ব্যাংক 'মুদারিব' (উদ্যোক্তা, শরিক ও ব্যবস্থাপক) হিসেবে কারবারের ব্যবস্থাপনা করে। মূলধন সরবরাহকারীগণ ব্যাংকের ব্যবসায় ঝুঁকি নেন। লাভে অংশ পান। লোকসানের ভাগী হন।

ইসলামী শরী'আহ অনুযায়ী জমা গ্রহণের আরেকটি পদ্ধতি 'আল ওয়াদিয়া'। এই পদ্ধতির আমানত হিসাবে গ্রাহক তার অর্থ নিরাপদে হেফাযতের জন্য জমা রাখেন। লেনদেনের নির্দিষ্ট সময়ে তিনি অর্থ জমা করতে এবং তা ফেরত পেতে পারেন। এই পদ্ধতিতে অর্থ জমাকারী গ্রাহক 'মুয়াদ্দি' এবং ব্যাংক 'মুয়াদ্দা ইলাইহে'রূপে চুক্তিবদ্ধ হন। ব্যাংক মধ্যবর্তী সময়ে সেই অর্থ বৈধ ব্যবহারের জন্য গ্রাহকের কাছ থেকে অনুমতি নেয়। এটি সাবেকি চলতি হিসাবের ইসলামী বিকল্প।

সম্পদের নিরাপত্তা বিধান শরী'আহর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। মাকাসিদুশ শরী'আহর দৃষ্টিতে এটি হিফযুল মাল। শরী'আহর নীতি ও পদ্ধতি মেনে কল্যাণকর পদ্ধতিতে আমানত গ্রহণ করে ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকের অর্থের ন্যায়ানুগ ও বৈধ নিরাপত্তা এবং মানসিক প্রশান্তি নিশ্চিত করে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য ইসলামী ব্যাংক জনস্বার্থে বিভিন্ন হিসাব পরিচালনা করে। ইসলামী ব্যাংক স্বল্প প্রাথমিক জমার ভিত্তিতে হিসাব খোলার সুযোগ সৃষ্টি করে

সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষকে তাদের সেবার সাথে যুক্ত করে। বাংলাদেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংকটি শুরু থেকেই মাত্র একশ টাকা প্রাথমিক জমায় হিসাব খোলার সুযোগ চালু করে। পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীনে আইবিবিএল কৃষকদের জন্য ১৯৯৫ সাল থেকে চালু করেছে দশ টাকা প্রাথমিক জমাভিত্তিক হিসাব। ন্যূনতম প্রাথমিক জমায় গার্মেন্টস শ্রমিক, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, কর্মজীবী শিশু ও পথশিশুদের হিসাব খোলার মাধ্যমেও ইসলামী ব্যাংকগুলি জনকল্যাণ তথা 'মাসালিহ মুরসালাহ' বাস্তবায়নে অংশ নিচ্ছে।

বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক হজ্জ আমানত, মোহর আমানত, ক্যাশ ওয়াক্‌ফ আমানত, বিবাহ্ আমানত প্রভৃতি বিশেষ কল্যাণকর হিসাব পরিচালনা করছে।

সম্পদের বণ্টন ও মানুষের পরকালীন কল্যাণে ওয়াক্‌ফ একটি কল্যাণকর ব্যবস্থা। ঔপনিবেশিক শাসনের আগে মুসলিম শাসন আমলে দেশের প্রায় এক চতুর্থাংশ সম্পদ ছিলো ওয়াক্‌ফকৃত ও লাখেরাজ। এই সম্পদের আয়ে শিক্ষা ও সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ পরিচালিত হতো। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াফত আইনের মাধ্যমে এই কল্যাণের অর্থ ও সম্পদ আত্মসাৎ করার ফলে জনগণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বিপর্যয় দেখা দেয়। জনস্বার্থ ও জনকল্যাণ বিঘ্নিত হয়। এরপর থেকে ওয়াক্‌ফ-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা পুনরুদ্ধার হয়নি।

দেশের কোনো কোনো ইসলামী ব্যাংক সেই কল্যাণধারা পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে 'ক্যাশ ওয়াক্‌ফ আমানত' সেবার অধীনে বিত্তবানদের ওয়াক্‌ফকৃত অর্থের আয় ওয়াকিফের নির্দেশনা অনুযায়ী সমাজের বিভিন্ন স্তরের অভাবী মানুষের কল্যাণে ব্যয় করে থাকে। এই কার্যক্রম মাকাসিদুশ শরী'আহর অবারিত জনকল্যাণ বা 'মাসালিহ মুরসালাহ' বাস্তবায়নের একটি উদ্যোগ।

বিশ্বের প্রায় পাঁচশো ইসলামী ব্যাংকে বর্তমানে মোট ৩৮ মিলিয়ন হিসাব গ্রাহক রয়েছেন। এসব হিসাবের মধ্যে ১১.৭০ মিলিয়ন বা ৩৫ শতাংশ রয়েছে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলির। তার মধ্যে দেশের একটি ইসলামী ব্যাংক এককভাবে বিশ্বের প্রায় ২৫ শতাংশ ইসলামী ব্যাংকিং হিসাব পরিচালনা করছে।[২৯] মাকাসিদুশ শরী'আহর আলোকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির কার্যক্রমে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং খাত দুনিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় অগ্রগামী।

---

[২৯] বিস্তারিত জানার জন্য Islamic Financial Services Board (IFSB)-এর ওয়েব পেজ দ্রষ্টব্যঃ http://ifsb.org/psifi_01.php

মাকাসিদের আলোকে বিনিয়োগ কার্যক্রম

ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রমের মূল বিবেচ্য হলো কল্যাণ বৃদ্ধি করা এবং অকল্যাণ দূর করা। ইসলামী ব্যাংক সকল মানুষের জরুরিয়াত বা অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণকে অগ্রাধিকার দেয়। ধন-সম্পদ শুধুমাত্র ধনীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়ে তা যেন সার্বজনীন কল্যাণে নিয়োজিত হয় এদিকে খেয়াল রেখে জনগণের কাছ থেকে সম্পদ আহরণ এবং তা সমাজের উৎপাদনক্ষম ব্যাপক উদ্যোগী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া ইসলামী ব্যাংকের নীতি ও কৌশল।

জনকল্যাণধর্মী উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মুষ্টিমেয় হাতে বিনিয়োগ পুঞ্জীভূত করার পরিবর্তে আকৃতি, প্রকৃতি ও খাত এবং ভৌগোলিক এলাকা অনুযায়ী সর্বত্র বিনিয়োগ ছড়িয়ে দিয়ে বণ্টনমূলক সুবিচার নিশ্চিত করা মাকাসিদুশ শরী'আহর হিফযুল মা'ল বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে উৎপাদন ও মুনাফা শেষ কথা নয়। ১. কার জন্য উৎপাদন, ২. কী উৎপাদন, ৩. কিভাবে উৎপাদন; এ তিনটি বিষয় সামনে রেখে সার্বজনীন কল্যাণের নীতির ভিত্তিতে উৎপাদিত পণ্যের বণ্টন নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক।

দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং কারবারে সারা দেশের প্রায় ছয় কোটি গ্রাহকের জমা অর্থের প্রায় আশি ভাগই ঢাকা ও চট্টগ্রামের কতিপয় এলাকার বড় বিনিয়োগ গ্রাহকের মাঝে পুঞ্জীভূত হয়েছে। দেশের মাত্র কয়েকশো বিনিয়োগ গ্রাহকের ভালো-মন্দের সাথে দেশের ব্যাংকিং কার্যক্রমের ভালো-মন্দের ভাগ্য জড়িয়ে গেছে। এ ধরনের কার্যক্রম মাকাসিদুশ শরী'আহর দৃষ্টিতে সঠিক নয়।

ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি ও বিনিয়োগের খাত শরী'আহ্র দৃষ্টিতে বৈধ হওয়া আবশ্যক। আর্থিক বিবেচনায় কোনো ব্যবসা যথেষ্ট লাভজনক হলেও জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর কোনো পণ্যে ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ করে না। লাভের লোভে সিগারেট বা মদের ফ্যাক্টরিতে বিনিয়োগ করতে পারে না। সুদের কারবার, জুয়া, ফটকাবাজারি, অশ্লীলতা, ভেজাল ব্যবসায় ইসলামী ব্যাংক জড়িত হয় না। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সামাজিক কল্যাণমূলক খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত হয়। ইসলামী ব্যাংক আর্থিক কারবারে অকল্যাণ দূর করার জন্য কাজ করে।

জমা গ্রাহকদের মূলধনের নিরাপত্তা ও মুনাফার সম্ভাব্যতা বিবেচনায় রেখে কল্যাণের লক্ষ্যে মূলধন ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটিয়ে প্রযুক্তিগত ও পেশাগত দক্ষতার সমন্বয়ে পারিপার্শ্বিকতা ও পরিবেশ এবং দেশের সামগ্রিক চাহিদা সামনে রেখে রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে উৎপাদনশীল ও শ্রমঘন খাতে বিনিয়োগ করা ইসলামী ব্যাংকের নীতি ও কর্মকৌশল। এ কারণে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো উৎপাদনমুখী শিল্প গড়ে তোলাকে গুরুত্ব দেয়। নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি উৎসাহিত করে। এর ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের দুই ধারার মাঝে ভারসাম্য রেখে সামাজিক সাম্য ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় মাকাসিদুশ শরী'আহর জরুরিয়াতের পাঁচটি শর্ত পূরণে কাজ করা ইসলামী ব্যাংকের বুনিয়াদি লক্ষ্য। ইসলামী ব্যাংকগুলি এজন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগ এবং সাধারণ মানুষের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেশের সকল এলাকায় সমবেত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মূলনীতি বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে।

ইসলামী ব্যাংকের সাথে গ্রাহকদের সম্পর্ক দাতা-গ্রহীতা বা খাতক-মহাজনের নয়। এক. শিরকাত বা লাভ লোকসান অংশীদারি পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক ও গ্রাহকের সম্পর্ক অংশীদারিত্বের। দুই. পণ্যের বেচাকেনার মাধ্যমে গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে সৃষ্টি হয় ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্ক। তিন. ইজারা পদ্ধতিতে কারখানার মূলধনী যন্ত্রপাতি, যানবাহন, বাড়ি ইত্যাদির ভাড়াদাতা ও ভাড়া গ্রহীতারূপে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এই তিনটি পদ্ধতি মানুষের দীর্ঘ প্রচলিত স্বাভাবিক লেনদেন কার্যক্রমেরই প্রতিচ্ছবি।

শিরকাতের ক্ষেত্রে গ্রাহকগণ মুদারাবা বা মুশারাকা পদ্ধতিতে ব্যবসায়ের অংশীদার হন। 'বাই' বা বেচাকেনার ক্ষেত্রে প্রকৃত পণ্যের ক্রেতা–বিক্রেতারূপে বাই-মুরাবাহা, বাই-মুয়াজ্জাল, বাই-সালাম প্রভৃতি পদ্ধতিতে গ্রাহক ও ব্যাংক চুক্তি করেন। ইজারা পদ্ধতিতে ভাড়াটিয়া ও ভাড়া প্রদানকারীরূপে দুই পক্ষ কারবারে শরিক হন।

ইসলামী ব্যাংক তার বেচাকেনা পদ্ধতিতে প্রকৃত পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ে যুক্ত হয়। এই লেনদেন সুদভিত্তিক টাকা বেচাকেনা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এর ফলাফলও সুদভিত্তিক লেনদেন থেকে ভিন্ন। টাকা নিজে কোনো পণ্য নয়। এর নিজস্ব কোনো উৎপাদন ক্ষমতা নাই। ধাতু কিংবা কাগজ বা প্লাস্টিকের তৈরি মুদ্রা হলো প্রকৃত পণ্য বেচাকেনার মাধ্যম, পরিমাপ, মানদণ্ড বা ভাণ্ডার মাত্র। এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে সেই মাধ্যমকে পণ্যের মতো বেচাকেনার ফলে আর্থিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। যেটিকে এ্যারিস্টোটল 'কৃত্রিম জালিয়াতি কারবার' হিসেবে দেখেছেন। এই অকল্যাণ দূর করা ইসলামী ব্যাংকের একটি মাকসাদ বা উদ্দেশ্য।

অর্থায়নের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় ইসলামী ব্যাংকের শিরকাত বা মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতি এবং পণ্যের বেচা-কেনা ভিত্তিক মুরাবাহা, মুয়াজ্জাল প্রভৃতি পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত। পুঁজিবাদের সুদ ও ঋণভিত্তিক লেনদেন আর ইসলামের ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির লেনদেন মৌলিকভাবে দুটি আলাদা বিষয়। এ দু'য়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

বাই মুরাবাহা ও বাই মুয়াজ্জাল ইত্যাদি বেচাকেনা পদ্ধতি এবং সুদভিত্তিক প্রচলিত অর্থায়ন পদ্ধতি এক নয়। উভয়ের অর্থনৈতিক প্রভাবও ভিন্ন। প্রচলিত অর্থায়ন পদ্ধতিতে ঋণগ্রহীতা ঋণের অর্থ কোথায় ব্যবহার করবেন তা জানা সুদভিত্তিক ব্যাংকের জন্য জরুরি নয়। ইসলামী ব্যাংকের ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিতে যথার্থভাবে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হয় বলে এটা অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

মুরাবাহা পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক বাজার থেকে প্রকৃত পণ্য সংগ্রহ করে। ফলে বাজারে ব্যাংকের প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রতিফলিত হয়। কিন্তু প্রচলিত অর্থায়ন পদ্ধতিতে পণ্যের সাথে ব্যাংকের কোনো সম্পর্ক থাকে না। ফলে এ ক্ষেত্রে বাজারের ওপর ব্যাংকের কোনো প্রভাব নেই।

মুরাবাহা পদ্ধতিতে গ্রাহকের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যাংক প্রকৃত সরবরাহকারীর কাছ থেকে পণ্য সংগ্রহ করে পণ্যের ওপর মালিকানা ও দখল লাভের পর তা উক্ত গ্রাহকের কাছে বিক্রি করে। সুদভিত্তিক অর্থায়ন পদ্ধতিতে ব্যাংকের সাথে পণ্যের কোনো সম্পর্ক থাকে না এবং ঋণের কোনো পর্যায়েই ব্যাংকের ওপর কোনো প্রকার ঝুঁকি বর্তায় না।

সুদভিত্তিক অর্থায়ন পদ্ধতিতে ঋণগ্রহীতা সময়মতো ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে সময় বাড়ার সাথে সাথে সুদ বাড়তে থাকে। অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংকের ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে পণ্যের দাম একবারই সাব্যস্ত হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রাহক সে দাম পরিশোধ করার অঙ্গীকার করেন। এ চুক্তির অধীনে কোনো গ্রাহক যৌক্তিক অসুবিধার কারণে সময়মতো বিনিয়োগ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাকে অতিরিক্ত কোনো অর্থ পরিশোধ করতে হয় না। তবে যথার্থ কারণ ছাড়া বিনিয়োগ গ্রাহক সময়মতো বিনিয়োগ পরিশোধ না করলে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ব্যাংক বিলম্বজনিত 'ক্ষতিপূরণ' আদায় করতে পারে। ক্ষতিপূরণের এই অর্থ ব্যাংকের আয় রূপে বিবেচিত হয় না। অর্থাৎ এই অর্থ ব্যাংকের গ্রাহক, কর্মচারী বা শেয়ার হোল্ডারগণ পান না। জরিমানার অর্থ শরী'আহ্ অনুমোদিত দাতব্য কাজে ব্যয় করার ফলে এর সুবিধা যায় সমাজের বঞ্চিত ও হৃত দরিদ্র মানুষের কাছে। এতেও সমাজকল্যাণ বাড়ে।

ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রমে ব্যাংক ও গ্রাহকের সম্পর্ক পরিপূরক। ব্যাংক ও গ্রাহক সহমর্মী হয়ে ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য চেষ্টা চালাবে। গ্রাহকের ব্যর্থতার কারণে যাতে ব্যাংকের মুনাফা কমে না যায় এবং অন্য দিকে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার অদক্ষতার কারণে গ্রাহক যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন সেজন্য গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে সমন্বয় ও সহমর্মিতা ইসলামী ব্যাংকিং কারবারের বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলি তাদের বিনিয়োগ কার্যক্রমের মাধ্যমে শরী'আহর উদ্দেশ্য পূরণে বিস্তৃত ক্ষেত্রে কাজ করছে। যার উল্লেখযোগ্য কিছু দিক নিম্নে আলোচিত হলো:[৩০]

১) **শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রসারণ :** বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলি দেশের শিল্পায়নে সক্রিয় ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। গত তিন দশকে ইসলামী ব্যাংকের অর্থায়নে দেশে ব্যাপক শিল্পায়ন হয়েছে। তৈরী পোশাক শিল্পের উন্নয়নে পথিকৃতের ভূমিকা পালনের মাধ্যমে দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলি শিল্প ভিত্তি

---

৩০. বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং অর্থনৈতিক সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত।

তৈরি, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। এই উদ্যোগের ফলে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ও ফরোয়ার্ড লিংকেজধর্মী নানামুখী শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে। সেই শিল্পভিত্তি ও উদ্যোক্তা ভিত্তির ওপর দেশে ইস্পাত, ঔষধ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, রসায়ন ইত্যাদি শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছে। (এককভাবে আইবিবিএল-এর অর্থায়নে দেশে বর্তমানে চার হাজারের বেশি শিল্প কারখানা পরিচালিত হচ্ছে।) বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকগুলি ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করছে। দেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংকটি এসএমই খাতে দেশের মোট বিনিয়োগের প্রায় সতেরো ভাগ এককভাবে পরিচালনা করছে।

২) **দারিদ্র্য বিমোচন :** মাকাসিদুশ শরী'আহর জরুরিয়াত বাস্তবায়নে দারিদ্র্য বড় বাধা। সামাজিক ও মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী দারিদ্র্য মানুষকে কুফুরির দিকে ঠেলে দেয়। দারিদ্র্য দূর করতে আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা মাকাসিদুশ শরী'আহর জরুরিয়াতের পর্যায়ভুক্ত। দেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংকটি ১৯৯৫ সাল থেকে 'পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প' (আরডিএস) চালু করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে সাড়ে আঠারো হাজার গ্রামে নয় লাখ পরিবারের আর্থিক উন্নয়নে কাজ করছে। এ যাবৎ ব্যাংকটি এই প্রকল্পে ১০ হাজার কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ করেছে। শহরের ভাসমান দারিদ্র্য দূরীকরণে ২০১২ সালে Urban Poor Development Scheme বা 'শহর দরিদ্র উন্নয়ন প্রকল্প' চালু করা হয়েছে। বিশ্বের মোট ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের পঞ্চাশ ভাগই এককভাবে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকের এই প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রকল্পের অধীনে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকগণ পর্যায়ক্রমিকভাবে নিজেদের অবস্থা উন্নয়নের সুযোগ পান। এ পর্যন্ত সোয়া লাখের বেশি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পরিবার নিজেদেরকে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ও এসএমইতে উত্তরণ (Graduation) করতে সক্ষম হয়েছেন। দেশের প্রায় সকল ইসলামী ব্যাংক এক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান অবদান রাখছে।

৩) **কর্মসংস্থান সৃষ্টি :** কর্মসংস্থান সৃষ্টি মাকাসিদুশ শরী'আহর হিফযুন নফ্‌স, হিফযুন-নসল ও হিফযুল আকল বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত। বাংলাদেশের সকল ইসলামী ব্যাংক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রাখছে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগ, কারিগরি প্রশিক্ষণ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, শিক্ষা বৃত্তি প্রদান, শিক্ষার্থীদের ইনটার্নশিপ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নে এই ব্যাংকগুলি কাজ করছে। (নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে আইবিবিএল সম্প্রতি তাদের বিভিন্ন শাখায় আট শতাধিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে সাতাশ হাজারের বেশি নতুন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে।) ইসলামী ব্যাংকগুলির অর্থায়নে শিল্প কারখানা,

এসএমই ও গ্রামীণ প্রকল্পসমূহে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ত্রিশ লাখের বেশি লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

বিনিয়োগ কার্যক্রম ছাড়াও ইসলামী ব্যাংকগুলিতে বর্তমানে সাতাশ হাজারের বেশি কর্মকর্তা-কর্মচারী কাজ করছেন। দ্রুত প্রসারমাণ ইসলামী ব্যাংকগুলি জনশক্তি নিয়োগের মাধ্যমেও কর্মসংস্থানে ভূমিকা পালন করছে।

৪) **আবাসনে বিনিয়োগ** : সীমিত আয়ের মানুষের গৃহায়ণে ইসলামী ব্যাংকের আবাসন প্রকল্প মাকাসিদুশ শরী'আহর অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনের সব ক'টি দিক সংরক্ষণের সাথে যুক্ত। দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর আবাসন সমস্যার সমাধানে ইসলামী ব্যাংকগুলি গৃহায়ণে অর্থায়ন করছে। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক চালুর সূচনা থেকেই এ বিষয়টি অগ্রাধিকার পেয়েছে। বর্তমানে আইবিবিএল এই খাতে এককভাবে দেশের সর্বোচ্চ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান।

৫) **নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন** : সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন কেগবান করতে নারীকে শিক্ষিত, কর্মক্ষম, স্বাবলম্বী ও যোগ্য করে তোলা মাকাসিদুশ শরী'আহর জরুরিয়াতের সব ক'টি স্তর ও ভাগকে শামিল করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ 'পুরুষ যা অর্জন করে তা তার অংশ, আর নারী যা অর্জন করে তা তার অংশ।'[৩১] সেবা, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক নারীদের জন্য বিভিন্ন খাতে বিশেষ বিনিয়োগ সুবিধা দিচ্ছে। নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জামানতবিহীন বিনিয়োগের ব্যবস্থা করেছে। পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের প্রায় নয় লাখ গ্রাহকের আশি শতাংশই নারী উদ্যোক্তা। ইসলামী ব্যাংকসমূহের এসএমই এবং অন্যান্য বিনিয়োগেও নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ রয়েছে।

৬) **জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন** : বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলি গৃহসামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প, আবাসন বিনিয়োগ প্রকল্প, ডাক্তার বিনিয়োগ প্রকল্প, পরিবহণ বিনিয়োগ প্রকল্প, গাড়ি বিনিয়োগ প্রকল্প, পল্লী গৃহনির্মাণ বিনিয়োগ প্রকল্প, বিবাহ বিনিয়োগ প্রকল্প ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের জীবন মানের উন্নয়নে শরিক হচ্ছে। এ কার্যক্রম শরী'আহ্র হাজিয়াত ও তাহসিনিয়াতের পর্যায়ভুক্ত।

৭) **স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ** : স্বাস্থ্য সুরক্ষা 'হিফযুন নফ্স' বা জীবনের সুরক্ষার অন্তর্ভুক্ত। হিফযুদ-দ্বীন বা দ্বীনের সুরক্ষার সাথেও এর সম্পর্ক রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকগুলি স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে কাজ করছে। বিভিন্ন ইসলামী

---

৩১. আল কুরআন, ৪ : ৩২

ব্যাংকের এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী রয়েছে। (আইবিবিএল এ যাবত ৪২টি ঔষধ শিল্প, ৬২টি হাসপাতাল ও ক্লিনিক এবং বহু প্যাথলজিক্যাল সেন্টার ও ডায়াগনোস্টিক সেন্টারে বিনিয়োগ করেছে। ডাক্তার বিনিয়োগ প্রকল্পের অধীনে দেশের নবীন ডাক্তারদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। উন্নত চিকিৎসা সরঞ্জাম দিয়ে প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারদের আধুনিক চিকিৎসা সেবা জনগণের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।)

৮) **মানবসম্পদ উন্নয়ন :** পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও সততা সৃষ্টি করে মানুষকে কল্যাণকারিতার সামর্থ্য সম্পন্ন দক্ষ ও যোগ্য করা শরী'আহ্‌র একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। ইসলামে ব্যক্তির সকল বৈধ কাজই কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ দূর করার সাথে যুক্ত এবং তা ইবাদাত হিসাবে গণ্য। আর সেইসব কাজ ভালোভাবে করার যোগ্যতা অর্জন সংশ্লিষ্টদের জন্য ফরয। ড. উমর চাপড়ার মতে মানব উন্নয়ন মাকাসিদুশ শরী'আহর মৌলিক বিষয় যা জরুরিয়াতের পাঁচটি বিষয়ের সাথেই যুক্ত। ইসলামী ব্যাংকগুলি তাদের বিনিয়োগ ও সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক সকল কাজের দ্বারা মানব সম্পদ ও মানব উন্নয়নে অবদান রাখছে। দ্রুত বিকাশমান ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রয়োজন মেটাতে জনকল্যাণ ব্রতী দক্ষ ইসলামী ব্যাংকার তৈরি করতে ইসলামী ব্যাংকগুলি নিজস্ব ট্রেনিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছে। এই কাজ উৎকর্ষমণ্ডিত করার জন্য ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী দেশের ব্যাংকারদের জন্য 'ইসলামী ব্যাংকিং ডিপ্লোমা' (DIB) চালু করেছে।

৯) **পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজ ব্যাংকিং :** পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজায়ন শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ মাকাসিদ। সবুজায়নের এই নীতি ও দর্শন মেনে সকল বিনিয়োগ কার্যক্রমে পরিবেশ সুরক্ষা ইসলামী ব্যাংকগুলির নৈতিক বাধ্যবাধকতা। বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক গ্রীন ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতায় জ্বালানী সাশ্রয়ী বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, সোলার প্যানেল ব্যবহার, অভ্যন্তরীণ অন-লাইনভিত্তিক যোগাযোগ নিশ্চিত করেছে। কাগজবিহীন ব্যাংকিং চালুর দিকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছে।

১০) **সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) :** মাকাসিদুশ শরী'আহ্‌র নীতি অনুযায়ী মানুষকে দরদি ও পরস্পর কল্যাণকামী হতে হবে। দরদি মানুষ গঠন এবং দরদি মানুষদের সমন্বয়ে দরদি প্রতিষ্ঠান ও দরদি সমাজ প্রতিষ্ঠা শরী'আহ্‌র লক্ষ্য। পারস্পরিক দায়বোধ ও দরদি মনোভাব বিকশিত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকগুলি সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করছে। সেই বিবেচনায় ইসলামী ব্যাংকের সকল কার্যক্রমই সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতাভুক্ত। ইসলামী ব্যাংকের জমা ও বিনিয়োগের সকল সেবা সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারের সাথে যুক্ত।

তদুপরি স্বাভাবিক ব্যাংকিং সেবা কার্যক্রমের বাইরে থেকে যাওয়া বিপুল অভাবী ও বঞ্চিত মানুষের জীবন মানের উন্নয়নে কাজ করা ইসলামী ব্যাংকের নৈতিক বাধ্যবাধকতা। মাকাসিদুশ শরী'আহর পাঁচটি মৌলিক চাহিদা পূরণে বঞ্চিত ও অভাবী এবং কষ্টে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানো ইসলামী ব্যাংকসমূহের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব।

এই লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকগুলি স্বাভাবিক লেনদেনের বাইরে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, সৌন্দর্যবৃদ্ধি, আর্সেনিক মুক্ত পানি প্রকল্প, ফর্মালিনমুক্ত খাদ্য নিশ্চিতকরণ সহায়তা প্রভৃতি কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে। বন্যা দুর্গত, সিডর আক্রান্ত, মঙ্গা পীড়িত, শীতার্ত এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য ইসলামী ব্যাংকগুলি সব সময় ত্রাণ সহায়তা নিয়ে পাশে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে জনকল্যাণের ধারণা সৃষ্টি ও বেগবান করতে ইসলামী ব্যাংকগুলি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে।

শিক্ষার অধিকার সংরক্ষণ বা হিফযুল আক্ল নিশ্চিত করতে নারী-পুরুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞানার্জনের সুযোগ সৃষ্টি এবং এক্ষেত্রে আর্থিক বাধা দূর করতে ইসলামী ব্যাংকগুলি কাজ করছে। মেধাবী অতি দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন মেয়াদী শিক্ষা বৃত্তির ব্যবস্থা করা ছাড়াও বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক প্রি স্কুল, মক্তব, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, নার্সিং ট্রেনিং ইনিস্টিটিউট, টেকনিক্যাল ইনিস্টিটিউট, ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, পাঠাগার ইত্যাদি পরিচালনা করছে।

স্বাস্থ্য সেবা খাতে বিপুল বিনিয়োগ করা ছাড়াও আইবিবিএল ১০২১ শয্যাবিশিষ্ট ৬টি নিজস্ব হাসপাতাল ও ৭টি কমিউনিটি হাসপাতাল এবং ৫টি হোমিওপ্যাথিক ক্লিনিক পরিচালনা করছে। এই কার্যক্রমের অধীনে প্রতি বছর প্রায় দশ লাখ রোগী সাশ্রয়ী মূল্যে সরাসরি চিকিৎসা সেবা পান। এছাড়া গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভ্রাম্যমাণ চক্ষু শিবির, সুন্নতে খাতনা প্রভৃতি কর্মসূচী রয়েছে বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের।

মাকাসিদ অর্জনে কিছু করণীয়

ইসলামী ব্যাংকিং এ দেশের আর্থিক খাতে যে কল্যাণমুখী ধারা সৃষ্টি করেছে মাকাসিদুশ শরী'আহর আলোকে সে ধারা বেগবান করার জন্য প্রয়োজন আইনি সুবিধা, কাঠামোগত সংস্কার, সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারক, পরিচালক ও পেশাদার ব্যাংকারদের জ্ঞানগত সামর্থ্য এবং জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি। এজন্য নীতি নির্ধারণী উদ্যোগ এবং নানাবিধ প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, মানবিক ব্যাংকিং, সামাজিক দায়বদ্ধতা, নারীর ক্ষমতায়ন, ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণ, পল্লী অঞ্চলে অর্থায়ন ইত্যাদি বিষয়ে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে নীতিমালা ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছে সেগুলিও ইসলামী ব্যাংকিং-এর উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার কল্যাণধর্মী ও অকল্যাণরোধী নৈতিক মূল্যবোধ সমন্বিত, সঙ্কুলানমূলক ও স্থিতিস্থাপক বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ন করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এই ব্যবস্থার ব্যাপক অবদানের সুযোগ ও সম্ভাবনার উল্লেখ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেছেন :

> ...With its ethical, inclusivity promoting and stability enhancing attributes, Islamic finance undoubtedly bears promise of playing major beneficial role in our socio-economic development.

দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিং-এর কল্যাণব্রতী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং স্বতন্ত্র কর্মধারার বিকাশের জন্য স্বতন্ত্র আইন প্রণয়ন, ইসলামী পদ্ধতিতে রূপান্তরে আগ্রহী সাবেকি ধারার ব্যাংকগুলিকে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু এবং ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডোধারী ব্যাংকগুলিকে আরো নতুন শাখা বা উইন্ডো খোলার সুযোগ দিলে তা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক হবে।

মাকাসিদুশ শরী'আহ্র আলোকে ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদনের উপযোগী জনশক্তি তৈরির জন্য শিক্ষা কারিকুলামে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ, ইসলামী ব্যাংকারদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইড লাইন নিয়মিত আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। ইসলামী ব্যাংকিং পরিপালন, নতুন নতুন প্রোডাক্ট উদ্ভাবন ও বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে স্বতন্ত্র ব্যাংকিং বিভাগ স্থাপন করার বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে দেশের ব্যাংকিং-এর যথাযথ ব্র্যান্ডিং-এর উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট সকল মহল উদ্যোগী ও সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা ও ক্ষতি অপসারণ ইসলামী শরী'আহ্র উদ্দেশ্য। শরী'আহ্র প্রতিটি বিধানের রয়েছে বিশেষ ও আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর্থিক ক্ষেত্রে মাকাসিদুশ শরী'আহ্র বাস্তবায়নের জন্য। তিন দশকের পথ পরিক্রমায় ইসলামী ব্যাংকিং সে লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১, সংখ্যা : ৪৩
জুলাই - সেপ্টেম্বর : ২০১৫

ইসলামী আইনে রোমান আইনের প্রভাব : একটি বিশ্লেষণ

ড. মাহফুজুর রহমান*

[**সারসংক্ষেপ :** *পাশ্চাত্যের কিছু মনীষী ইসলামী আইন রোমান আইন দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে বলে দাবি করেছেন। তাঁদের অনেকেই মনে করেন যে, ইসলামী আইন শুরুতেই ব্যাপকভাবে রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কিছু মনীষী এমন ধারণাও পোষণ করেছেন যে, আজকে যে আইন ব্যবস্থাকে ইসলামী আইন বলে দাবি করা হচ্ছে; তা আসলে রোমান আইনের ইসলামী সংস্করণ বৈ আর কিছু নয়। তাঁরা মূলত "প্রাচ্যে একসময় রোমান আইন বাস্তবায়িত ছিল, আর তা থেকেই ইসলামী আইনের উপর রোমান আইনের প্রভাব পড়েছে", "ইসলামী আইন ও রোমান আইনের মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য বিদ্যমান", এমন কথা বলে তাঁদের উপর্যুক্ত দাবির পক্ষে কিছু যুক্তি প্রদর্শনের চেষ্টাও করেছেন। তাঁদের এ সব দাবি ও যুক্তি কতটুকু প্রামাণ্য ও যুক্তিসঙ্গত এবং কতটুকু ন্যায়ানুগ তা খুঁজে দেখাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এ প্রবন্ধে তাঁদের যুক্তিগুলো উপস্থাপন করে তা দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে যাচাই করে দেখা হয়েছে। এ প্রবন্ধে আলোচনা পর্যালোচনা ও সমালোচনা মূলক গবেষণা রীতি অনুসরণ করা হয়েছে।*]

ভূমিকা

পাশ্চাত্যর কিছু মনীষী এবং কিছু প্রাচ্যবিদের ধারণা যে, ইসলামী আইন রোমান আইন দ্বারা তার সূচনাকালেই ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। সর্বপ্রথম এ ধারণা Dominico Gotleschi-কে তাঁর রচিত Manuale di diritto pubblico eprivato atlomano নামক গ্রন্থে পোষণ করতে দেখা যায়। তাঁর মতে ইসলামী আইন মূলত রোমান আইন থেকেই নেয়া। তাঁর এ বক্তব্যের পর পাশ্চাত্যে এ ধারণা ধীরে ধীরে ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তা স্পষ্ট করে বলেছেন, আবার কেউ কেউ এ মর্মে সন্দেহ পোষণ করেছেন। যাঁরা এ ধারণা পোষণ করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই আইনবিদ নন; তাঁরা প্রাচ্যবিদ। Henri Hugues এর মতে 'ইসলামী আইন মূলত রোমান আইন।' তাঁর মতে রোমান আইনকে কিছুটা পরিবর্তন করে মুসলিম আইনবিদগণ ইসলামী আইন বলে উপস্থাপন করেছেন।[১]

---

* অধ্যাপক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১. C.A Nalino, *নাযারাতুন ফি 'ইলাকাতিল ফিকহিল ইসলামী বিল কানূন আর-রুমানী*, ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ সম্পাদিত, *'হাল্ লিল-কানূন আর রুমানী আছারুন আলাল ফিকহিল ইসলামী ?'* দারুল বুহুস আল-ইলমিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৩ খ্রি., পৃ. ৯-১০

এ প্রসঙ্গে 'সিল্ডন অ্যামাস' (Sildon Amus) তাঁর ইংরেজী ভাষায় রচিত 'Roman Civil Law' গ্রন্থে বলেন,

> সম্ভবত সত্য, বরং অবশ্যই সত্য বিষয় হচ্ছে যে, ইসলামী আইনের সাধারণ নিয়ম-নীতি ও গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিগুলো আরবী পোশাকে প্রাচ্যের রোমান সাম্রাজ্যের আইন ছাড়া অন্য কিছু নয়। ... আমার মনে হয়, রোমান আইনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো, তাতে পঠিত আইন গ্রন্থগুলো, আর এই আইন বাস্ত বায়নকারী বিচারালয়গুলো, বিচার বাস্তবায়নকারী প্রশাসকগণ, আর প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ, যাঁরা এ আইনের পঠন-পাঠনের কাজে লিপ্ত ছিল তাঁরা সকলেই যে সব দেশে ইসলামী আইন ব্যবস্থা এবং তার উন্নত চিন্তা ও বিধি-বিধানের উন্মেষ হয়েছে সে সব দেশে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে এতদুভয়ের বিস্ময়কর মিলন ঘটেছিল। কখনো (মুসলিম আইনবিদরা) রোমান আইন ব্যবস্থার মূলনীতিগুলোর সমর্থন করেছেন, আবার কখনো তার বিরোধিতা করেছেন। আমরা এ সত্য নিয়ে চিন্তা করলে অবশ্যই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ইসলামী আইন ব্যবস্থা অতি সাধারণভাবে পরিবর্তিত রোমান আইন ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। বস্তুত ইসলামী আইন ব্যবস্থা হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে প্রাচ্যের রোমান সাম্রাজ্যের (বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের) কাছে রক্ষিত আইন ব্যবস্থার প্রতিভূ। যা আরব ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।[২]

অন্য দিকে এ দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে আধুনিক কোন কোন গবেষকের। ইরানের বাহায়ী ধর্মাবলম্বী আবুল ফাযল যার ফফুকদানী এ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে 'ইউরোপীয়রা যে আইন ব্যবস্থাকে বর্তমানে রোমান আইন ব্যবস্থা বলে দাবি করছে তা মূলত ইসলামী আইন ব্যবস্থা হতে সংগৃহীত।'[৩]

---

২. ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ, *তাছীরুল হুকূক আর-রুমিয়া আলাল ফিক্‌হিল ইসলামী*, পৃ. ২৭-২৮;

من المحتمل أو باحرى من الضروري ، أن لاتكون الآصول المهمة والقواعد العامة من الحقوق الاسلامية شيئا غير خقوق الامبراطورية الرومية الشرقية في لباس عربي... ونرى أن المدارس للحقوق الرومانية ، والكتب الدراسية لها ، والمحاكم العدلية التي تطبق هذه القانون ، والحكام العدليين، والعمال والاداريين الذين انكبوا على دراسة هذه الحقوق كانو موجودين في البلدان التي نشأ فيها نظام الفقه الاسلامي بما فيه من الاحكام والافكار الراقية، وحيث يوجد مزيج عجيب : فأحيانا الموافقة وأحيانا المخالفة مع الاصول الآساسية للحقوق الرومية المتأخرة.فأذا فكرنا في هذه الحقيقة فلا بد من ان نصل الى النتيجة ان نظام الفقه الاسلامي لم يكن الا نظام الحقوق الرومية مع تغيير يسير جدا. وفي الحقيقة ... يظهر ان الفقه الاسلامي ليس الا نظام الحقوق الموجودة عند الامبراطورية الرومية الشرقية (البيزنطية) المطبقة على حاجات الادارة العربية (الاسلامسة)

৩. C.A Nalino, *নাযারাতুন ফি ইলাকাতিল ফিকহিল ইসলামী বিল কানূন আর-রুমানী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০ ; গ্রন্থটির মূল টেক্সট আরবীতে আব্দুল জালিল সাআদের *'মুকাদ্দামাতুল কাওয়ানীন'* নামক গ্রন্থে রয়েছে। তা নিম্নরূপ

এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পরে মিসরের আরো অনেকেই ব্যক্ত করেছেন।[৪]

প্রাচ্যবিদদের দাবি

ইসলামী আইনের উপর রোমান আইনের প্রভাব সংক্রান্ত প্রাচ্যবিদদের বক্তব্য ও যুক্তি-প্রমাণের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, তাঁরা মূলত তিনটি দাবি ও তার পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ প্রদর্শন করেছেন। দাবি তিনটি হলো:

ক. প্রাচ্যে রোমান আইন বাস্তবায়িত ছিল, আর তা থেকেই ইসলামী আইনের উপর তার প্রভাব পড়েছে।

খ. ইসলামী আইন একা আরবজাতির চিন্তাপ্রসূত নয়; তাতে ব্যাপকভাবে অন্য জাতির চিন্তা-ভাবনার ফসলও বিদ্যমান।

গ. ইসলামী আইন ও রোমান আইনের মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

উপর্যুক্ত এই তিনটি কারণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী আইন রোমান আইন দ্বারা ইসলামী আইনের সূচনাকালেই ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

প্রাচ্যবিদদের এসব দাবি কতটুকু যুক্তিসঙ্গত এবং কতটুকু দলীল-প্রমাণ নির্ভর, তা আমরা এ প্রবন্ধে পর্যালোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি।

এক. প্রাচ্যে রোমান আইনের বাস্তবায়ন ও তার প্রভাব

প্রাচ্যবিদদের প্রথম দাবি হলো: রোমান আইন প্রাচ্যে বাস্তবায়িত হয়েছিল। ফলে এ আইনব্যবস্থা প্রাচ্যের মানুষের দৈনন্দিন অভ্যাস ও সামাজিক প্রথায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। যেহেতু যে কোন আইন ব্যবস্থায় মানুষের অভ্যাস ও সামাজিক প্রথার একটা প্রভাব থাকে; সেহেতু রোমান আইনের আলোকে গড়ে উঠা সামাজিক প্রথা ও অভ্যাসের একটা বড় প্রভাব ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ ফকীহ্দের অজান্তেই ইসলামী

(أن القانون الذي يسميه الاوريبون روميا هو في الحقيقة مأ خوذ من الفقه الاسلامي.)

৪. দেখুন, *মুজাল্লা 'আর রিসালা*, ২২৬/২০; ১১১/১৩

يا سيدي؛ فسرت في حديث عن الأوزاعي التأثر الروماني، بالتأثر بالثقافة والبيئة الذي لابد من تقديره؛ فكتبت تقول لي إن القانون الروماني الحديث مأخوذ من الفقه الإسلامي؛ وإذ ذاك قلت لك هذا الرأي قدىم نشر في مصر ولا يؤثر في قولي. [مجلة الرسالة (১১১/ ১৩، بترقيم الشاملة آليا)]

وهي الطريقة التي نقلها الرومان في تشريع الألواح الاثنى عشر. لذا يمكننا أن نقول بحق أن القانون الروماني قد أخذ أيضاً مبادئ كثيرة عن القوانين المصرية في مختلف العصور بعد صبغها بصبغة رومانية. ولا غرو فقد بلغت القوانين المصرية إذ ذاك من الرقي ما جعل ديودورس الصقلي – وهو مؤرخ يوناني عاش في القرن الأول قبل الميلاد – يقول عنها: (إنها كانت جديرة بالإعجاب وأعجب بها العالم فعلاً) [مجلة الرسالة (২২৬/ ২০، بترقيم الشاملة آليا)]

আইনে ঢুকে পড়ে। এ দাবি ডেভিড সান্টিলানা (David Santillana) এর। তিনি তিউনিসিয়ায় ১৯৯০ সালে ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত Avant-projet per un futuro codice civile e commerciale tunisino (তিউনিসিয়ার দেওয়ানী ও বাণিজ্যিক আইন প্রকল্প)' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় এ অভিমত প্রকাশ করেন।[৫]

ডেভিড সান্টিলানা'র (D. Santillana) পর এ অভিমত প্রকাশ করেন মুহাম্মদ হাফিয সাবরী। তিনি ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে মিসরে প্রকাশিত তাঁর المقارنات والمقابلات (তুলনামূলক আইন) নামক গ্রন্থে তাঁর এ অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, 'রোমান আইন প্রাচ্যের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর সাথে মিলে-মিশে উন্নত ও সুশৃঙ্খল হবার পর রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো এবং তার বাইরের দেশগুলোর আইন ব্যবস্থায় পরিণত হয়। অতঃপর তার বিধি-বিধান ও নিয়ম-নীতিগুলো ইহুদী আইনেও ঢুকে পড়ে। ঈসা আ.-এর জন্মের আগে এবং পরে রোমান কর্তৃক ইহুদী রাষ্ট্র দখল করে নেয়ায় এ ব্যাপারটি ঘটে। ইসলাম রোমান সাম্রাজ্যের অধীন রাষ্ট্রগুলো, যথাঃ সিরিয়া, মিসর, আফ্রিকা, আলজেরিয়া, মরক্কো ইত্যাদি দেশগুলো যখন বিজয় করে নেয়; তখন সে সব দেশে রোমান আইন বাস্তবায়িত ছিল। তখন ইসলাম সে সব আইনের মধ্য হতে কিছু আইন বিলুপ্ত ঘোষণা করে আর কিছু আইন আত্মস্থ করে নেয়। এ কারণেই মু'আমালাহ্ তথাঃ দেওয়ানী, বাণিজ্য ও অপরাধ আইনের ক্ষেত্রে ইসলামী আইনের অধিকাংশ ধারাগুলো ইহুদী ও রোমান আইনের সাথে সাদৃশ্যশীল দেখা যায়।[৬]

ড. মা'রুফ আদ-দুয়ালিবী তাদের এ বক্তব্য খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন,

> তাঁদের এ বক্তব্য আন্দাজ-অনুমান নির্ভর একটি দাবি। তা যে আন্দাজ-অনুমান নির্ভর একটি দাবি তা তাদের বক্তব্য হতেই প্রতীয়মান হয়। তারা বলেছেন, রোমান আইন মানুষের সামাজিক প্রথা ও অভ্যাসে পরিণত হয়; ফলে তা মুসলিম ফকীহদের অজান্তেই ইসলামী আইনে ঢুকে পড়ে। এটাই এ বক্তব্যের প্রথম দুর্বলতা ও অসারতা বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ কোন প্রাচ্যবিদ বা যারা এরূপ বক্তব্য দিয়েছেন তারা রোমান আইন ইসলামী আইনে কিভাবে ঢুকে পড়লো; তার কোন বিবরণ দিতে পারেন নি।[৭]

---

৫. দেখুন, মা'রুফ আদ্দুয়ালিবী, *আল-হুকুক আর-রুমিয়া ওয়া আসারুহা ফিত্তাশরী আল-ইসলামী*, (ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ সম্পাদিত *'হাল লিল কানূন আর রুমানী তা'ছীরুন আলাল ফিক্হিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২-৯৬

৬. মুহাম্মদ হাফিয সবরী, *আল-মুকারানাতু ওয়াল মুকাবালাতু...*,

৭. ড. মা'রুফ আদ্দুয়ালিবী, *আল-হুকুক আর-রুমিয়া ওয়া আছারুহা ফিত্তাশরী আল-ইসলামী*, (ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ সম্পাদিত, *'হাল্ লিল-কানূন আর রুমানী আছারুন আলাল ফিকহিল ইসলামী)*.প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

ডেভিড সান্টালিনা নিজেই তার এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করার পর প্রশ্ন করেন, কিভাবে তা ঢুকে পড়ল? তারপর জবাব দিতে গিয়ে বলেন, 'এ প্রসঙ্গে গবেষণা ও অনুসন্ধান চালানো নিঃসন্দেহে অত্যন্ত লাভজনক।' অতঃপর তিনি বলেন, 'তবে এখানে সে বিষয়ে গবেষণা করা সম্ভব নয়।'[৮]

তাঁদের এ বক্তব্যই প্রমাণ করে যে, এ দাবি প্রমাণ বিহীন অনুমান নির্ভর একটি দাবি। তাছাড়া এ বক্তব্যের অসারতা ঐতিহাসিক দলীল-প্রমাণগুলোও প্রমাণ করে। ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত সত্য এটাই যে,

ক) রোমান আইন আসলে কেবল রোমের অধিবাসী রোমানদের উপরই কার্যকর ছিল। অতঃপর সম্ভবত তা ইটালির অধিবাসী ল্যাটিনদের উপরও কার্যকর করা হয়েছিল। এদের ছাড়া রোম সাম্রাজ্যের অন্য কোন জাতি-গোষ্ঠীর উপর এ আইন কার্যকর করা হয় নি।

খ) যে সব অঞ্চলে পূর্ব থেকে উন্নত আইনব্যবস্থা কার্যকর ছিল সে সব অঞ্চলে রোমান-পরবর্তীকালের আইনব্যবস্থা কার্যকর করা হয় নি।

গ) সিরিয়া, ইরাক ও মিসরে প্রাচ্যের মিসরীয় ও কাল্‌দানীয় আইন ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। এ অঞ্চলগুলো মিসরীয় ও কাল্‌দানীয় আইন দ্বারা পরিচালিত হত।[৯]

ঘ) পরবর্তীকালের রোমান আইন ব্যবস্থা বস্তুতপক্ষে প্রাচ্যের আইন ব্যবস্থার মত। কারণ তা নিজেই প্রাচ্যের আইন ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত। প্রাচ্যের আইন ব্যবস্থাকে তা প্রভাবিত করতে পারে নি।

উল্লিখিত ঐতিহাসিক বাস্তবতার দিকে নজর দিলে আমরা দেখতে পাই যে, প্রাচ্যবিদদের পূর্বোক্ত বক্তব্য ও ধারণা দলীল-প্রমাণ বিহীন এবং অনুমাননির্ভর একটি ধারণা। ঐতিহাসিক বাস্তবতার সাথে যা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কাজেই তার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

আমরা তাঁদের প্রথম দাবি ও যুক্তি খণ্ডনের জন্য আর একটি ঐতিহাসিক সত্য এখানে উল্লেখ করতে চাই। যা তাঁদের অনুমান-নির্ভর দাবির সম্পূর্ণ বিপরীত। সে ঐতিহাসিক সত্যটি হলো: যে সব দেশে রোমান আইনের সাথে ইসলামী আইনের মিলন ঘটেছে বলে ধারণা করা হয় এবং প্রথমোক্ত আইন ব্যবস্থার নিয়ম-নীতি দ্বিতীয়টিতে প্রবেশ করেছে বলে দাবি করা হয়; সেই দেশগুলো হলো: মিসর ও সিরিয়া। কারণ এ দুটি দেশে রোমান শাসনের পতন ঘটিয়ে ইসলামী শাসন প্রবর্তন করা হয়। মিসর সম্পর্কে ঐতিহাসিক সত্য এটাই যে, মিসর রোমান সাম্রাজ্যের আওতাভুক্ত থাকলেও তাকে তখনও বিদেশ গণ্য করা হত। মিসরবাসীকে কখনো

---

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

৯. প্রাগুক্ত পৃ. ৯৩

রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ণ নাগরিকত্ব দেয়া হয় নি। ফলে মিসরবাসী রোমান আইন দ্বারা শাসিত হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তবে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরটিকে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছিল, এবং তা রোমান আইন দ্বারা শাসিত হবার অধিকার লাভ করেছিল। ফলে রোমান আইন সেখানে পূর্বে বিদ্যমান আইন ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। পূর্বের আইনকে রোমান আইন প্রভাবিত করতে পারে নি।[১০] অতএব প্রমাণিত হয় যে, পরবর্তীকালে স্বয়ং রোমান আইনের উন্নয়ন ঘটেছিল প্রাচ্যের আইন ব্যবস্থার সংস্পর্শে আসার ফলে।

ইসলামী যুগে মিসরে 'আহলুর রায়' বা যুক্তিবাদী হানাফী মাযহাবের উন্মেষ ঘটে নি। যদি তাই হতো তা হলে হয়তো রোমান আইন দ্বারা ইসলামী আইন প্রভাবিত হয়েছিল বলে দাবি করা যেত। মিসর ছিল এমন মাযহাবের দেশ, যে মাযহাবে কেবল কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ করা হয়। কাজেই মিসরে যে মাযহাবের উন্মেষ ও বিকাশ হয়েছিল- অর্থাৎ শাফিয়ী মাযহাব; তাতে রোমান আইনের প্রভাব খুঁজতে যাওয়া অনর্থক বাতুলতা বৈ অন্য কিছু নয়। তাছাড়া মিসরে যে মাযহাবের বিকাশ হয়েছিল সে মাযহাবটির উন্মেষ হয়েছিল হিজায ও ইরাকে। অতঃপর তা মিসরে চলে যায়।[১১]

অন্যদিকে বৈরূত ও সূর ছাড়া সিরিয়াতেও রোমান আইনের প্রয়োগে ছিল না। বরং সিরিয়ায় রোমান আইনের অধিকার-বঞ্চিত থাকার ব্যাপারটি মিসর থেকে বেশি স্পষ্ট। কেবল সিরিয়ার দুটি উপকূলীয় শহর তথা বৈরূত ও সূর ছাড়া বাকি গোটা সিরিয়া রোমান আইনের প্রভাবমুক্ত ছিল।[১২]

সিরিয়ার উপকূলীয় শহর (বৈরূত ও সূর) যাতে রোমান আইন বাস্তবায়িত ছিল তা-ই রোমান আইনকে প্রভাবিত করে, রোমান আইন তাকে প্রভাবিত করতে পারে নি। ফিনিশীয়রা যদি রোমান আইনকে প্রাচ্যের আইন ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত করে থাকে; তাহলে বলতে হয় যে, ঐ সব উপকূলীয় সিরিয়ান শহরের প্রভাবটাই বেশি, যাতে রোমান আইন বিশেষভাবে বাস্তবায়িত ছিল। কারণ সে শহরগুলো ছিল রোম সাম্রাজ্যের উপর কালদানী, ফিনিশীয় প্রভাব বিস্তারকারী শহরের প্রাণ কেন্দ্র। ঐ শহরগুলোই এ অবস্থায় রোমান আইন ব্যবস্থার উপর প্রভাব সৃষ্টি করে রোমান আইন তার উপর প্রভাব বিস্তার করার পূর্বে।[১৩]

দুই আরব সাম্রাজ্য যেমন: গাস্সানী ও লিহয়ানী সাম্রাজ্য এবং কূফা শহরের উপর রোমান আইনের কোন প্রভাব পড়ে নি। সিরিয়ার পূর্বে অবস্থিত ছিল আরব গাস্সানী

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
১১. প্রাগুক্ত
১২. প্রাগুক্ত
১৩. প্রাগুক্ত

সাম্রাজ্য। এ শহরের শাসন ব্যবস্থায় তার নিজস্ব ঐতিহ্য প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। মূলত এ শহরটিই ছিল ইরানী শহর। উক্ত সাম্রাজ্যের পূর্বে দুই প্রধান নদীর মধ্যে অবস্থিত ছিল কালদানীদের আবাস এবং তাতে ছিল আরব লিহয়ানীদের সাম্রাজ্য। তারাও ছিল ইয়ামানী বংশোদ্ভূত।[১৪]

আর আরব লিহয়ানী সাম্রাজ্যের পূর্বে এবং ফুরাত নদীর পশ্চিম উপকূলে আরব কুফা শহরের অবস্থান। এ শহরের অধিবাসীগণ নিরেট ইয়ামানী আরব। এ শহরেই মূলত ইসলামী আইনের উন্মেষ ও উন্নয়ন ঘটেছে। আর তা ঘটেছে 'আহলুর রায়' বা যুক্তিবাদী মাযহাব গ্রহণকারী হানাফী ফকীহ্দের হাতেই। ব্যাপার যদি তাই হয়; তা হলে একথা বলা যে, এ দুই দেশে রোমান আইনের প্রভাব পড়েছিল; তা বাস্তবতা, যুক্তি ও বুদ্ধি-বিবেচনার বিপরীত। বিশেষত এ কারণে যে, পরবর্তী রোমান আইন প্রাচ্য প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা দেখেছি যে, তা বৈরূত ও সূর শহরের সীমানা অতিক্রম করে নি। কেবল ঐ দুইটি শহরেই তার বাস্তবায়ন সীমাবদ্ধ ছিল।[১৫]

ইসলামী আইনের উন্নয়নে সিরিয়ার তেমন কোন প্রভাব ছিল না। ইতিহাস থেকে এমন কোন তথ্য জানা যায় না যে, সিরিয়াতে কোন স্বাধীন ইসলামী মাযহাবের উন্মেষ ঘটেছিল। কারণ ইসলামী আইনের উষালগ্নে সিরিয়া ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসদের মতাদর্শ অনুসারী মাযহাবের প্রভাবাধীন ছিল। যেমন হিজায তথা মক্কা-মদীনাও এ মতাদর্শের অনুসারী ছিল।[১৬] এ কারণেই সিরিয়ায়ও ইসলামী আইনের উন্নতি-অগ্রগতি এবং রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত হবার জন্য উপযুক্ত স্থান ছিল না।

ইমাম 'আবদুর রাহমান আল আওযায়ী (৮৮-১৫৭ হি.) রহ. যার মাযহাব সম্পর্কে বলা হয় যে, তা একমাত্র মাযহাব, যার উন্মেষ সিরিয়াতে হয়েছে। সে মাযহাবটিও ছিল মুহাদ্দিসদের মতাদর্শ অনুসারী মাযহাব। এ মাযহাব ইরাকী আহলুর রায়ের মাযহাবের সামনে টিকে থাকতে পারে নি। ফলে এ মাযহাবটি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। এ মাযহাবের বিদায় নেয়ার সাথে সাথে রোমান আইনের কোন প্রভাব ইসলামী আইনের উপর থাকলেও তা প্রমাণ করার সমস্ত আশা ভরসার মৃত্যু ঘটেছে।[১৭]

প্রাচ্যবিদদের উপর্যুক্ত দাবি প্রসঙ্গে ড. হামিদুল্লাহ্ বলেন,

> এতে কারো মতভেদ নেই যে, নবী স. হলেন ইসলামী আইনের মূল উৎস। মানুষ আল-কুরআন পেয়েছে রাসূলুল্লাহ্ স.-এর কাছ থেকে। তাদের কাছে তিনিই তা নিয়ে এসেছেন। আর সুন্নাহ! তা তো মহানবী স.-এর কথা, কর্ম ও সমর্থনেরই নাম। সাথে

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২-৯৬

আছে তাঁর সাহাবীদের কর্ম। রাসূলুল্লাহ্ স. গ্রিক, ল্যাটিন, এমন কি সুরিয়ানী ভাষার কিছুই জানতেন না। তিনি এসব ভাষা জানলে না হয় বলা যেত যে, তিনি ঐ সব ভাষার মাধ্যমে রোমান আইন সম্পর্কে অবগত হয়ে ইসলামী আইনকে তা দ্বারা প্রভাবিত করেছেন। তিনি তাঁর জন্মলগ্ন হতে মক্কাতেই ছিলেন। গোটা জীবন আরব উপদ্বীপেই কাটিয়েছেন। যা ছিল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ প্রভাব মুক্ত। তিনি তাঁর পুরো জীবনটাই তাঁর নিজের গোত্রের সাথে হিজাযেই কাটিয়েছেন। আর তাঁর বাণিজ্যিক সফরকালে বাইজান্টাইন ভূমিতে যে সময় কাটিয়েছেন তাও ছিল অতি স্বল্প দিনের জন্য সংক্ষিপ্ত সফর। কয়েক দিনের বা কয়েক সপ্তাহের জন্য মাত্র। তিনি জীবনে দুইবার উত্তর ফিলিস্তিনে ব্যবসার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। প্রথমবার গিয়েছিলেন তাঁর চাচা আবু তালিবের সাথে মাত্র নয়-দশ বছর বয়সে।[১৮] আর দ্বিতীয় বার গিয়েছিলেন প্রায় চব্বিশ বছর বয়সে। এ সময় তিনি দুই বা তিন সপ্তাহের বেশি সেখানে অবস্থান করেন নি।[১৯]

এতদ্ব্যতীত মহানবীর সাহাবীদের মধ্যে রোমান আইনে বিশেষজ্ঞ কোন সাহাবীকেও দেখা যায় না। সুতরাং আমরা এ কথা বলতে বাধ্য যে, ইসলামী আইনের যেসব বিধান পবিত্র কুরআন বা হাদীস থেকে সরাসরি সংগৃহীত, তাতে রোমান আইনের কোন ধরণের প্রভাব নেই।

স্বভাবতই ইসলামী আইন প্রাথমিক পর্যায়ে সমাজিক প্রথা ও অভ্যাস মত গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ মক্কার সমাজিক প্রথা- যেখানে নবী স.-এর জন্ম; আর মদীনার সামাজিক প্রথা- যেখানে নবী স. হিজরত করে গিয়ে জীবনের বাকি দশটি বছর অতিবাহিত করেছেন- অতঃপর আরব ভূমির সামাজিক প্রথার উপর ভিত্তি করে ইসলামী আইন গড়ে উঠেছে। আমরা আরব উপদ্বীপের কোথাও; ইয়ামান ব্যতীত যেখানে কিছু দিন হাবশীরা শাসন করেছে; সরাসরি বা কোন মাধ্যমে রোমান আইনের প্রভাব পড়ার কথা দেখতে পাই না। আরব উপদ্বীপের উত্তর প্রান্তে নামমাত্র বাইজান্টাইন শাসন দেখতে পাই। যেখানে বাইজান্টাইনরা তাদের আইন বাস্তবায়ন করেনি। রোমের ইতিহাসবিদগণ তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন।[২০]

আরব ব্যবসায়ীরা, বিশেষত মক্কার ব্যবসায়ীরা বাইজান্টাইন দেশগুলোর বাজারগুলোতে প্রায়ই যেতেন। এ সব ব্যবসায়ী ইরাকের বাজারগুলোতেও যেতেন। যা কি-না তখন

---

১৮. ইবন কাছীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,* বৈরূত : দারুল ফিক্র, খ. ২, পৃ. ৩৪৮ ;
لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة سنة خرج به عمه أبو طالب إلى الشام في العير التي خرج فيها للتجارة ونزلوا بالراهب بحيرى .فقال لابي طالب بالسر ما قال .

১৯. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল ফিত্ তারীখ*, মিসর, ২য় সংস্করণ, ১৩০৩ হি., খ. ১, পৃ. ২৫০

২০. ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ, *তাছীরুল হুকুক আর রুমিয়া আলাল ফিক্হিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

ইরানের (সাসানী শাসনের) অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ ছাড়াও তারা অন্যান্য বাজারেও ব্যবসার উদ্দেশ্যে যাতায়ত করত। যদি বলা হয় যে, এসব ব্যবসায়ী রোমান আইনের কিছু চিন্তা-চেতনা ইসলামের আবির্ভাবের আগেই আত্মস্থ করে নিজের দেশে নিয়ে এসেছিল; তা হলে আমরা এ সম্ভাবনা পুরোপুরিভাবে উড়িয়ে দিতে চাই না। তবে তাদের এ দাবি যে, ঐ ব্যবসায়ীরা কেবল রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল; অন্যান্য দেশের আইনব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয় নি; এ কথা মেনে নেয়া যায় না। কারণ তা আসলে দলীল-প্রমাণ বিহীন একটি দাবিকে অগ্রাধিকার দান ছাড়া আর কিছুই নয়। যা মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি মেনে নিতে পারে না।

এতদ্ব্যতীত প্রাচীন ইসলামী আইনগুলোর প্রায় সব মাযহাব এমন সব স্থানে বেড়ে উঠেছিল যেখানে বাইজান্টাইনদের প্রভাব ছিল না; যেমন, হিজায ও ইরাকে। শিয়া মাযহাব সম্বন্ধে যেমন এ কথা সত্য; তেমনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মায্হাবগুলো সম্বন্ধেও সত্য। যাইদিয়া ও ইমামিয়া শিয়া মাযহাব দুটি এবং হানাফী ও মালিকী সুন্নী মাযহাব দুটি কুফা ও মদীনা শহরে বেড়ে উঠেছে। এ দুটি শহরেই ছিল নিরেট আরবী শহর। একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী আইনবিদ যিনি এসব মাযহাবের সমসাময়িক ছিলেন এবং বৈরূতে বসবাস করতেন তিনি হলেন ইমাম আবদুর রাহমান আল আওযায়ী রহ.। তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিকে বৈরূতে কাটিয়েছিলেন, এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছেন। অবশ্য তার মাযহাবটি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। আর শাফিয়ী ও হাম্বলী মাযহাব দুটিরও বাইজান্টাইন প্রভাবের বাইরে বাগদাদে উন্মেষ হয়। ইমাম শাফিয়ীর মিসরে অবস্থান তেমন বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে না। কারণ তা ছিল তাঁর জীবনের শেষ দিকে তাঁর মাযহাব বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বাইরে প্রতিষ্ঠিত হবার পর। অর্থাৎ ইরাক এবং হিজাযে প্রতিষ্ঠিত হবার পর। সুতরাং তিনি মিসর যাবার পর তাঁর মাযহাবের উপর তৃতীয় শতাব্দীতে রোমান আইনের প্রভাব পড়েছে এমন কথা বলা যায় না।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, উমাইয়াদের রাজধানী দামেস্ক শহরটি বাইজান্টাইন এলাকাভুক্ত ছিল। তবে সে সময় দামেস্ক শহরে চর্চা হতো আল-কুরআন, আল-কুরআনের তাফসীর, হাদীস, আরবী সাহিত্য ও মেডিকেল সাইন্স। উমাইয়াদের যুগে রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কোন পূর্ব অঞ্চলে মুসলিম আলিমদের মধ্যে কেউ ইসলামী আইন চর্চা করতেন তেমন দেখা যায় নি। আব্বাসীয়রা উমাইয়াদের হাত থেকে ক্ষমতা দখল করে নেয়। অতঃপর অল্প কিছু দিন দামেস্কে বসে দেশ শাসন করার পর রাজধানী দামেস্ক হতে বাগদাদে নিয়ে যায়। যা ছিল ইতঃপূর্বে ইরানী শাসনের অন্তর্ভুক্ত একটি শহর। যার চর্তুদিকে ছিল ইরানী কালচার, রোমান কালচার নয়। আব্বাসীয়দের আমলেই ইসলামী আইন চর্চার ধুম পড়ে। তখনই মুসলিম ফকীহ্গণ ইসলামী আইনের উপর ব্যাপকভাবে গবেষণা আরম্ভ করেন। অবশ্য এর

জন্য ধন্যবাদ দেয়া যায় আব্বাসী খলীফা আবূ জা'ফর আল-মানসূর (৭১৪-৭৭৫ খ্রি.)কে, যিনি তাঁর শাসনকালে (৭৪৫-৭৭৫ খ্রি.) ইসলামী আইন চর্চার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তিনি ইমাম মালিক (৭১২-৭৯৫ খ্রি.) রহ্-এর কাছে ইসলামী আইনের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে বলেছিলেন,

> আপনি এ দীনের জ্ঞান সম্বলিত একটি গ্রন্থ রচনা করুন। তাতে ইবনু ওমরের কড়াকড়ি আর ইবনু আব্বাসের সহজতা এবং ইবনু মাসউদের ব্যতিক্রমধর্মী মতামত পরিহার করুন। আর মধ্যপন্থা অবলম্বন করুন। সাহাবা ও ইমামগণের ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত অভিমতগুলো গ্রহণ করুন।[২১]

অন্য একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, খলীফা আবু জা'ফর আল-মানসূর খিলাফত গ্রহণ করার আগে এবং পরে অত্যন্ত জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান লোক বলে পরিচিত ছিলেন। তাই তিনি ইমাম মালিক রহ.-কে বলেছিলেন,

> হে আবু আব্দুল্লাহ! এই মাটির উপরে আপনার আর আমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী আর কেউ বর্তমানে বেঁচে নাই। আমাকে খিলাফত ব্যস্ত রেখেছে। সুতরাং আপনি মানুষের জন্য এমন একটি গ্রন্থ রচনা করুন, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে পারবে। তাতে ইবনু আব্বাসের সহজতা আর ইবনু ওমরের কঠোরতা পরিহার করুন। আর তা মানুষের জন্য সহজেই অনুকরণীয় করে রচনা করুন। ইমাম মালিক বলেন, আল্লাহর কসম! তিনিই সে দিন আমাকে গ্রন্থ রচনার পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন।[২২]

অপর এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, খলীফা হারুন আর-রাশীদ (৭৬৬-৮০৯ খ্রি.) ইমাম মালিক রহ.-কে এ আবেদন জানিয়েছিলেন। তিনি গ্রন্থটিকে দেশের সমস্ত বিচারালয়ে বাস্তবায়নের ইচ্ছাও পোষণ করেছিলেন।[২৩]

---

২১. যুরকানী, *মুকাদ্দামা শারহু মুআত্তা ইমাম মালেক*, খ. ১, পৃ. ৯

ضع هذا العلم ودوّن فيه كتاباً، وتجنب فيه شدائد ابن عمر، ورخص ابن عباس، وشواذ ابن مسعود واقصد أواسط الأمور وما أجمع عليه الصحابة والأئم

২২. *তারীখে ইবন খালদুন*, খ. ১, পৃ. ১৭-১৮

و قد كان أبو جعفر بمكان من العلم و الدين قبل الخلافة و بعدها و هو القائل لمالك حين أشار عليه بتأليف الموطإ يا أبا عبد الله إنه لم يبقى على وجه الأرض أعلم مني و منك و إني قد شغلتني الخلافة فضع أنت للناس كتاباً ينتفعون به تجنب فيه رخص ابن عباس و شدائد ابن عمر و وطئه للناس توطئة قال مالك فوالله. لقد علمني التصنيف يومئذ؛ (مقدمة ابن خلدون (১/ ৩০))

২৩. দেখন, ড. ইউসুফ আল কারযাভী, *আস সাহওয়াতুল ইসলামিয়া বাইনা ইখতিলাফিল মাশরু ওয়াত তামাযযুক আল মাযমুম*, দারুশ শরুক, ২০০১ খ্রি., পৃ. ৭৪;

ولهذا لما استشار الرشيد مالكا أن يحمل الناس على "موطئه" في مثل هذه المسائل منعه من ذلك

আব্বাসীদের পূর্ববর্তী যুগে অর্থাৎ খুলাফায়ে রাশিদা ও উমাইয়া যুগে আরব উপদ্বীপের বাইরে কুফা নগরী ছাড়া অন্য কোথাও ইসলামী আইন নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে বলে জানা যায় না। সে শহরটিও বাগদাদের কাছেই অবস্থিত। এ শহরটিও বাগদাদের মত রোমান প্রভাব মুক্ত ছিল। বরং রাজধানী বাগদাদের চেয়ে বেশি প্রভাব মুক্ত ছিল। কারণ কুফা হচ্ছে দেশের এক প্রান্তে অবস্থিত মুসলিম সেনাবাহিনীর আবাসস্থল। বাণিজ্যিক নগরী হলে সেখানে ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক অঞ্চল ও এলাকা থেকে লোকজন আসত। ফলে রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত হবার কিছুটা সম্ভাবনা থাকত।[২৪] কিন্তু কুফা শহরটি তা ছিল না। তা ছিল নিরেট একটি আরবী শহর, যা সম্পূর্ণভাবে রোমান প্রভাব মুক্ত।

দুই. ইসলামী আইন শুধু আরবজাতির চিন্তা প্রসূত নয়; তাতে ব্যাপকভাবে অন্য জাতির চিন্তার ফসলও বিদ্যমান

প্রাচ্যবিদদের দ্বিতীয় দাবি হলো: ইসলামী আইন একা আরবদের চিন্তা প্রসূত নয়; বরং তার উপর অন্যান্য জাতির চিন্তা-চেতনার প্রভাবও ব্যাপকভাবে পড়েছে।

তাঁদের মতে, ইসলামী আইন হিজরী দ্বিতীয় শতকে প্রায় পূর্ণতা লাভ করে সংকলিত হয়েছে এবং তা পূর্ণতা লাভ করেছে বৈরূত ও সিরিয়ায় অবস্থিত খ্রিস্টান আইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক হবার ফলে। এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন প্রফেসর Henri Masse তাঁর ফরাসী ভাষায় লিখিত L. Islam,'ল-ইসলাম' নামক গ্রন্থে।[২৫] মোট কথা আরবরা সিরিয়া এবং ইরাক বিজয় করার পর ঐসব দেশে পূর্ব থেকে বিদ্যমান খ্রিস্টান আইন বিদ্যালয়গুলোর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। আর সেখান হতেই ইসলামী আইনের উপর রোমান খ্রিস্টান আইনের প্রভাব পড়ে।

তাঁর এ বক্তব্য ও দাবি খণ্ডন করতে গিয়ে ড. মা'রুফ আদ্দুয়ালিবী বলেন,

> এ দাবিটিও ঐতিহাসিক সত্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কারণ আরবরা ইরাক ও সিরিয়া ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে বিজয় করে নেয়। এর প্রায় এক যুগেরও আগে গোটা রোমান সাম্রাজ্যে তিনটি আইন বিদ্যালয় ছাড়া আর কোন আইন বিদ্যালয় ছিল না।[২৬]

এ প্রসঙ্গে Collinet তার 'বৈরূতস্থ শিক্ষালয়ের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে বলেন,

> সম্রাট Justinian (জাস্টিনিয়ান) গোটা রোমান সম্রাজ্যে তিনটি বিদ্যালয় ছাড়া অপর কোন সরকারী বিদ্যালয় রাখেন নি। দুটি বিদ্যালয় সাম্রাজ্যের দুটি বড় শহরে রোম ও কনেস্ট্যান্টিনোপলে অবস্থিত ছিল। আর তৃতীয়টি ছিল বৈরূতে।

---

২৪. ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ, *তাছীরুল হুকুক আর রুমিয়া আলাল ফিক্‌হিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫

২৫. Henri Masse, L. Islam, Paris, 1930, p. ৭২-৭৫ ; ড. হামিদুল্লাহর প্রাগুক্ত গ্রন্থ হতে সংগৃহিত।

২৬. ড. মা'রুফ আদ্দুয়ালিবী, *আল-হুকুক আর-রুমিয়া ওয়া আছারুহা ফিত্‌তাশরী আল-ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

> মিসরের 'আলেকজান্দ্রিয়া' এবং ফিলিস্তিনের 'কাইসারিয়া' শহরের বিদ্যালয় দুটি সহ অন্যান্য বিদ্যালয়গুলো বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ইতঃপূর্বে 'আসিনা' শহরের বিদ্যালয়টিও বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।[২৭]

বৈরূতের বিদ্যালয়টি বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল ১৬ই জুলাই ৫৫১ খ্রিস্টাব্দে এবং তা বন্ধ করা হয়েছিল একটি ভূমিকম্পনের পর বৈরূত শহরটি প্রায় ধ্বংস হয়ে যাবার কারণে। সে ভূমিকম্পনে তখন বৈরূতে প্রায় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) লোক মারা যায়। তাদের অনেকেই ছিল বিদেশী বনেদী পরিবারে ছাত্র। যারা আইন অধ্যয়নের জন্য বৈরূতে এসেছিল। এ ঘটনাটা ঘটে ছিল মহানবী স. এর ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করার প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে।[২৮]

প্রফেসর Collinet আরো বলেন,

> ৬০০ খ্রিস্টাব্দে বৈরূত শহরটি প্রায় ধ্বংস প্রাপ্ত ছিল। ফলে অত্যন্ত সহজেই তা ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের দখলে চলে আসে। তখনও বৈরূতে অবস্থিত আইন বিদ্যালয়টি পুনর্নির্মাণ করা হয় নি। অবশ্য বৈরূত ধ্বংস হবার পর পর বিদ্যালয়টি বৈরূত থেকে সরিয়ে 'সায়দা' শহরে নিয়ে যাওয়া হয়। বৈরূত শহর পুনর্নির্মাণ করা হলে; সেখানে পুনরায় নিয়ে আসা হবে এ উদ্দেশ্যে।[২৯]

সুতরাং এ সব ঐতিহাসিক সত্যতা প্রমাণ করে যে, 'আরবরা সিরিয়া এবং ইরাক বিজয়ের পর সেখানে প্রাপ্ত আইন বিদ্যালয়গুলোর সংস্পর্শে মুসলমানরা আসার পর ইসলামী আইন রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে'- এ ধারণা একটি অলীক, কাল্পনিক, ভিত্তিহীন ধারণা। যা ঐতিহাসিক সত্যতার সম্পূর্ণ বিপরীত।

তিন. ইসলামী আইন ও রোমান আইনের মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য বিদ্যমান

প্রাচ্যবিদদের তৃতীয় দাবিটি হলোঃ ইসলামী আইন ও রোমান আইনের মধ্যে তিনটি বিষয়ে সাদৃশ্য বিদ্যমান। বিষয় তিনটি হলোঃ

১. আইনের দর্শন।

২. আইনের ভাষা।

৩. আইনের পরিভাষা ব্যবহার।

ইসলামী আইন রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত না হলে; এতদুভয় আইনের মধ্যে এরূপ সাদৃশ্য থাকার কথা নয়। অতএব ইসলামী আইন রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত। এ

---

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

২৮. প্রাগুক্ত

২৯. প্রাগুক্ত

অভিমত ব্যক্ত করেন D. Santillana, Goldziher ও H. Masse।[৩০] Ignaz Goldziher তার এই ধারণা তার Introducation to Islamic Theology and Law ('ইসলামী আকীদা বিশ্বাস ও আইন') নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন ।[৩১]

তাঁদের এ দাবি প্রসঙ্গে ড. 'মা'রুফ আদ্দুয়ালিবী বলেন,

> তাঁদের এ দাবিটিও আন্দাজ-অনুমান নির্ভর, যার কোন প্রমাণ নেই। তাঁরা দাবি করেছেন, রোমান আইন ও ইসলামী আইনের মধ্যে সাদৃশ্য এ কারণেই হয়েছে যে, ইসলামী আইন রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ইসলামী আইন রোমান আইন থেকে অনেক কিছু নিয়েছে। কিন্তু কি করে নিল, কিভাবে নিল এবং কোথায় কোন আইনটি নিল? এসব প্রশ্নের কোন জবাব তাঁদের কাছে নেই। তারা সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারেন নি, ইসলামী আইনের এ ধারাটি রোমান আইনের অমুক ধারা থেকে নেয়া হয়েছে। কাজেই তাঁদের এ দাবিটিও একান্তই আন্দাজ-অনুমান নির্ভর, যার কোন সঠিক ভিত্তি ও প্রমাণ নেই।[৩২]

তাঁদের দাবি 'রোমান আইন ও ইসলামী আইনের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে'- এটি সব চেয়ে বড় কল্পনাপ্রসূত, আন্দাজ বা অনুমাননির্ভর একটি দাবি বলে প্রতীয়মান হয়। আমরা এ বিষয়ে এখানে পাঠকদের সামনে সংক্ষেপে আলোচনা পেশ করতে চাই।

যদি সত্যিই -তাঁদের দাবি মতে- দুই আইন ব্যবস্থার মধ্যে চিন্তা-দর্শন, ভাষার ব্যবহার এবং আইনের পরিভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকে; তা হলে আমরা তা সবচেয়ে বেশি দেখতে পাব তৃতীয় বিষয়ে অর্থাৎ পরিভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে। আর তা এ কারণেই যে, দুনিয়ার প্রায় সকল মানুষের প্রয়োজন, জীবনের বাস্তবতা এবং চিন্তা-চেতনার মধ্যে একটি ঐক্য বিদ্যমান। এটাই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির অনিবার্য দাবি। আর এ কারণেই তাদের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সাদৃশ্য দেখা যায়। এমনকি কেউ কারো কাছ থেকে ধার করে ভাষা ব্যবহার না করলেও। অবশ্য মানুষের চিন্তা চেতনার ঐক্যের কারণে ভাষা ব্যবহারে সাদৃশ্যের দিকে D. Santillanaও ইঙ্গিত করেছেন। তিনি ফরাসী আইন ও ইসলামী আইনের ভাষার মধ্যে বিরাট সাদৃশ্য দেখে বিস্ময় বোধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে বলেন,

---

৩০. ড. মা'রুফ আদ্দুয়ালিবী, *আল-হুকুক আর-রুমিয়া ওয়া আছারুহা ফিত্তাশরী আল-ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

৩১. Ignaz Goldziher, *Introducation to Islamic Theology and Law*, Princeton Nj : Princeton University Press,1981

৩২. ড. মা'রুফ আদ্দুয়ালিবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

> আমরা যদি গভীরে প্রবেশ করি তা হলে আমরা মদীনা, কুফা ও কর্ডোভার মুসলমান আইনবিদদের চিন্তা-চেতনা এবং আমাদের (ফরাসী) আইনবিদদের চিন্তা-চেতনা এবং ভাষার মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখতে পাব তা দেখে আমরা বিস্ময় অভিভূত হব।[৩৩]

আর উভয় আইন ব্যবস্থার পরিভাষায় সাদৃশ্যের ব্যাপারটি, একটি আইন ব্যবস্থা অপর আইন ব্যবস্থা হতে কিছু জিনিস নিয়েছে বলে সন্দেহের উদ্রেক করে। এ কারণেই এ জাতীয় সাদৃশ্য প্রসঙ্গে আমরা এখানে একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে চাই।

পরিভাষার সাদৃশ্য প্রসঙ্গে বিশেষ পর্যালোচনা

ঐতিহাসিক সত্যতা প্রমাণ করেছে যে, রোমান আইনের শেষ সংস্করণে প্রাচ্যের বিরাট উপাদান ছিল। রোমান আইনের শেষ সংস্করণ হতে প্রাচীন রোমান আইনের সব মৌলিক পরিভাষা বাদ দেয়া হয়নি। বরং তার বিরাট একটা অংশ বাদ দেয়া হলেও অপর একটা অংশ নতুন সংস্করণে রেখে দেয়া হয়েছিল। কারণ পুরাতন মৌলিক পরিভাষাগুলোই প্রকৃতপক্ষে রোমান আইনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল।

সুতরাং রোমান আইনের এ প্রকারের পরিভাষাগুলো যে জাতির আইন ব্যবস্থায় পাওয়া যাবে; সে জাতির আইনব্যবস্থায় রোমান আইনের প্রভাব পড়েছে বলে মনে করার পক্ষে একটা বড় দলীল পাওয়া গেছে বলে আমরা মনে করতে পারব। অতঃপর তা প্রমাণ করার জন্য আমরা গবেষণায় লেগে যাব।

রোমান আইনের পরিভাষার প্রকার

রোমান আইনের পরিভাষাগুলো-তা পুরাতন রোমান আইনের হোক বা নতুন সংস্করণকৃত রোমান আইনের হোক- মূলত চার প্রকার:

এক. পুরাতন মৌলিক পরিভাষা, যা তারা শেষ সংস্করণের সময় বাদ দিয়েছে, সংরক্ষণ করে নি। এ ধরণের পরিভাষার সংখ্যা অনেক।

দুই. পুরাতন মৌলিক পরিভাষা, যার অর্থের কোন পরিবর্তন না করে নতুন সংস্করণে ব্যবহার করে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে।

তিন. পুরাতন মৌলিক পরিভাষা, যার কিছুটা অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন সংস্করণে ব্যবহার করে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

চার. নতুন সৃষ্ট পরিভাষা, যা কেবল রোমান আইনের শেষ সংস্করণে ব্যবহার করা হয়েছে।

আমরা প্রাচ্যবিদদের পেশ করা উদাহরণগুলোর দিকে তাকালে -যার সম্পর্কে তাঁরা দাবি করেছেন যে, উভয় আইনের এই পরিভাষাগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান-

---

৩৩. দেখুন, D. Santillana, *Code civil et Commercial Tunisien Avant Propos*, Tunis : 1899, p. xii

দেখতে পাই যে, প্রাচ্যবিদরা উভয় আইনের যে সব পরিভাষায় সাদৃশ্য আছে বলে দাবি করেছেন তার মধ্যে এমন একটি পরিভাষাও খুঁজে পাওয়া যায় না, যা প্রাচীন রোমান আইনে ছিল আবার ইসলামী আইনেও আছে। এমনকি ঐ পরিভাষাটি রোমান আইনের শেষ সংস্করণে ব্যবহৃত হয়েছে, আবার ইসলামী আইনেও ব্যবহৃত হচ্ছে এমনটিও দেখা যায় না। তবে তাঁদের দাবি মতে যে সব পরিভাষায় সাদৃশ্য দেখা যায়; তা কেবল রোমান আইনের শেষ সংস্করণেই বিদ্যমান। এটা এক চরম বাস্তব সত্য এবং ভেবে দেখার মত বিষয়। এর কারণ উদঘাটন করাও জরুরী।

প্রাচ্যবিদরা দাবি করেছেন যে, রোমান আইন ইসলামী আইনের উপর নিঃসন্দেহে প্রভাব ফেলেছে। এ দাবিটি ঐতিহাসিক সত্যের বিপরীত একটি দাবি। কারণ তাঁরা আমাদেরকে বলতে পারেননি, কেন রোমান আইনের কেবল নতুন সংস্করণের নতুন পরিভাষা আর ইসলামী আইনের পরিভাষায় কিছুটা সাদৃশ্য বিদ্যমান? এ সাদৃশ্য প্রাচীন রোমান আইনের একটি পরিভাষাতেও নেই কেন?

আমরা যদি তাঁদের আন্দাজ বা অনুমানকে উপেক্ষা করি, যার সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যে বলেছি যে, তা ঐতিহাসিক সত্যের বিপরীত- এমতাবস্থায়ও আমরা এ সন্দেহ দূর করার জন্য ঐতিহাসিক সত্যটা কি? যদি তা উদঘাটন করতে পারি; তবে তাঁদের এ সন্দেহ দূর করা এবং তার ব্যাখ্যাদান আমাদের পক্ষে সহজতর হবে। তাঁদের জবাব দানও সম্ভবপর হবে।

ঐতিহাসিক সত্যটি হলো: রোমানরা ভূমধ্যসাগর অধ্যুষিত অঞ্চল বিজয় করে নেয়ার পর সেখানে রোমান আইনের নতুন সংস্করণ বাস্তবায়ন করে। আর এ সময় রোমান আইন প্রাচ্য প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। আমরা আরো জানি যে, ইসলামী আইনেও প্রাচ্যের প্রভাবের বিষয়টি একটি মৌলিক বিষয়।

প্রাচ্যের অঞ্চলগুলো বিজয় করে নেয়ার পর রোমান আইনে প্রাচ্যের অনেক উপাদান ঢুকে পড়ে এবং সে উপদানগুলো ছিল মানুষের জীবনাচরণ, সামাজিক প্রথা এবং প্রাচ্যের বিদ্যমান আইন ব্যবস্থা থেকে অর্জিত। আর এই জীবনাচরণ ও সামাজিক প্রথাই হলো ইসলামী আইনেরও অন্যতম মূল ভিত্তি। এ কারণেই উভয় আইনের যে সব পরিভাষায় সাদৃশ্য দেখা যায়; তা কেবল রোমান আইনের নতুন সংস্করণের পরিভাষার সাথে সম্পৃক্ত। প্রাচীন রোমান আইনের কোন মৌলিক পরিভাষার সাথে ইসলামী আইনের কোন পরিভাষার সাদৃশ্য দেখা যায় না।

ঐতিহাসিক সত্য সমর্থিত এ ব্যাখ্যা প্রমাণ করে যে, রোমান আইনের কোন প্রভাবই প্রাচ্যের জীবনাচরণ ও সামাজিক প্রথায় পড়ে নি। সুতরাং তা পরবর্তীকালে ইসলামী আইন ব্যবস্থায় প্রভাব ফেলেছে এমন ধারণা একটি ভুল ধারণা ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রাচ্যবিদরা ইসলামী আইনের ব্যাপারে যেরূপ বাড়াবাড়ি করেছে; আমরা রোমান আইনের ব্যাপারে সেরূপ বাড়াবাড়ি করতে চাই না। আমরা বলতে চাই না যে,

রোমান আইনের নতুন সংস্করণে প্রাচ্যের জীবন আচরণ ও সামাজিক প্রথার ভিত্তিতে যেসব নতুনত্ব এসেছে সেটা নিঃসন্দেহে প্রাচ্যের প্রভাব। বরং প্রফেসর সান্টিলিনা কখনো কখনো যে রূপ বক্তব্য ও অভিমত গ্রহণ করেছেন আমরা সেরূপ অভিমতই গ্রহণ করতে চাই। আমরা বলতে চাই, আমাদেরকে অবশ্যই বিভিন্ন সময় ও অবস্থায় মানুষের মাঝে যে চিন্তাগত ঐক্য দেখা যায়; তার প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করতে হবে। মানুষের মধ্যকার চিন্তাগত ঐক্য হয়ে থাকে জীবনের প্রয়োজন ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। যা প্রায় সব জাতির মধ্যে একই রকম হয়ে থাকে, এর বিপরীত হতে দেখা যায় না।

আমরা যদি প্রাচ্যবিদদের এ দাবিটি যে, 'উভয় আইন ব্যবস্থার পরিভাষাগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান।' এর তাৎপর্য উদঘাটনের দিকে গভীরভাবে নজর দেই, তাহলে দেখতে পাব যে, এ দাবির সত্যতা কেবল আভিধানিক অর্থের ক্ষেত্রে বিদ্যমান, পরিভাষাগত অর্থে এ দাবির সত্যতা দেখা যায় না।

আমরা এ বিষয়টাকে আরো বোধগম্য ও পরিষ্কার করার জন্য এখানে পাঠকদের সামনে উদাহরণ স্বরূপ এমন দুটি পরিভাষা পেশ করতে চাই, যে দুটি পরিভাষার মধ্যে সাদৃশ্য আছে বলে তাঁরা দাবি করেছেন। যাতে পাঠক বুঝতে পারেন যে, বাকি পরিভাষাগুলোর ব্যাপারও ঠিক একেই রকম। কারণ এখানে সব পরিভাষা নিয়ে কথা বলা সম্ভব নয়। পরিভাষা দুটি হলো: ইসলামী পরিভাষা 'ইজমা' আর রোমান পরিভাষা 'Consensus'।

১. ইজমা ও Consensus শব্দদ্বয়ের পর্যালোচনা

'ইজমা' শব্দটি ইসলামী আইনের একটি পরিভাষা। আর Consensus শব্দটি রোমান আইনের একটি পরিভাষা। Consensus শব্দটি একটি ল্যাটিন শব্দ। প্রাচ্যবিদরা দাবি করেছেন যে, এই উভয় শব্দের তাৎপর্যের মধ্যে একটি সাদৃশ্য বিদ্যমান। উভয় শব্দ আইনবিদদের ঐকমত্য বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়।'[৩৪]

রোমান আইনের Consensus বা ঐকমত্য সম্বন্ধে প্রফেসর A.E.Giffard বলেন,

> যখন বলা হয়; এ ব্যাপারে একাধিক আইনবিদ রয়েছেন। তখন এর মানে হয়, এ বিষয়ে আইনবিদদের একাধিক পরস্পর বিরোধী অভিমত রয়েছে। এসব পরস্পর বিরোধী অভিমতের মধ্য হতে কোন অভিমতটি গ্রহণ করতে হবে, আর কোন অভিমতটি বাদ দিতে হবে, সে ব্যাপারে বিচারালয় অনেক সময় বিভ্রান্তিতে পড়ে যেত। এ কারণেই সম্রাটের পক্ষ হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এতদুদ্দেশ্যে হস্তক্ষেপ করা

---

[৩৪] Henri Masse, *L. Islam*, Paris, 1930, p. 72-75; ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহর প্রাগুক্ত গ্রন্থ হতে সংগৃহিত।

হলো; আর আইন সংস্কার করে সংশোধনী আনা হলো; যাতে বিচার সংক্রান্ত একটি অভিমতকে বিধিবদ্ধ করা যায়।[৩৫]

অর্থাৎ কোন এক বিষয়ে আইনবিদদের বিভিন্ন ধরণের পরস্পর বিরোধী অভিমত থাকলে সংস্কার প্রক্রিয়ার মাধ্যেমে তা থেকে একটি অভিমতকে সম্রাট কর্তৃক অগ্রাধিকার দিয়ে বিধিবদ্ধ আইন বলে স্বীকৃত দানই হলো রোমান আইন মতে Consensus বা ঐকমত্য।

সংশোধন ও সংস্কার প্রক্রিয়ার স্তর

সম্রাটের পক্ষ হতে আইন সংস্কার করে যে সংশোধনী আসলো সে প্রসঙ্গে প্রফেসর A.E.Giffard বলেন, 'সংশোধন ও সংস্কার প্রক্রিয়া ক্রমান্নয়ে চার যুগে এবং চার স্তরে নিম্নরূপে সম্পন্ন করা হয়েছিল।'

এক. প্রথম সংস্কার প্রক্রিয়া সম্রাট অগাস্ট (Auguste) এর যুগ ২৭ খ্রিস্টাব্দ পূর্ব থেকে শুরু হয়ে সম্রাট হাডরিয়ান (Hadrian) এর যুগ ১১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলতে থাকে।

দুই. দ্বিতীয় সংস্কার প্রক্রিয়া হাডরিয়ানের যুগ থেকে সম্রাট কনেস্ট্যানটাইন (Constantine) এর যুগ পর্যন্ত চলে। (অর্থাৎ ১১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৩০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলে।)

তিন. তৃতীয় সংস্কার প্রক্রিয়া সম্রাট কনেস্ট্যানটাইন (Constantine) এর যুগ থেকে শুরু হয়ে দ্বিতীয় Theodore ও তৃতীয় Valentinien এর যুগ পর্যন্ত চলে।

চার. চতুর্থ সংস্কার প্রকৃিয়া দ্বিতীয় Theodore এর যুগ থেকে তৃতীয়Valentinien এর যুগ পর্যন্ত চলে।[৩৬]

সম্রাট অগাস্ট এর সংস্কার প্রসঙ্গে কথা হলো: ইতঃপূর্বে ধর্মীয় ব্যপারে রাষ্ট্রের অনুমোদন ও তত্ত্বাবধান ছাড়াই ধর্মীয় আইনবিদরা স্বাধীনভাবে তাদের আইনী অভিমত ব্যক্ত করে থাকতেন। যখন সম্রাট অগাস্ট ক্ষমতায় আসলেন তখন তিনি এ ক্ষমতা কয়েক জন আইনবিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিলেন। আর তা করা হয়েছিল যাতে নানা অভিমত সৃষ্টি না হয়; ঐকমত্যের ভিত্তিতে রায় দেয়া যায়। আর তখন থেকেই জাতির নামে আইনের ব্যাখ্যা জারী হতে থাকে।

সম্রাট হাডরিয়ান এর যুগের সংস্কার সম্মন্ধে কথা হলো: ইতঃপূর্বে যে কয়জন আইনবিদকে আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষমতা দেয়া হয়ে ছিল তা সম্রাটকে এক পর্যায়ে উৎকণ্ঠায় ফেললো। তিনি মনে করতে থাকলেন, আইন ব্যাখ্যাকারীদের আইনের

---

৩৫. A.E.Giffard, Precis do Droit Romain, T.I, art.93, Paris : 1933, p.53,

৩৬. ড. মা'রুফ আদ্দুয়ালিবী, *আল-হুকুক আর-রুমিয়া ওয়া আছারুহা ফিত্তাশরী আল-ইসলামী*, প্রাগুক্ত, (ড. হামিদুল্লাহর গ্রন্থ) পৃ. ১০৮

ব্যাখ্যা তার বিশেষ ক্ষমতায় বাধাঁ সৃষ্টি করছে। এ কারণেই সম্রাট হাডরিয়ান উপদেষ্টা পরিষদ পুনর্গঠন করলেন। তিনি দেশের বিখ্যাত আইনবিদদেরকে তার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য করে নিলেন। তিনি তার আইনবিদদের পরামর্শক্রমে নিজেই আইনের ব্যাখ্যা দান শুরু করলেন।[৩৭]

সম্রাট হাডরিয়ান এর পর উপদেষ্টা পরিষদের আইনের ব্যাখ্যাদানকারী সদস্যগণ সম্রাটের তত্ত্বাবধানে থেকে আইনের ব্যাখ্যাদানের বিশেষ ক্ষমতা অর্জন করলেন। তাঁদের লিখিত গ্রন্থগুলোর অভিমত আদালতে উদাহরণ ও দলীল হিসেবে পেশ করা হতে থাকল। তাদের সকলের ঐকমত্য তখন থেকে আইন হিসেবে গণ্য হতে থাকলো।[৩৮]

এভাবেই রোমান আইনে Consensus বা ঐকমত্যের বিকাশ ঘটলো। এবং এর পশ্চাতে উদ্দেশ্য ছিল আইনবিদদের মতানৈক্য নিরসন করা। উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখতে পেলাম, কিভাবে রোমান আইনে Consensus বা ঐকমত্যের উদ্ভব ঘটল।

অতঃপর সম্রাট কনেস্ট্যানটাইন ক্ষমতায় আসলে তিনি আইনের ব্যাখ্যা দানের ক্ষমতা ও অধিকার একা তার নিজের হাতেই তুলে নিলেন। যার ফলে আইনবিদদের আইনের ব্যাখ্যাদানের আর কোন আইনত অধিকার থাকল না। তাঁরা আইনের ব্যাখ্যা দিলে তাঁদের সে ব্যাখ্যার কোন আইনী মূল্যও থাকল না। তবে অতীতের আইনবিদদের আইনের গ্রন্থগুলোর দীর্ঘ দিন থেকে যে বিচারিক ক্ষমতা ছিল; তাও বাকি রাখা হল। পরবর্তী সম্রাটদের যুগে তা সরাসরি আইন গ্রন্থের মর্যাদাও লাভ করল।[৩৯]

সম্রাট Theodore ও Valentinien যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন; তখন তারা ৪২৬ খ্রিস্টাব্দে তাদের সেই বিখ্যাত রাষ্ট্রীয় ফরমানটি জারী করলেন। যাকে পরবর্তীতে Procedure Law বা আদালতে আর্জি পেশ করা সংক্রান্ত আইন বলা হয়। এ ফরমানটি জারী করা হয়েছিল আইনবিদরা তাঁদের প্রণীত আইন গ্রন্থে যেসব বিষয়ে মত বিরোধে লিপ্ত হয়েছিল সেসব মত বিরোধ নিরসন কল্পে এবং বিচারকদের বিচার কাজে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে।[৪০]

উপরোক্ত ফরমান বা আইনটিতে আইনবিদদেরকে দুটি দলে বিভক্ত করা হয়েছিল:

প্রথম দল : প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন পাঁচজন আইনবিদ, তাঁরা হলেন, Gaious, Papinien, Modestin, Ulpien, Paul; আইনে এই পাঁচজন আইনবিদকে

---

৩৭. A.E.Giffard, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, খ. ১, পৃ. ৫৪, প্যারা. ৯৪; ড. মা'রুফ আদ্দুয়ালিবী, *আল-হুকুক আর-রুমিয়া ওয়া আছারুহা ফিত্তাশরী আল-ইসলামী*, (প্রাগুক্ত ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহর গ্রন্থ), পৃ. ১০৮

৩৮. প্রাগুক্ত, ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ, পৃ. ১০৮

৩৯. প্রাগুক্ত, ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ, পৃ. ১০৯

৪০. প্রাগুক্ত, ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ

পরিপূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হয় এবং বিচারকের সামনে তাঁদের অভিমতকে দলীল হিসেবে পেশ করার সুযোগও দেয়া হয়।[৪১] এখানে আরো উল্লেখ্য যে, এসব আইনবিদ সম্রাটের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যও ছিলেন।

দ্বিতীয় দল : দ্বিতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ঐসব আইনবিদ, যাঁদের গ্রন্থ থেকে প্রথম দলের আইনবিদগণ তাঁদের অভিমত নিয়েছেন এবং তাঁদের লেখনিতে সে কথা উল্লেখ করেছেন। তবে এই দ্বিতীয় দলের অভিমতকে দলীল হিসেবে পেশ করার জন্য শর্তারোপ করা হয়েছিল যে, অবশ্যই তাঁদের গ্রন্থ সাথে করে আদালতে নিয়ে আসতে হবে। তাঁদের গ্রন্থের দুস্প্রাপ্যতা তাঁদের অভিমতকে দলীল হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিরাট প্রতিবন্ধক ছিল। কার্যত তাঁদের অভিমত দ্বারা দলীল দান সম্ভবপর ছিলনা। কেবল তখনই তাঁদের অভিমত দ্বারা দলীল দেয়া যেত; যখন প্রথমোক্ত দলের গ্রন্থে তাদের অভিমত উল্লেখ থাকত।[৪২]

এসব আইনবিদ যাঁদের অভিমতকে আদালতে দলীল হিসেবে পেশ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল তাঁদের ঐকমত্যকে আইনী মূল্যও দেয়া হয়েছিল। তাঁদের অভিমতের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দিলে তখন কী করা হবে সে প্রসঙ্গে থিওডর বলেন, তখন বিচারকদের অধিকাংশের অভিমত গ্রহণ করতে হবে। আর যদি পরস্পর বিরোধী দুটি অভিমত পাওয়া যায় এবং প্রতিটি অভিমতের পক্ষে একাধিক আইনবিদের অবস্থান দেখা যায়; তখন অবশ্যই যে পক্ষে Papinien এর অভিমত আছে, বিচারককে সে অভিমতটিই গ্রহণ করতে হবে। এসব বক্তব্য উপস্থাপনের পর Giffard বলেন, এভাবেই বিচারকার্য Procede macanique বা যান্ত্রিক পদ্ধতিতেই চলতো। অভিমতগুলোর গণনা করা হতো; মূল্যায়ন করা হতো না।[৪৩]

এ পর্যন্ত রোমান আইনের Consensus বা ঐকমত্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। এবার নিম্নে ইসলামী আইনের ইজমা সম্মন্ধে আলোচনা পেশ করা হলো :

ইসলামী আইনে ইজমা

ইসলামী আইনের প্রধান চার উৎসের তৃতীয় উৎসটি হলো 'ইজমা'। ইসলামী আইনের সে উৎসগুলো হলোঃ কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূলিল্লাহ স., ইজমা ও কিয়াস।[৪৪]

---

৪১. প্রাগুক্ত, ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ, পৃ. ১১০

৪২. প্রাগুক্ত, ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪-১১১

৪৪. আলী ইবন মুহাম্মদ আল বাযদাভী, *উসূলুল বাযদাভী*, পৃ. ৫; তিনি বলেন,

أعلم أن أصول الشرع ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع والأصل الرابع القياس بالمعنى المستنبط من هذه الأصول

ইজমার সংজ্ঞা ও প্রামাণিকতা

ইজমা'র আভিধানিক অর্থ ঐকমত্য। ইসলামী আইনবিদদের পরিভাষায় ইজমা বলতে বুঝানো হয়, রাসূলুল্লাহ স.-এর ইন্তিকালের পর কোন এক যুগের সমস্ত মুজতাহিদ কর্তৃক ইসলামী আইন শাস্ত্রের কোন এক বিষয়ের হুকুম সম্বন্ধে ঐকমত্যে উপনীত হওয়া।[৪৫]

ইসলামী আইনে ইজমার ধারণাটি এসেছে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত ও নবী স.-এর কয়েকটি হাদীস থেকে, আমরা এখানে পাঠকদের সামনে তা পেশে করছি:

১. আল-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের 'উলুল আমরের'। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর; তা হলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যর্পণ কর– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষদিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।[৪৬]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদের উপর কোন ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের ফয়সালা না থাকলে; তখন সে ব্যাপারে ফয়সালার জন্য 'উলুল আমরের' শরণাপন্ন হতে আদেশ করেছেন। 'উলুল আমর' বলতে সম্মানের অধিকারী লোকদের বুঝানো হয়েছে। সাধারণত মানুষ দুই কারণে সম্মানের আধিকারী হয়। এক. দুনিয়াবী ক্ষমতার কারণে। দুই. ধর্মীয় জ্ঞানের কারণে। দুনিয়াবী ক্ষমতার কারণে যাঁরা সম্মানিত হয়, তারা হলেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী শাসক শ্রেণীর লোকেরা। আর ধর্মীয় জ্ঞানের কারণে যারা সম্মানিত হন তাঁরা হলেন মুজতাহিদ ও ফকীহ্ আলিমগণ। ইবনু আব্বাস র. উপর্যুক্ত আয়াতে 'উলুল আমর' বলতে মুজতাহিদ আলিম-উলামাকে বুঝিয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদের উপর আল্লাহ্, আল্লাহ্র রাসূল, ন্যায়পরায়ণ শাসক শ্রেণি ও মুজতাহিদ আলিমদের অনুসরণ করা ফরয করে দিয়েছেন।

কাজেই যে সব বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর সরাসরি ফয়সালা নেই, সেসব ক্ষেত্রে মুমিনদেরকে মুজতাহিদ আলিম-উলামাদের অনুসরণ করতে হবে। আর যদি কোন বিষয়ের হুকুমের ব্যাপারে মুজিতাহিদগণ ঐকমত্যে উপনীত হন; তখন তার আনুগত্য ও অনুসরণ করা এবং সে হুকুম মেনে নেয়া উম্মাতের উপর ফরয হয়ে পড়ে। একারণেই আল্লাহ্ তাআলা এ সূরার অপর এক আয়াতে বলেছেন,

---

৪৫. আব্দুল ওয়াহ্হাব খাল্লাফ, *ইলমু উসূলিল ফিক্হ*, কুয়েত : দারুল কলম, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৪৫

৪৬. আল-কুরআন, ০৪ : ৫৯

﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾

আর যদি তারা সমস্যাটি রাসূলের কাছে এবং তাদের উলুল আমরের (তথা জ্ঞানী-গুণী মুজতাহিদদের গোচরে আনত) তবে অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা সমাধান উদ্ভাবন করতে পারে তারা সমস্যার যথার্থ সমাধান জানতে পারতো।[৪৭]

মোটকথা, মুজতাহিদ আলিমগণই সমস্যার সমাধান কুরআন ও হাদীস থেকে বের করতে পারেন। সুতরাং সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁদের কাছে যেতে হবে এবং তাঁদের দেয়া সমাধান সানন্দে গ্রহণ করতে হবে।

২. আল্লাহ তা'আলা অপর এক আয়াতে যারা আল্লাহর রাসূল ও মুমিনদের বিরুদ্ধাচরণ করে ভিন্নপথ অবলম্বন করে, তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে বলেন,

﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾

আর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য হিদায়াত প্রকাশ পাওয়ার পর এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফেরাব যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। আর আবাস হিসেবে তা খুবই মন্দ।[৪৮]

আলোচ্য আয়াতে লক্ষণীয় বিষয় হলো, যারা ঈমানদারদের পথ তথা মুজতাহিদ আলিম-ওলামাদের পথ পরিহার করে অন্য পথে চলে তাদেরকে নবীর বিরুদ্ধাচরণকারীদের সমান অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছে। যা হারাম। যেহেতু মুজতাহিদদের পথ হলো ঈমানদারদের পথ; সেহেতু তাঁদের ইজতিহাদের মাধ্যমে ঐকমত্যে উপনীত হওয়া হুকুমের আনুগত্য করা ফরয, আর তাদের ঐ ঐকমত্যের বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম।

৩. শরীয়তের কোন হুকুমের ব্যপারে মুজতাহিদদের ঐকমত্য মানে প্রকৃত পক্ষে এ ব্যাপারে গোটা উম্মতের ঐকমত্য। কারণ মুজতাহিদগণই হলেন শরী'আত সম্পর্কে অভিজ্ঞ আলিম। তাঁরাই হলেন গোটা উম্মাতের প্রতিনিধি। কাজেই তাঁদের অভিমতের মাধ্যমে গোটা উম্মাতের অভিমতের প্রতিফলন হয়। আর রাসূলুল্লাহ্ স.-এর কতিপয় হাদীস থেকে জানা যায়, এ উম্মাত সামষ্টিকভাবে সব সময় ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকবেন। সুতরাং মুজতাহিদদের ঐকমত্যও ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে বলে পরিগণিত হবে, আর তার অনুসরণ করা আবশ্যক ও ফরয সাব্যস্ত হবে। কারণ:

ক) রাসূলুল্লাহ্ স.-এর সাহাবী আবু বাসরাহ্ আল-গিফারী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন,

---

৪৭. আল-কুরআন, ০৪ : ৮৩

৪৮. আল-কুরআন, ০৪ : ১১৫

عن أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : سألت ربي عز و جل أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة سألت الله عز و جل ان لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها وسألت الله عز و جل ان لا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم قبلهم فأعطانيها وسألت الله عز و جل ان لا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها

আমি আমার রবের কাছে চারটি জিনিস চেয়েছিলাম। তখন তিনি আমাকে তিনটি দান করেছেন আর একটি দান করতে অস্বীকার করেছেন। আমি আল্লাহর কাছে চেয়েছিলাম, আমার উম্মাত যেন গোমরাহীর উপর ঐক্যবদ্ধ না হয়। তিনি তা আমাকে তা দান করেছেন। আমি আল্লাহর কাছে চেয়েছিলাম তিনি যেন তাদেরকে দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস না করেন, যেমন পূর্বের উম্মাতদের ধ্বংস করেছেন। তিনি তাও আমাকে দান করেছেন। আমি আল্লাহর কাছে চেয়েছিলাম তিনি যেন তাদেরকে বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত না করেন, এক দল অপর দলের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত না হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা তা আমাকে দান করতে অস্বীকার করেন।[৪৯]

খ) ইবন আব্বাস রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন 'আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মাতকে গোমরাহী বা বিভ্রান্তিতে ঐক্যবদ্ধ করবেন না।'[৫০]

গ) ইবন উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, 'আমার উম্মাত কখনো গোমরাহীতে একমত হবে না। সুতরাং তোমাদেরকে জামা'আতবদ্ধ থাকতে হবে। কারণ আল্লাহর সাহায্য জামা'আতের সাথেই থাকে।'[৫১]

ঘ) ইবন উমর রা. হতে অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আল্লাহ উম্মতকে কখনো গোমরাহীর উপর ঐক্যবদ্ধ করবেন না। তিনি আরো বলেন, আল্লাহর সাহায্য জামা'আতের সাথে থাকে। সুতরাং তোমরা বড় দলের অনুসরণ করো। কারণ যে জামা'আত থেকে বের হয়ে একাকী হয়ে পড়বে তাকে একাকী জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[৫২]

---

৪৯. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, খ. ৬, পৃ. ৩৯৬, হাদীস ২৭২৬৭; শুআইব আরনাউত বলেন: এ হাদীসের সনদ দুর্বল হলেও মূলত হাদীসটি অন্যান্য সনদের কারণে সাহীহ লিগাইরিহী।

৫০. *মুসনাদে রাবী ইবন হাবীব*, ১০৩, পৃ. ৩৬ হাদীস নং ৩৯;

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الله ليجمع أمتي على ضلال

৫১. তাবারানী, *আল-মুজামুল কাবীর*, খ. ১১, পৃ. ৭৮, হাদীস নং ১৩৪৪৮;

عن ابن عمر , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لن تجتمع أمتي على الضلالة أبدا , فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة.

৫২. হাকিম, *আল-মুস্তদরাক*, খ. ১, পৃ. ১১৫, হাদীস নং ৩৯১;

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَجْمَعُ اللَّهُ هَذِهِ

৬) আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ স.-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মাত গোমরাহীর উপর একমত হবে না। যখন তোমরা মতবিরোধ দেখবে তখন তোমাদেরকে বড় দলের সাথে থাকতে হবে।[৫৩]

ইজমার উদ্দেশ্য

ইসলামী আইনে ইজমার উদ্দেশ্য হলো নবী স. কর্তৃক সকলের ঐকমত্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের ঘোষণা এবং আইনী বিষয়ে সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত হয়; তাকে আইনী মর্যাদা দান।

ইসলামী আইনে ইজমার এই উদ্দেশ্যের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, ইসলামী আইন ও রোমান আইনের Consensus এর উদ্দেশ্যের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য বিদ্যমান।

১. ইসলামী আইনের ইজমা ও রোমান আইনের Consensus এর মধ্যে প্রথম পার্থক্যটি হলো: রোমান আইনে Consensus বা ঐকমত্যের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, সম্রাট ও তার সাংসদবর্গের ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণ এবং অন্যদের অভিমতকে মর্যাদাহীন ও ক্ষমতাহীনকরণ। এ উদ্দেশ্যটি ইসলামী আইনের ইজমার উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত।

২. ইসলামী আইনের ইজমা ও রোমান আইনের Consensus এর মধ্যে দ্বিতীয় পার্থক্যটি হলো: ইসলামী আইনের ইজমা সংঘটিত হবার জন্য কোন দল বিশেষ বা যুগ বিশেষের প্রয়োজন হয় না, যে কোন যুগেই মুজতাহিদদের মধ্যে ঐকমত্যের ভিত্তিতে ইজমা সংঘটিত হতে পারে। তেমনিভাবে কোন দলের মধ্যে কোন ব্যক্তি বিশেষ থাকলে সে দলের অভিমতকে অন্য দলের অভিমতের উপর অগ্রাধিকার দানের মত ব্যবস্থাও ইসলামী আইনে নেই। ইসলামী আইনে ইজমার ধারণাটি এসেছে যাতে প্রতিযুগে ফকীহগণের মধ্যে ঐকমত্যের সৃষ্টি হয় সে উদ্দেশ্যে। এটাই ইসলামী আইনের ইজমা ও রোমান আইনের Consensus এর মধ্যে দ্বিতীয় পার্থক্য এবং এই পার্থক্য উভয় আইন ব্যবস্থার সূচনা থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে আছে।

৩. ইসলামী আইনের ইজমা ও রোমান আইনের Consensus এর মধ্যে তৃতীয় পার্থক্য হলো; আইনবিদদের মাঝে কোন ব্যাপারে ঐকমত্য সৃষ্টি না হলে; তখন রোমান আইনে অধিকাংশ আইনবিদের অভিমতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। আর

الْأُمَّةَ عَلَى الضَّلَالَةِ أَبَدًا وَقَالَ : يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الأَعْظَمَ ، فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ

৫৩. খাতীব বাগদাদী, *আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, খ. ১, পৃ. ৪৬৮, হাদীস নং ৪১৫;
عن أنس ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تجتمع أمتي على ضلالة ، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم

ইসলামী আইনে দলীল-প্রমাণ পর্যালোচনা করে যে পক্ষের দলীল বেশি শক্তিশালী ও বেশি যুক্তিপূর্ণ হয়; সে অভিমতটিকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

৪. ইসলামী আইনের ইজমা ও রোমান আইনের Consensus এর মধ্যে চতুর্থ পার্থক্যটি হলো : ইসলামী শরী'আহ্‌র অন্যতম ব্যাখ্যাদাতা হানাফী ফকীহ্‌গণের মতে, কোন বিষয়ে ইজমা চারভাবে সংঘটিত হতে পারে।

এক : সকলের ঐকমত্যে;

দুই : কর্মের ঐক্য বা সকল ফকীহ্ একই ধরনের কর্ম করলে তখনও ইজমা সংঘটিত হতে পারে।

তিন : কোন ফকীহ্‌র প্রদত্ত অভিমত সম্বন্ধে বাকী সকল ফকীহ্ অবগত হয়ে নীরবতা অবলম্বন করলে।

চার : কোন ফকীহ্ কোন কাজ করলে; আর বাকী ফকীহ্‌গণ সে ব্যাপারে অবগত হয়ে কোন অভিযোগ বা আপত্তি না করলেও ইজমা সংঘটিত হতে পারে।[৫৪]

ইজমা সংঘটিত হওয়ার উপর্যুক্ত চারটি পদ্ধতি হলো ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্য। রোমান আইনে এ ধরনের ঐকমত্যের কোন অস্তিত্ব নেই।

ইসলামী আইন ও রোমান আইনের ঐকমত্যের উপর্যুক্ত তুলনা দ্বারা এ কথা প্রমাণ হয় যে, আসলে প্রাচ্যবিদদের দাবি অনুযায়ী প্রকৃতপক্ষে উভয় আইনের ঐকমত্যের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য বিদ্যমান নেই। না মূল ভিত্তিতে, না উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে, না সংঘটিত হবার পদ্ধতিতে। তবে উভয় আইন ব্যবস্থার ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে আভিধানিক অর্থে কিছুটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়; এ থেকে প্রমাণ করা যায় না যে, পরিভাষাগত সাদৃশ্যও উভয় আইনব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে। এটাও প্রমাণ করা যায় না যে, ইসলামী আইন রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, প্রাচ্যবিদদের তৃতীয় দাবিও দলীল বিহীন, আন্দাজ-অনুমান নির্ভর একটি দাবি, যার কোনো দালিলিক ভিত্তি নেই, নেই কোন ঐতিহাসিক সত্যতা।

মোটকথা, ইসলামী আইন আদৌ রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত নয়। ইসলামী আইন কোনো ক্ষেত্রেই রোমান আইন থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করেনি, ইসলামী আইন তার নিজস্ব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তার আইনী উৎস হতেই সকল ইসলামী আইন সংগৃহীত।[৫৫] ইসলামী ফিক্‌হশাস্ত্রের পাঠকবৃন্দ এ সম্পর্কে পরিজ্ঞাত।

---

[৫৪] ড. মা'রুফ আদ্দুয়ালিবী, *আল-হুকূক আর-রুমিয়া ওয়া আছারুহা ফিত্‌তাশরী আল-ইসলামী*, (প্রাগুক্ত ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহর গ্রন্থ), পৃ. ১১৩

[৫৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০-১১৪

এ প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ বলেন,

> এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, ল্যাটিন তথা রোমান আইন ও ইসলামী আইনের পরিভাষায় কিছুটা সাদৃশ্য বিদ্যমান। যেমনঃ ফিক্‌হ ও Zurisprudentia, ফাতাওয়া ও responsa prudentiun, মুফতি ও Zurisconsultus, ইজমা ও Consensus, আদত বা অভ্যাস ও Usus, মদীনাবাসীর সামাজিক প্রথা ও Consuetudo populi Romani, শরী'আহ্ বা আইনের কারণ ও ratioLegis, রায় ও opnno, ইস্তিসলাহ বা জনকল্যাণ ও Salus populi ইত্যাদি।[৫৬]

এখানে যে বিষয়টি তাৎপর্যের দাবিদার তা হলোঃ যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, ভূগোল, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও কালাম শাস্ত্রের বিপরীতে ফিক্‌হশাস্ত্রে আমরা ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষা থেকে আরবীকৃত কোন পরিভাষা দেখতে পাই না। এমন কি ফিক্‌হ বা ইসলামী আইনশাস্ত্রের উদ্ভবকালে মুসলিম ফকীহ্‌দের দ্বারা প্রাথমিক পর্যায়ে লিখিত ফিক্‌হ গ্রন্থগুলোতেও মূল রোমান শাস্ত্র থেকে সংগৃহীত কোন পরিভাষা আমরা দেখতে পাই না। হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে, বিদেশী উৎস থেকে গৃহীত স্বল্পসংখ্যক শব্দ ইসলামী ফিক্‌হ শাস্ত্রে রয়েছে। তবে তার অধিকাংশই ফার্সী ও আরামী ভাষার শব্দ। এ শব্দগুলোও প্রায় বাণিজ্যিক আইন ও লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ চেক, দাহ্‌দাওয়ায্‌দাহ্ ও সফ্‌তাজা ইত্যাদি। তবে প্রতীয়মান হয় যে, এ শব্দগুলো ইসলাম পূর্ব জাহিলী যুগ থেকেই আরবী ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। মোট কথা, এ শব্দগুলোও ল্যাটিন বা গ্রিক নয়।

আমরা ইতঃপূর্বে যেসব আরবী শব্দের সমার্থবোধক ল্যাটিন শব্দ উল্লেখ করেছি; সে আরবী শব্দগুলো প্রায় সবই আল-কুরআন থেকে সংগৃহীত। এমন কি ফিক্‌হ শব্দটিও। এ শব্দটি ইসলামী আইন অর্থে আল-কুরআনেই ব্যবহৃত হয়েছে।[৫৭] আমরা এখানে বলতে চাই যে, আইনের চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান শরীক। ল্যাটিনরাই যদি এসব শব্দ আবিষ্কার করে থাকেন; তা হলে অন্যান্য আদম সন্তানরাও এসব শব্দ ব্যবহার করবে তাতে আপত্তির কি আছে?

আমাদের এ বক্তব্যের সমর্থনে আরো বলা যায় যে, এ শব্দগুলো ইসলামী আইন ও রোমান আইনে প্রায় সমার্থে ব্যবহৃত হলেও এগুলোর বাহ্যিক শব্দগত অর্থেই কেবল সাদৃশ্য বিদ্যমান; তাৎপর্য ও প্রকৃত পারিভাষিক অর্থে আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যেমনঃ ইসলামী আইনের ইজমা ও রোমান আইনের Consensus শব্দের প্রকৃত তাৎপর্যে কোন সম্পর্ক নেই। তেমনিভাবে মদীনাবাসীর সমাজিক প্রথা (উরফু

---

৫৬. ড. হামীদুল্লাহ, *তা'ছীরুল হুকুক আর রুমিয়া আলাল ফিকহিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৫৭. ফিক্‌হ শব্দটি আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে গ্রহণ করা হয়েছেঃ

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

আহলিল মাদীনা) ও রোমান Consuetudo populi Romani এর তাৎপর্যের মধ্যেও বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। মদীনাবাসীর সমাজিক প্রথা প্রকৃত পক্ষে মদীনাবাসীর আমল নয়। মদীনাবাসীর আলাদা কোন মর্যাদা ইসলামী আইনে নেই। আসলে যেসব ইসলামী আইনবিদগণ মদীনাবাসীর আমলকে ইসলামী আইনের উৎস গণ্য করেছেন তাঁরা কেবল এ কারণেই তাকে ইসলামী আইনের উৎস বলে গণ্য করেছেন যে, তা নবী মুহাম্মাদ স.-এর সমর্থন লাভ করেছে। নবী স. যখন মদীনাবাসীর এসব সামাজিক প্রথার প্রচলন তাঁদের মধ্যে দেখেছেন, তখন তিনি তার সমর্থন করেছেন। সুতরাং তা নবী স.-এর সমর্থনের কারণেই (সুন্নাহ বলে পরিগণিত হয়ে) ইসলামী আইনের উৎস হবার যোগ্য হয়েছে। মদীনাবাসীরা নবী স.-এর সমর্থনকৃত এসব সামাজিক প্রথা পরবর্তীতেও তাদের সমাজ জীবন ও জীবনাচরণে বাকি রেখেছেন। অতঃপর অন্যান্য মুসলিমরাও যে সব এলাকায় নবী স. বাস করেননি সে সব এলাকায়ও তা বাকি রেখেছেন।[৫৮]

এ প্রসঙ্গে প্রফেসর ফিৎয জিরাল্ড (Ftz Gerald) তাঁর Moammedan Law নামক গ্রন্থে বলেন,

> যখন কোন জাতি অপর কোন জাতি হতে কোন চিন্তা-দর্শন গ্রহণ করেন; তখন সাধারণত দেখা যায় যে, ঐ চিন্তা-দর্শন বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত বিদেশী শব্দসহ তা গ্রহণ করেন। যেমনঃ Hypotheca অর্থাৎ ঋণ, Cheirographa অর্থাৎ স্বাক্ষর সম্বলিত চুক্তিপত্র, Syngrapha অর্থাৎ একেই সাথে সকল পক্ষের চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করণ, Emphyteusis অর্থাৎ দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ ইত্যাদি শব্দ যা রোমান আইনে ব্যবহৃত হয়, তা উচ্চারণ করার সাথে সাথেই বুঝা যায় যে, তা গ্রিক ভাষা থেকেই নেয়া হয়েছে।[৫৯]

অনুরূপভাবে 'তালমুদ'[৬০] আইনেও গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষাকে আরবী ভাষাকরণ করা হয়েছে ব্যাপকভাবে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আরবী ভাষা অন্যান্য ভাষার মত বিদেশী শব্দ ধার করার মুখাপেক্ষী হয় না। (কারণ আরবী ভাষা এমন এক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ভাষা, যার অভ্যন্তর থেকেই নতুন প্রয়োজনীয় শব্দ সহজেই সৃষ্টি করা যায়।) এতদসত্ত্বেও আরবী ভাষাও কখনো কখনো বিদেশী শব্দ ধার করেছে।

এখানে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, তা হলোঃ দামেস্কের উমাইয়া খলীফারা- যাঁরা এ দেশটিকে নতুনভাবে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য এবং তাকে

---

৫৮. ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ, *তা'ছীরুল হুকুক আর রুমিয়া আলাল ফিকহিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮

৫৯. S.V. Ftz Gerald, *Moammedan Law*, আদ্দাইন আল মায়যূমুনিল কানুনর রুমানী আলাল কানূন আল ইসলামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

৬০. ইহুদীদের ধর্মীয় ও আইন গ্রন্থ।

সাম্রাজ্যের রাজধানী বানাবার জন্য সামরিক ও বেসামরিক অনেক কিছু করেছিলেন- তাঁরাও রোমান চিন্তা দর্শনের অনেক কিছু আরবী সমাজে বাকি রেখেছিলেন। আরবী ভাষায় ব্যবহৃত স্বল্প শব্দ এর প্রমাণ বহন করে। এসব শব্দের মধে কিছু কিছু শব্দ প্রথম বারের মত ব্যবহৃত হয়েছে। আর কিছু কিছু শব্দ এমন কি আল-কুরআনেও রয়েছে। তবে ইসলামী আইন প্রণেতা ফকীহ্গণ মদীনা এবং কুফা শহরের এসব খলীফাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। কারণ তারা ইসলামের আনুগত্য করত নামে মাত্র। খলীফারা নিজেরা এবং তাদের অনুসারী গভর্নররা ইসলামী আইনের প্রতি তেমন গুরুত্বারোপ করত না। সুতরাং এ কথা বললে কিছুতেই অত্যুক্তি হবে না যে, ঐ সব খলীফা কিছু গ্রহণ করলেও তাই যথেষ্ট ছিল ইসলামী ফকীহ্গণের কাছে তা গ্রহণযোগ্য না হবার জন্য।

অন্য দিকে ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক যিম্মিদেরকে মুসলিমরা তাদের নিজেদের আইন দ্বারা তাদের নিজেদের সমস্যা সমাধান করার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তাই তাদের আইনের কোন পরিভাষাও মুসলিম আইনে ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়েনি। ... এ কারণেই আমরা ইসলামী আইনের বিরাট পরিভাষার ভাণ্ডারে একটি শব্দও ল্যাটিন বা গ্রিক ভাষা হতে সংগৃহীত হয়ে ব্যবহৃত হতে দেখি না।[৬১]

ইসলামী আইনের ইবাদত সংক্রান্ত বিধি-বিধান ও রোমান আইন

ইসলামী আইন রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত না হবার আর একটি বড় প্রমাণ হলো; ইসলামী আইনের গ্রন্থগুলোর এক বিরাট অংশ জুড়ে আছে ইসলামী ইবাদাত সংক্রান্ত বিধি-বিধান। এই অংশটিও অন্যান্য অংশের মত একই ধরনের দলীল-প্রমাণ নির্ভর। এই অংশটি রোমানদের ধর্মীয় উপাসনা দ্বারা প্রভাবিত একথা স্বয়ং প্রাচ্যবিদরাও দাবি করেননি। কারণ মুসলিমরা এক আল্লাহ্য় (তাওহীদে) বিশ্বাসী। তাই ইসলামের ইবাদাত বন্দেগীও এই তাওহীদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কাজেই মুসলিমরা কেবল এক আল্লাহর ইবাদাতই করেন। আল্লাহর ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক করেন না। একারণেই মুসলিমদের ইবাদতে শির্কের অবকাশ থাকে না। মুসলিমরা এক আল্লাহর ইবাদত করেন, তাও কোন মনগড়া পদ্ধতিতে নয়, বরং রাসূলুল্লাহ্ স. যেভাবে ও যে পদ্ধতিতে নিজে ইবাদত করেছেন এবং যেভাবে যে পদ্ধতিতে ইবাদত করতে সাহাবীদেরকে শিখিয়েছেন সে পদ্ধতিতেই। কারণ রাসূলুল্লাহ্ স. সালাত সম্পর্কে সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي 'তোমরা আমাকে

---

৬১. S.V. Ftz Gerald, *Moammedan Law*, *আদ্দাইন আল মায়যূমুনিল কানূনর রুমানী আলাল কানূন আল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮-১৫৯

যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখ সেভাবেই সালাত আদায় করো।'[৬২] অনুরূপভাবে হজ্জ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ 'তোমরা তোমাদের হজ্জের নিয়ম কানুনগুলো আমার কাছ থেকে শিখে নাও।'[৬৩]

অন্য দিকে গ্রিকরা ছিলো পৌত্তলিক। তারা বহু রকমের দেব-দেবীর পূজা করত। আর রোমানরা ছিলো খ্রিস্টান। তারাও আল্লাহর সাথে ঈসা আ.-এর পূজা করত। কাজেই ইসলামী ইবাদত কিছুতেই গ্রিক ও রোমানদের ইবাদতের সাদৃশ্য হতে পারে না। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ স. বহু ক্ষেত্রে মুসলিমদেরকে ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুশরিকদের বিরোধিতা করতে আদেশ করেছেন।[৬৪] সুতরাং ইসলামী ইবাদতের বিধি-বিধান রোমান বা গ্রিকদের ইবাদতের বিধি-বিধান দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না। যদি ইসলামী আইনের ইবাদত সংক্রান্ত বিধি-বিধানগুলো অন্য কোন আইন দ্বারা প্রভাবিত না হয়; এবং অন্য কোন আইনব্যবস্থা থেকে সংগৃহীত না হয়; তা হলে ইসলামী আইনের বাকী অংশের বিধি-বিধানগুলো কেন রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত হবে?

তুলানামূলক ফিক্হশাস্ত্রের অধ্যয়ন

যাঁরা তুলানামূলক ইসলামী ফিক্হ অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা অবশ্যই জানেন যে, ফিক্হশাস্ত্রের প্রত্যেকটি মাসআলা বা বিধান আল-কুরআন থেকে বা নবী স.-এর সুন্নাহ থেকে বা কুরআন-হাদীস নির্ভর কোন যুক্তি বা কিয়াসের আলোকে বা মাসালিহে মুরসালা বা ইস্তিসহাবে হাল বা পূর্বের নবীদের শরী'আহত বা ওরফ

---

৬২. বুখারী, *আস সহীহ,* অধ্যায় : কাইফা কানা বাদযুল ওয়াহী, পরিচ্ছেদ : আল আযানু লিল মুসাফিরি ইযা কানু জামা'আতান ওয়াল ইকামাতু, খ. ১, পৃ. ১৬২, হাদীস নং-৬৩১

৬৩. বায়হাকী, *সুনানুল কুবরা,* অধ্যায় : হজ্জ, পরিচ্ছেদ : ঈদাযে ফি ওয়াদিয়ে মুহাস্সার, খ. ৫, পৃ. ১২৫, হাদীস নং-৯৭৯৬

৬৪. রাসুল সা. বায়হাকী কর্তৃক শু'আবুল ঈমানে খ. ৫, পৃ. ৩২৯, হাদীস নং ৩৫০৯; ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত এক হাদীসে বলেন:" خَالِفُوا الْيَهُودَ صُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ 'তোমরা ইহুদীদের বিরোধিতা করো, (মুহাররম মাসের) নবম ও দশম দিন রোজা রাখো।'; সুনানে আবু দাউদের খ. ১, পৃ. ১৭৬, হাদীস নং- ৬৫২ বর্ণিত অপর এক হাদীসে বলেন: خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ، وَلَا خِفَافِهِمْ« 'তোমরা ইহুদীদের বিরোধিতা করো, তারা তাদের জুতা-স্যান্ডেল নিয়ে সালাত আদায় করে না; (তোমরা তা নিয়ে সালাত আদায় করো।) নাসির উদ্দিন আলবানী এ হাদীসটি সাহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। ইমাম বুখারী, সাহীহ বুখারীতে খ. ৭, পৃ. ১৬০, হাদীস নং- ৫৮৯২; ইবন ওমর থেকে বর্ণনা করেন, নবী সা. বলেছেন:

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ: وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ

"তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা করো। দাড়ি লম্বা করো, আর গোঁফ ছোট করো"।

(সামাজিক প্রথা) ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এ সব বিষয় পর্যালোচনা করলে ইসলামী আইন রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত হবার এ দাবিটি যে একটি হাস্যকর দাবি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তুলনামূলক ফিক্হ অধ্যয়নকারীরা অবশ্যই একথাও জানেন যে, ইসলামী আইনের অধিকাংশ আইন আসলে নবী মুহাম্মাদ স.-এর সুন্নাহ হতেই সংগৃহীত। বাকি কিছু ইসলামী আইন মুসলিম মুজতাহিদ ও ফকীহ্দের কুরআন-সুন্নাহ ও কিয়াস ভিত্তিক ইজতিহাদের ফসল ছাড়া আর কিছু নয়।

আইন বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্য

অনেক মুসলিম ও অমুসলিম আইন বিশেষজ্ঞও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, ইসলামী আইনের উপর রোমান আইনের কোন প্রভাব পড়েনি। শুধু তাই নয়; বরং ইসলামী আইন ব্যবস্থা অনেক দিক থেকে রোমান আইনের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। আমরা এরূপ কয়েকজনের সাক্ষ্য এখানে পাঠকদের সামনে পেশ করছিঃ

মিসরের আইন কলেজের প্রাক্তন প্রফেসর ড. আলী বাদাবি ইউরোপীয় আইনের প্রথম উৎস রোমান আইন ও ইসলামী আইনের মধ্যে তুলনা করার পর বলেন, 'অনুরূপভাবে ফৌজদারী আইনের ক্ষেত্রে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামী আইনের ফৌজদারী দণ্ডবিধি সম্পূর্ণ স্বাধীন। বরং এ আইন অন্যান্য পুরাতন ও আধুনিক অনেক আইনের উপর নানান দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। যেমনঃ

ক) আল-হিসবা ব্যবস্থাঃ এটি অতীতের একটি সামাজিক দাওয়াতী দায়িত্ব পালনকারী সংস্থা। একে বর্তমান যুগের গণ প্রতিনিধিদের দায়িত্বের সাথে তুলনা করা যায়।

খ) তাযিরী শাস্তি দানের ব্যবস্থাঃ অর্থাৎ শাস্তির পরিমাণ ও প্রকার নির্ধারণের দায়িত্ব বিচারকের উপর ছেড়ে দেয়া, যাতে বিচারক অপরাধের অবস্থা, অপরাধীর মানসিকতা, অপরাধের প্রতি তার ঝোঁকপ্রবণতা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনানুযায়ী শাস্তি দিতে পারেন। এ ব্যবস্থা একমাত্র ইসলামী আইন ব্যবস্থাতেই বিদ্যমান। বর্তমানকালে অপরাধ বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি তুলছেন। যাতে অপরাধীদেরকে আইনের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিশীল শাস্তিদান সম্ভবপর হয়। এ কারণেই চূড়ান্তভাবে বলা যায় যে, ইসলামী শরী'আহত বা আইন ব্যবস্থায় শাস্তিদানের এমন সব বুনিয়াদী ব্যবস্থা ও নীতিমালা সম্বলিত, যা প্রশস্ততা ও সুবিচারের দিক দিয়ে মানবরচিত আইনের সর্বাধুনিক বুনিয়াদী ব্যবস্থা ও নীতিমালার চেয়ে কিছুতেই কম নয়। ইসলামী শরী'আতে এমন নীতিমালাও বিদ্যমান; রোমান শাস্তিবিধানে যার কোন নজীর আদৌ নেই।[৬৫]

ড. শফীক সাহ্হাতা তার 'আন-নাযারিয়াতুল আম্মা লিল ইল্তিযামাত ফিশ শারী'আহ' নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ২০১ পৃষ্ঠায় বলেন,

---

৬৫. *আইন ও অর্থনীতি* নামক সাময়িকীর প্রথম বর্ষের পঞ্চম সংখ্যা।

> আইন ব্যবস্থার মূলের দিক দিয়ে তুলনা করলে দেখা যায় যে, ইসলামী শরী'আহ্ মূলনীতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে রোমান আইনের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রগামী। যেমনঃ তার একটি মূলনীতি হলো, একমত হওয়ার সাথে সাথে মালিকানা পরিবর্তন হওয়া। দ্বিতীয় মূলনীতি হলো, ইচ্ছার ক্ষমতা সংক্রান্ত। আর তৃতীয় মূলনীতি হলো, চুক্তিগত প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত।[৬৬]

প্রফেসর ড. আব্দুর রায্যাক সানহুরী ও ড. হাশমত আবু সিত্তিত তাঁদের প্রণীত 'উসূলুল কানুন' (আইনের মূলনীতি) নামক গ্রন্থের ১৩২ পৃষ্ঠায় বলেন,

> ... ইসলামী শরী'আহ্ উন্নতি লাভের ক্ষেত্রে রোমান আইনের পথ অবলম্বন করে নি। রোমান আইন- পূর্বে যেমন বলেছি- অভ্যাস ও প্রথা হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করে, অতপর দাবি ও বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে ক্রমোন্নতি ও বৃদ্ধি লাভ করে। অন্য দিকে ইসলামী আইন একটি অবতীর্ণ কিতাব ও আল্লাহর দেয়া অহীর মাধ্যমে তার সূচনা হয়। অতঃপর যুক্তি সংগত কিয়াস ও বাস্তব আহকামের পথ ধরে উন্নতি ও বৃদ্ধি লাভ করে। মুসলিম ফকীহ্গণ রোমান আইনবিদদের উপর বিশেষ বৈশিষ্ট্য লাভ করেছেন ভিন্ন ধরনের সাধারণ মূলনীতি ও উসূল প্রণয়নের মাধ্যমে। অর্থাৎ উৎস হতে আহকাম সাব্যস্ত বা আহকাম বের করার নিয়ম-কানুন প্রবর্তন দ্বারা। এসব নিয়ম-কানুন সম্বলিত বিষয়কে বলা হয় 'উসূলে ফিক্হ' বা উসূল শাস্ত্র।[৬৭]

আন্তর্জাতিক আইন সম্মেলনের সাক্ষ্য

ইসলামী আইন যে রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত নয়; তা শুধু আমরা মুসলিমরা দাবি করছি ব্যাপারটি কেবল তাই নয়; বরং কিছু কিছু আন্তর্জাতিক আইন সম্মেলনেও তা স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

১৩৫৬ হিঃ মোতাবেক ১৯৩৭ খ্রিস্টীয় সনে ভিয়েনার লাহাই শহরে তুলানামূলক আইনের ওপর এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়কে অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সে সুবাদে তাতে দুইজন প্রখ্যাত আজহারী আলিম আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁরা তাতে দুটি প্রবন্ধও পাঠ করেন। তার একটি হলো: (المسئولية المدنية الجنائية في الشريعة الاسلامية) 'ইসলামী শরী'আতের ফৌজদারী ও দেওয়ানী দায়িত্ব'। অপরটি হলো: (استقلال الفقه الاسلامي ونفي كل صلة مزعومة بين الشريعة الاسلامية والقانون الروماني) 'ফিকহী ইসলামীর পূর্ণ স্বকীয়তা ও ইসলামী শরীয়তের সাথে রোমান আইনের ধারণাপ্রসূত সম্পর্ক নিরসন'।

---

৬৬. দেখুন, ড. ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন*, ঢাকা : খাইরুন প্রকাশনী, ২০০২ খ্রি., পৃ. ১১৩

৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

উক্ত সম্মেলনে পাশ্চাত্যের আইনজীবীদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঐতিহাসিক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। তাতে বলা হয়:

ক. ইসলামী শরী'আহ্‌কে সাধারণ আইনের একটি উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

খ. ইসলামী শরী'আহ্ জীবন্ত এবং ক্রমোন্নতি যোগ্য।

গ. ইসলামী শরী'আহ্ স্বাধীনভাবেই বিস্তৃতি লাভ করেছে, অন্য কোন আইন ব্যবস্থা থেকে গৃহীত হয়নি।[৬৮]

ইংরেজ আইন ও ফরাসী আইনের উপর ইসলামী আইনের প্রভাব

ইসলামী আইন অন্য আইন দ্বারা প্রভাবিত হয় নি; বরং কিছু কিছু ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞের মতে, ইংরেজ আইন ও ফরাসী আইন ইসলামী আইন দ্বারা প্রভাবিত। এ প্রসঙ্গে কয়েকজন বিশেষজ্ঞের কিছু উক্তি এখানে পাঠকদের সামনে পেশ করা হলো:

ইংরেজ ঐতিহাসিক 'ওয়েলজ' তাঁর 'মানব ইতিহাসের ধারা' নামক গ্রন্থে বলেন, ইউরোপ তার প্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক আইনের জন্য ইসলামের কাছে অনেক ঋণী।'[৬৯] ফরাসী ঐতিহাসিক 'সিদিও' বলেন, নেপোলিয়ান আইন মালিকী মাযহাবের গ্রন্থ খলীলের ব্যাখ্য গ্রন্থ 'আদ-দারদীর' থেকেই গৃহীত।'[৭০]

ইসলামের বাণিজ্য আইনে 'মুদারাবা' বা 'কিরায' একটি বিশেষ বিনিয়োগ পদ্ধতি। ইসলামী আইনবিদদের সর্বসম্মত সংজ্ঞা মতে, এ পদ্ধতিতে এক পক্ষ ব্যবসার পুঁজি যোগান দেয়; আর অপর পক্ষ শ্রম বিনিয়োগ করে। অতঃপর ব্যবসায় লাভ হলে লাভের অংশ উভয়ে তাদের মধ্যে পূর্বে নির্ধারিত হার অনুপাতে ভাগ করে নেয়। আর লোকসান হলে পুঁজি যোগানদাতার পুঁজি যায় আর শ্রমদাতার শ্রম যায়। রাসূলুল্লাহ্ স. নবী হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পূর্ব থেকে আরব সমাজে মুদারাবার প্রচলন ছিল। রাসূলুল্লাহ্ তার অনুমোদন দেন, তবে তার মধ্যের ক্ষতিকর দিকগুলো বন্ধ করে দিয়ে এর উপকারিতার দিকগুলোকে আরো বৃদ্ধি করে দেন।

এ প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দিন বলেন,

> প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মুসলিমদের সংসর্গে আসার সাথে সাথে ইউরোপের কোন কোন দেশেও কিরাযের মাধ্যমে ব্যবসা করার রীতি প্রচলিত হয়। প্রফেসর

---

৬৮. *ইসলামী শরীয়তের ইতিহাস*, চায়েচ সাবাকী কর্তৃক প্রণীত, পৃ. ৩৫৩-৩৫৬; দেখুন, ড. ইউসুফ কারযাভী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮

৬৯. ড. ইউসুফ কারযাভী, *ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

৭০. প্রাগুক্ত

> 'আর্নেস্ট' তার 'হিস্ট্রি অব ইকোনমিক্স' গ্রন্থে লিখেছেন, '...যখন কিরাযের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করার কোন জ্ঞানই ঈসায়ী বণিকদের ছিল না, তখন মুসলিমরাই এশিয়া আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে এর প্রচলন করেন। রোম সাগরীয় ঈসায়ী দেশ, বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলে লাতিনী দেশসমূহ এবং স্পেনেও এর প্রচলন হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তো কিরায বাণিজ্যিক কায়-কারবারের একটি বিশ্বজনীন রীতিতে পরিণত হয়। বিশেষ করে সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার ভিত্তিতে ফ্রান্সের বাদশা দশম লুই এ সম্পর্কে বিশেষ আইন প্রণয়ন করেন।[৭১]

এ বক্তব্য হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ফ্রান্স সহ ইউরোপ-আফ্রিকার অনেকগুলো দেশে ইসলামের এই বাণিজ্য আইনের প্রভাব পড়ে।

উপসংহার

মোটকথা, ইসলামী আইন পৃথিবীর যে কোন আইনব্যবস্থা থেকে উন্নত একটি ব্যাপক আইনব্যবস্থা। এ আইনব্যবস্থার পুরোটাই আল-কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস ও ইসলামী আইনের অন্যান্য উৎস থেকে সংগৃহীত। এ আইন ব্যবস্থার কোন আইন রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত নয়। যারা এরূপ ধারণা পোষণ করে তাদের সে ধারণা একান্তই অলীক ও কাল্পনিক। এর পশ্চাতে কোন দলীল-প্রমাণ ও ঐতিহাসিক ভিত্তি এবং সত্যতা নেই। ইসলামী আইন ব্যবস্থা এমন সব বৈশিষ্ট্য সম্বলিত, যা অন্য কোন আইনব্যবস্থায় নেই। ইসলামী আইনব্যবস্থায় ইসলাম মানুষের সামনে এমন কিছু নতুন আইনের ধারা উপস্থাপন করেছে, যা ইতঃপূর্বের কোন আইন ব্যবস্থায় ছিল না।

---

৭১. ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দিন, *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৩, খ. ১, পৃ. ১৮৩

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১, সংখ্যা : ৪৩
জুলাই - সেপ্টেম্বর : ২০১৫

ইসলামে নবজাতকের নামকরণ সংশ্লিষ্ট বিধান ও বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে এর অনুশীলনের ধারা : একটি বিশ্লেষণ

মুহাম্মদ আবু সাঈদ খান*

[সারসংক্ষেপ : *জন্মের পর প্রত্যেক মানবশিশুরই নামকরণ করা হয়। প্রত্যেক পিতা-মাতাই চান তার সন্তানের নামটি সুন্দর হোক, সবাই তার সন্তানকে ভাল নামে ডাকুক। এমনকি ব্যক্তি নিজেও তার নাম সুন্দর হোক তা চান। একজন মুসলিমের সর্বোত্তম নাম কি হবে, কোন ধরনের নাম প্রশংসনীয়, কোন ধরনের নাম বৈধ বা অপছন্দনীয়, ইসলাম এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়েছে। বাংলাদেশে ইসলামের আগমনের পর থেকে মুসলিমদের মধ্যে নামকরণের ইসলামী নীতি অনুসৃত হয়ে আসছে। মুসলিম সংস্কারক, আলিম-ওলামা এ ব্যাপারে মুসলিমদের সংস্কার করে আসছেন। দীর্ঘ প্রচেষ্টায় মুসলিমদের মধ্যে যা অনুশীলিত হয়ে আসছিল, বর্তমানে ইসলামী রীতিনীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব, আধুনিকতার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ঝোঁক বা অতি বাঙালী সাজার প্রবণতার কারণে অনেকাংশে এর অনুশীলনের ব্যাপারে শিথিলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। আলোচ্য প্রবন্ধে এ বিষয়টির অনুশীলনের ধারা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়ার মাধ্যমে এর কারণ ও উত্তরণের উপায় অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। যার মাধ্যমে একজন মুসলিম তার নামকরণ, নামের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্বোধনের ইসলামী রীতি সম্পর্কে অবগত হবেন এবং স্বীয় সমাজে এ সংক্রান্ত ভুল, বিকৃত অনুশীলনের ধারা থেকে নিজেদের সংশোধনে উদ্যোগী হবেন। এমনকি নিজের আত্মপরিচয় উপলব্ধির মাধ্যমে স্বীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ বজায় রাখতে সচেষ্ট হবেন।]*

ভূমিকা

ব্যক্তি বা বস্তুর পরিচয়ের ক্ষেত্রে নাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য যারা বলেন, নাম নয়; বৃক্ষ তার ফলে পরিচয়, তারাও কিন্তু নামহীন মানুষ নন। তাছাড়া ফল দেখার জন্য বৃক্ষের পাশে অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করাও কঠিন। তাই আগে তার নাম জানা দরকার। নাম ছাড়া কোন ব্যক্তি বা বস্তুর পরিচয় দেয়া সম্ভব নয়। তাই মানব সমাজে সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর তার নাম রাখা একটি সর্বজনীন রীতি। এ পৃথিবীতে নামহীন একজন ব্যক্তিও পাওয়া যাবে না। ইসলামে নামের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তাঁর নামের মাধ্যমেই সৃষ্টিজগতে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ সা. এর প্রতি নাযিলকৃত সর্বপ্রথম ওহীতেও তাঁর নামে পড়ার নির্দেশ রয়েছে।[১] অমুসলিম

---

* সিনিয়র লেকচারার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১. আল-কুরআন, ৯৬ : ১

পণ্ডিতগণও বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। প্রখ্যাত ব্রিটিশ সাহিত্যিক ও দার্শনিক William Hazlitt বলেন-

> A name is anchored in the deep abyss of time, as like a star twinkling in the firmament cold, distant, silent, but eternal and sublime.[২]

এভাবে শিশুসন্তান জন্মগ্রহণের পর তার নামকণের ক্ষেত্রেও ইসলাম অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলাম সুস্পষ্টভাবে এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি প্রণয়ন করেছে। রাসূল স. নিজেই অনেক সাহাবীর নাম পরিবর্তন করে দিয়েছেন। আবার কোন্ নাম রাখা যাবে, কিরূপ নাম রাখা যাবে না তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। এদেশের মুসলিমগণ ইসলামী নিয়মানুসারে নামকরণের এ বিষয়টি নিজেদের মধ্যে দীর্ঘদিন থেকে অনুসরণ করে আসছেন। কিন্তু বর্তমানে মুসলিমদের একটি অংশ অজ্ঞতাবশত অথবা বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে ইসলামী রীতি ভুলে বিভিন্ন বিকৃত পদ্ধতির অনুসরণে এ বিষয়টি নিজেদের মধ্যে চর্চা করছে। এ থেকে উত্তরণ প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য।

নামকরণ

নামকরণ শব্দটি বাংলা। শব্দটি 'নাম' ধাতু থেকে উদ্ভুত। নাম বলতে বাংলায় আখ্যা, অভিধা, সংজ্ঞা, যে শব্দ দ্বারা কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে নির্ধারিণ করা যায় ইত্যাদিকে বুঝায়।[৩] ইংরেজীতে শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে Name, appellation, personal name, title, designation, idintity ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।[৪]

আরবীতে শব্দটির প্রতিশব্দ হচ্ছে (اسم) ইস্‌ম। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- যা দ্বারা বস্তুকে চেনা যায় (ما يعرف به الشيء) অথবা যা দ্বারা বস্তুর ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করা হয় (ما يستدل به عليه)। অবশ্য আরবী ব্যাকরণে (নাহু শাস্ত্রে) এর ভিন্ন অর্থও রয়েছে।[৫]

আর নামকরণ বলতে অভিধানে নাম রাখা, সন্তানের নাম রাখা, নবজাত শিশুর একাদশ বা দ্বাদশ দিনে নাম রাখার সংস্কার বিশেষ ইত্যাদি অর্থ করা হয়েছে।[৬]

---

২. William Hazlitt, (10 April 1778 – 18 September 1830) *Essays of William Hazlitt:Selected and Edited by Frank Carr,* London: Forgoten Books, 1989, p. 118

৩. শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১১, পৃ. ৬৭৫

৪. Mohammad Ali and others, *Bangla Academy Bangali-English Dictionary,* Dhaka: Bangla Academy, 1994, p. 355

৫. ড. ইব্রাহীম মাদকুর, *আল মু'জামুল ওয়াসীত,* নয়াদিল্লী : দারুল লি-ইশাআ'তে ইসলামিয়া, তা.বি., পৃ. ৪৫২

৬. শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৫-৬৭৬·

বিষয়টি দ্বারা একাদশ দিনে নবজাতকের নাম রাখার অনুষ্ঠানকে বুঝানো সম্ভবত হিন্দু ধর্মীয় একটি রীতি থেকে প্রচলিত হয়েছে। নামকরণ বলতে হিন্দুদের একটি ধর্মীয় সংস্কারকে বুঝায় অর্থাৎ হিন্দু ধর্মে নবজাতকের নামকরণের অনুষ্ঠান। জন্মের দিন অথবা জন্মের দশম, একাদশ বা দ্বাদশ দিনে পালিত হয়। দশম বা দ্বাদশ দিন হচ্ছে এ কাজের জন্য প্রশস্ত সময়।[৭] ইংরেজীতে এর প্রতিশব্দ Naming, Name giving, Nomenclature ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।[৮] আর আরবীতে তাসমিয়া (تسمية) এর প্রতিশব্দ। এর অর্থ নবজাতক বা কোন বস্তুর চিহ্নসূচক নামকরণ করা।[৯] যেমন আরবীতে বলা হয় (سماه كذا) অর্থাৎ সে তার এরূপ নামকরণ করল। এর সাথে সংশ্লিষ্ট শব্দ (تكنية) তাক্‌নিয়াহ্- উপনাম নিধারণ, (تلقيب) তালক্বীব- উপাধি প্রদান ইত্যাদিও ব্যবহৃত হয়। আর নবজাতক বলতে সদ্য ভূমিষ্ট হওয়া সন্তান বা সদ্যজাত শিশুকে (Newborn baby) বুঝায়।[১০] অতএব নবজাতকের নামকরণ বলতে সদ্যজাত শিশুর নাম রাখাকে বুঝায়।

ইসলামে নামের গুরুত্ব

ইসলাম ব্যক্তির নামকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। যথার্থ নামকরণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির পরিচয় তুলে ধরার ব্যাপারে ইসলামের দিক নির্দেশনা সুস্পষ্ট। নিম্নে এর কয়েকটি দিক উল্লেখ করা হল-

ক. আল্লাহর নিজের নামকরণ

মহান আল্লাহ তাঁর নিজের পরিচয় দেয়ার জন্য নিজেকে নিজেই নামকরণ করেছেন। তিনি তাঁর অসংখ্য নাম রেখেছেন। আমরা উম্মতে মুহাম্মাদীর নিকট তাঁর নিরানব্বইটি নাম প্রকাশ করা হয়েছে। রাসূল স. তাঁর একটি দু'আয় এভাবে উল্লেখ করেছেন যে,

اللَّهُمَّ --- أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ---،

'হে আল্লাহ... আমি তোমার সকল নামের উসিলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, যে নামে তুমি তোমাকে নামকরণ করেছ......'।[১১]

---

৭. সিরাজুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া,* ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১, খ. ৬, পৃ. ৪১৯

৮. Mohammad Ali and others, ibid, p. 355

৯. ড. ইব্রাহীম মাদকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫২

১০. শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬১

১১. ইবনু হিব্বান, *সহীহ ইবনু হিব্বান*, বৈরুত : মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৭, খ. ৩, পৃ. ২৫৩; আহমাদ ইব্‌নে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, কায়রো : দারুল মাআরিফ, ১৯৫৮, খ. ১, পৃ. ৩৯১; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছিস সহীহাহ,* রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তা.বি., হাদীস নং-১৯৯

অন্য হাদীসে তাঁর নিরানব্বইটি নামের কথাও রাসূল স. বলেছেন।[১২]

খ. আল্লাহর নামের প্রতি ঈমান

আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলির একত্বের প্রতি ঈমান আনা প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক। আল্লাহ্‌র একত্বকে আক্বীদার কিতাবসমূহে সাধারণত ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর অন্যতম ভাগ হচ্ছে 'তাওহীদুল আস্‌মা ওয়াস্ সিফাত' অর্থাৎ আল্লাহর নাম ও গুণাবলির একত্ব। তাঁর নামসমূহে কোন প্রকার বিকৃতি, তুলনা, সাদৃশ্য, হ্রাসবৃদ্ধি করা সম্পূর্ণরূপে ঈমানের পরিপন্থী।[১৩] মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾

এবং আল্লাহর আছে সুন্দরতম নামসমূহ। তোমরা এ নামসমূহ দ্বারা তাঁকে ডাকবে। যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করবে। তাদের কৃতকর্মের ফল শ্রীঘই তাদেরকে প্রদান করা হবে।[১৪]

গ. আল্লাহর নামে ডাকা ও প্রার্থনা করা

আল্লাহ্‌র নামসমূহের উসিলা করে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা এবং তাঁর নামসমূহের মাধ্যমে তাঁকে ডাকার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿ قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى﴾

বলুন, আল্লাহ বলে ডাক কিংবা রহমান বলে, যে নামেই ডাকনা কেন, সব সুন্দর নাম তাঁরই।[১৫]

ঘ. মুহাম্মদ সা. এর নামের সুসংবাদ

ঈসা আ. এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী জাতির নিকট মুহাম্মাদ স. এর আগমনের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾

আর স্মরণ কর, যখন মরিয়ম তনয় ঈসা আ. বলল, হে বনী ইসরাঈল- আমি তোমাদের নিকট থাকা তাওরাতের সত্যায়নকারী, তোমাদের প্রতি প্রেরিত

---

১২. মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস্ সহীহ্*, দেওবন্দ : মাকতাবা আশরাফিয়্যাহ, তা.বি., অধ্যায়: আদ্ দাওয়াত, পরিচ্ছেদ : লিল্লাহি তাআ'লা মিআতু ইসমিন গাইরু ওয়াহিদিন, খ. ২, হাদীস নং ৬১৬৩; "إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ"

১৩. আবু বকর জাবের জাযায়িরী, *আক্বীদাতুল মু'মিন*, কায়রো : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ৫১

১৪. আল-কুরআন, ৭ : ১৮০

১৫. আল-কুরআন, ১৭ : ১১০

আল্লাহ্‌র একজন রাসূল এবং এমন একজন রাসূলের সুসংবাদ দাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন তাঁর নাম আহমদ।[১৬]

ঙ. আল্লাহ্ কর্তৃক বান্দার নামকরণ

আল্লাহ কিছু ক্ষেত্রে তাঁর প্রিয় বান্দাদের নিজেই নামকরণ করে দিয়েছেন। এটি আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় নাম। যেমন ইয়াহ্ইয়া আ. এর ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন,

﴿يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا﴾

হে যাকারিয়া, আমি তোমাকে এক পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। তার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া। ইতঃপূর্বে এ নামে আমি কারো নামকরণ করিনি।[১৭]

চ. আল্লাহ্ কর্তৃক নাম শিক্ষা দেয়া

মহান আল্লাহ আদম আ. কে সৃষ্টি করে তাকে সৃষ্টি জগতের সবকিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন। নাম শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে তাকে জ্ঞাত করান এবং যার মাধ্যমে ফিরিশতাকূলের উপর তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾

আর তিনি (আল্লাহ) আদমকে সকল বস্তু সামগ্রীর নাম শিক্ষা দিলেন।[১৮]

ছ. নাম দ্বারাই বস্তুর পরিচয়

একটি বস্তু বা একজন ব্যক্তির পরিচয় তার নামের মাধ্যমে হয়ে থাকে। ব্যক্তির নাম, গোত্র, বংশ ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজে ব্যক্তি স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে টিকে থাকে। অন্যথায় ব্যক্তি সমাজের সাথে একাকার হয়ে যেত। তাকে নির্দিষ্ট করে পরিচিত করার কোন উপায় থাকত না। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾

হে বিশ্বমানব, আমি তোমাদেরকে নারী-পুরুষে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন দল-গোত্রে বিভাজিত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার।[১৯]

জ. আখিরাতে ব্যক্তি নামেই পরিচিত হবে

ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার পরিচয় সে নামেই হবে যে নামে তাকে পৃথিবীতে ডাকা হত। যদি ভাল নাম হয় তাহলে ভাল নামে, অন্যথায় তার খারাপ নামে তাকে ডাকা হবে। রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

---

১৬. আল-কুরআন, ৬১ : ৬
১৭. আল-কুরআন, ১৯ : ৭
১৮. আল-কুরআন, ২ : ৩১
১৯. আল-কুরআন, ৪৯ : ১২

فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلا يَمُرُّونَ يَعْنِي بِهَا عَلَى مَلإٍ مِنْ الْمَلائِكَةِ إِلاَّ قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ فَيَقُولُونَ فُلانُ بْنُ فُلانٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا ---- فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلإٍ مِنْ الْمَلائِكَةِ إِلا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ فَيَقُولُونَ فُلانُ بْنُ فُلانٍ بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا

(মৃত্যুর পর) ফিরিশতারা যখন ওটাকে (কোন রূহ) নিয়ে উর্ধ্ব জগতে আরোহণ করে, তারা যখনই কোন ফিরিশতাদের দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তখন ভাল রূহের ক্ষেত্রে বলা হয়- কে এই ভাল রূহ? ফিরিশতা তার উত্তম নামের মাধ্যমে বলেন, অমুকের পুত্র অমুক, যে নামে তাকে পৃথিবীতে ডাকা হত।... অতঃপর ওটাকে (অন্য কোন রূহ) নিয়ে উর্ধ্ব জগতে আরোহণ করে, তারা যখনই কোন ফিরিশতাদের দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তখন খারাপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ফিরিশতারা তার নিকৃষ্ট নামের মাধ্যমে বলেন- অমুকের পুত্র অমুক, যে নামে পৃথিবীতে মানুষ তাকে ডাকত।[২০]

ঋ. আল্লাহ্র নামের বরকত

প্রত্যেক কাজ আল্লাহ্র নামে শুরু করা মুসলিম জীবনাচরণের অন্যতম অনুষঙ্গ। এমনকি আল্লাহ্র নামে শুরু না করা কাজ হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী বরকত-শূন্য বিবেচিত হবে।[২১] আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ ব্যতীত জবাইকৃত পশু মুসলিমের জন্য খাওয়া হালাল নয়। আল্লাহ্ বলেন,

﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾

যার উপর (জবাইয়ের সময়) আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হয় নি তা তোমরা খাবে না।[২২] তাই ইসলামে নামের গুরুত্ব অপরিসীম।

নামকরণের শরয়ী বিধান

ইসলামে সন্তানের নামকরণ পিতামাতার আবশ্যকীয় কর্তব্য হিসাবে গণ্য। সকল মাযহাবে এটিকে পিতামাতার উপর সন্তানের অধিকার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৩] ইমাম ইবনু 'আরাফা আল-মালিকী [৭১৬-৮০৩ হি.] রহ. উল্লেখ করেছেন, মূলনীতির দাবি হচ্ছে নামকরণ করা ওয়াজিব।[২৪] এক্ষেত্রে মাতার তুলনায় পিতা

---

২০. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৮৭; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহুল জামি' আস-সগীর*, হাদীস নং-১৬৭৬

২১. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৩২৯; كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُفْتَحُ بِبِسْمِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَرُ – হাদীসটি হাসান, *মাজমূউ'ফাতওয়া বিন বা'য*, খ. ২৫, পৃ. ১৩৫

২২. আল-কুরআন, ৬ : ১২১

২৩. আবু বকর জাবির জাযায়িরী, *মিনহাজুল মুসলিম*, কায়রো : মাকতাবাতুর রিহাব, ২০০৭, পৃ. ৭৭

২৪. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *ইসলামী ফিক্হ বিশ্বকোষ*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৩, খ. ২, পৃ. ১৪

অগ্রগণ্য। নামকরণে পিতা-মাতার মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে পিতা অগ্রাধিকার পাবেন।[২৫] আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন

﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ﴾

তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাক। এটাই আল্লাহর কাছে ন্যায়সঙ্গত।[২৬]

এছাড়া সুন্দর নামে ব্যক্তিকে ডাকা ইসলামে মুস্তাহাব। যে নাম ব্যক্তির পছন্দ এবং প্রিয় সে নামেই তাকে ডাকা উচিত।[২৭] খারাপ বা নিকৃষ্ট নামে কাউকে নামাঙ্কিত করা বা কাউকে ডাকা ইসলামে নিষিদ্ধ। এটাকে ইসলামে কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন,

﴿ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

তোমার একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না, কেউ ঈমান আনলে তাদের মন্দ নামে ডাকা গুনাহ, যারা এরূপ কাজ থেকে তাওবা করে না তারা জালিম।[২৮]

নামকরণের সময়

রাসূল সা. সন্তান জন্মগ্রহণ করার সপ্তম দিনে নামকরণ করার কথা বলেছেন। তিনি বলেন,

كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى

প্রত্যেক সন্তানই তার আকীকার সাথে দায়বদ্ধ থাকে, তার পক্ষ থেকে জন্মের সপ্তম দিনে (পশু) জবেহ করা হবে, তার নামকরণ করা হবে এবং তার মাথা মুণ্ডন করা হবে।[২৯]

তবে রাসূল সা. নিজে তাঁর সন্তানের জন্মের দিনই তার পিতা ইবরাহীমের নামানুসারে নামকরণ করেছেন।[৩০] তাছাড়া সাহাবীদের মধ্যে আবু মূসা আল-আশআ'রী রা. তাঁর সন্তান জন্মগ্রহণের দিনই তার নাম রাখেন ইবরাহীম এবং রাসূল সা. এর নিকট নিয়ে আসেন। তিনি তার জন্য দু'আ করেন।[৩১]

---

২৫. ড.আবদুল্লাহ নাসিহ আ'লওয়ান, *তারবিয়াতুল আওলাদ,* কায়রো : দারুস সালাম, ২০০৯, খ. ১, পৃ. ৬৯

২৬. আল-কুরআন, ৩৩ : ৬৯

২৭. আবু আব্দুল্লাহ মুস্তাফা আদ্ওবী, *ফিক্হুল আখলাক,* কায়রো : দারু ইব্নে রজব, ২০০২, খ. ২, পৃ. ২৩৬

২৮. আল-কুরআন, ৪৯ : ১১

২৯. আবদুর রহমান আহমদ বিন শুয়াইব আন-নাসায়ী, *আস-সুনান,* দেওবন্দ : মাকতাবা আশরাফিয়া, তা.বি., অধ্যায় : আল আকীকা, পরিচ্ছেদ : মাতা' ইয়াউ'ক্কা, খ. ২, পৃ. ১৬৭;

৩০. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ আল কুশাইরী, *আস-সহীহ্,* অধ্যায় : আল ফাদাইল, পরিচ্ছেদ : রাহমাতুহু সা. আস্ সিবইয়ানা ওয়াল ই'য়ালা ওয়া তাওয়াদুয়ুহু ওয়া ফাদলু যালিকা, বৈরুত : দারুল ফিক্র, ২০০৩পৃ. ১১৫৭, হাদীস নং ৫৯১৯;

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ

৩১. বুখারী, *আস-সহীহ্,* প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আল-আকীকা, পরিচ্ছেদ : তাসমিয়াতুল মাউলূদ গাদাতান ইউলাদু লিমানলাম ইয়াউক্কা আ'নহু ওয়া তাহনীকুহু, খ. ২, পৃ. ৮২১, হাদীস নং ৫২৫৫;

এসকল হাদীসের আলোকে সকল মাযহাবেই জন্মের পরপরই নাম রাখাকে বৈধ গণ্য করা হয়েছে। তবে ঈমাম শাফিয়ী ও ঈমাম মালিক রহ. জন্মের ৭ম দিনে নামকরণকে মুস্তাহাব গণ্য করেছেন। ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. এর মতে, জন্মগ্রহণের পর ৩ দিন বা ৭ দিন পর্যন্ত নামকরণ বিলম্বিত করা বা এর আগে পরে করা বৈধ। তাঁর মতে, বিষয়টি প্রশস্ত।[৩২]

তবে ইমাম বুখারী রহ. এক্ষেত্রে সূক্ষ্ম পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে, যে সন্তানের আকীকা দেয়া হবে তার নাম রাখা হবে জন্মের ৭ম দিন আর যার আকীকা দেয়া হবে না তার নাম রাখা হবে জন্মের দিন। আল্লামা আহমদ আলী সাহারানপুরী র. বলেন, এরূপ সূক্ষ্ম পার্থক্য ইমাম বুখারী রহ. ব্যতীত আর কেউ করেছেন বলে আমার জানা নেই।[৩৩]

নামকরণের অনুষ্ঠান

ইসলামে সন্তান জন্মগ্রহণের ৭ম দিনে আক্বীক্বার মাধ্যমে সন্তানের নামকরণের কথা বলা হয়েছে। তবে ওযরের কারণে সন্তান জন্মগ্রহণের ১৪তম দিন, ২১তম দিন বা অন্য সময়ে করলে আদায় হয়ে যাবে বলে কোন কোন ফকীহ মতপ্রকাশ করেছেন।[৩৪] এক্ষেত্রে আকীকা ব্যতীত সন্তানের নামকরণে ইসলাম সম্মত আর কোন অনুষ্ঠানের স্বীকৃতি নেই। এ অনুষ্ঠান করতে পুত্র সন্তানের জন্য দু'টি এবং কন্যা সন্তানের জন্য ১টি ছাগল জাতীয় পশু জবাই করার জন্য রাসূল সা. বলেছেন।[৩৫] এমনকি প্রত্যেক সন্তান এরূপ আকীকার প্রতি দায়বদ্ধ। মুহাদ্দিসগণ এ দায়বদ্ধতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, যদি পিতা সন্তানের আকীকা না করেন তাহলে এ সন্তান আখিরাতে পিতার জন্য সুপারিশ করবে না।[৩৬]

অকাল প্রসূত ভ্রূণের নামকরণ

হানাফী মাযহাবে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে, মৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণকারী সন্তানের নামকরণ করা হবে না। তবে এক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. ভিন্ন মত পোষণ

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ

৩২. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবু বকর ইবনুল কায়্যিম, *তুহফাতুল মাউদূদ বি আহকামিল মাউলূদ*, জিদ্দাহ : দারু ইলমিল ফাওয়াইদ, তা.বি., পৃ. ১৬২

৩৩. বুখারী, আস-*সহীহ্*, প্রাগুক্ত, পার্শ্বটীকায় উল্লেখিত, খ. ২ পৃ. ২৮১

৩৪. সাইয়্যেদ সাবিক, *ফিক্হুস্ সুন্নাহ*, কায়রো : দারুল ফাত্হ, ২০০৯, খ. ৩, পৃ. ১৯৩

৩৫. আবু দাউদ সুলাইমান ইবনু আশআ'স আস-সিজিস্তানী, আন-*সুনান*, অধ্যায় : আদ্ দাহাইয়া, পরিচ্ছেদ : ফিল আক্বীক্বাতে, বৈরূত : দারুল ফিক্র, ২০০৫ পৃ. ৫৩৮, হাদীস নং ২৮৪২;

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ، عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

৩৬. আবু আলী মুহাম্মদ আবদুর রহমান বিন আবদুর রহীম মোবারকপুরী, *তুহফাতুল আহ্ওয়াজী*, বৈরূত : দারুল ফিক্র, ২০০৫, খ. ৫, পৃ ১১৪

করেছেন। মালিকী মাযহাবেও এ মতই বর্ণিত হয়েছে। তবে ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতে, এরূপ সন্তানের নামকরণ করা হবে। ইমাম আহমাদ রহ. এরূপ সন্তানের নামকরণ মুস্তাহাব বলে উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে সন্তান ছেলে না মেয়ে বুঝা না গেলে উভয়ের জন্য প্রযোজ্য এরূপ কোন নাম রাখা যেতে পারে।[৩৭]

জন্মের পর মৃত্যুবরণকারী নবজাতকের নামকরণ

ফকীহগণের মতে, জন্মের পর মৃত্যুবরণকারী সন্তানের নামকরণ করা হবে। হানাফী মাযহাব মতে, জন্মের পর নবজাতক চিৎকার করলে বড়দের মত তার সকল অধিকার সাব্যস্ত হয়ে যাবে। মালিকী ও শাফিয়ী মাযহাব মতে, এরূপ সন্তানের নামকরণ করা মুস্তাহাব।[৩৮]

যেসব নাম রাখা উত্তম

সাধারণত যে সকল নামের ব্যাপারে ইসলামে নিষিদ্ধতা নেই, সে সকল নাম রাখা বৈধ বলে গণ্য হবে। তবে জমহুর আলিমগণের মতানুসারে আল্লাহ্ বা তাঁর বিশেষ গুণসমূহের সাথে সম্পর্কিত দাসত্বজ্ঞাপক নাম রাখা মুস্তাহাব।[৩৯] রাসূল সা. বলেন,

إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

তোমাদের নামসমূহের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান।[৪০]

ইমাম কুরতুবী র. এর মতে, এ উত্তমতা এ দু'টি নামের মত আল্লাহর অন্যান্য গুণবাচক নামের সাথে সম্বন্ধযুক্ত যেমন- আবদুল মালিক, আবদুর রহীম ইত্যাদির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।[৪১]

ইবনে আবিদীনের মতে- সাধারণভাবে 'আব্দুল্লাহ' নাম সব নাম থেকে, এমন কি আবদুর রহমান থেকেও উত্তম। আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান এ দু'টির পর সর্বোত্তম নাম মুহাম্মাদ, তারপর আহ্মাদ, তারপর ইবরাহীম। তিনি আরো বলেন- আব্দুল্লাহ, আবদুর রহমান নামকরণ তাদের জন্য উত্তম, যারা দাসত্বসূচক নামকরণে আগ্রহী। সাধারণভাবে উত্তম নয় এবং এ উত্তমতা আল্লাহর নিকট মুহাম্মাদ ও আহমাদ নাম সবচেয়ে প্রিয় হওয়ার পরিপন্থীও নয়। কেননা তিনি তাঁর নবীর জন্য তার নিকট সবচেয়ে প্রিয় নামই পছন্দ করেছেন। এটিই সঠিক।[৪২]

---

৩৭. *ইসলামী ফিক্‌হ বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭-১৮

৩৮. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮

৩৯. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৯

৪০. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : আন্ নাহ্ইউ আনিত্ তাকান্নি বি আবিল ক্বাসিম ওয়া বায়ানু মা ইয়াসতাহিব্বু মিনাল আসমা', পৃ. ১১৭৪, হাদীস নং ৫৪৮০;

৪১. ত্বাকী ওসমানী, *তাক্বমিলাতু ফাতহিল মুলহিম*, করাচী : মাকতাবাতু দারুল উলুম, ১৪২৪ হি., খ. ৪, পৃ. ২০৬-২০৭

৪২. *ইসলামী ফিক্‌হ বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭-১৮

নবীদের নামে নামকরণ নিয়ে কেউ কেউ মতভেদ করলেও জমহুর আলিমদের মতে নবীদের নামে নামকরণ বৈধ। কেননা রাসূল স. বলেন, তোমরা নবীদের নামে নামকরণ কর।[৪৩] তবে মুহাম্মাদ ও আহ্মাদ নামে নামকরণের ফযীলতের বিবরণ সম্বলিত যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার সবই খুবই দুর্বল বা জাল।[৪৪] মুহাম্মাদ স.-এর নামে নাম রাখার ব্যাপারেও হাদীসে এসেছে- سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تُكَنُّوا بِكُنْيَتِي "আমার নামে (মুহাম্মাদ) নামকরণ কর, তবে আমার কুনিয়্যাত বা উপনাম (আবুল কাসিম) দ্বারা উপনাম রেখো না।"[৪৫]

তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের মতে, রাসূল স.-এর এ নিষেধাজ্ঞা তার জীবদ্দশায় প্রযোজ্য ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কুনিয়্যাত (আবুল কাসিম) দ্বারা নামকরণ বৈধ। কেননা আলী রা. এর পৌত্র মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যা রহ.-এর কুনিয়্যাত ছিল আবুল কাসিম। এভাবে নবী, রাসূল, ওলী, বুযুর্গ ব্যক্তির নামানুসারে নামকরণ উত্তম।[৪৬] এছাড়া আরবী ভাষায় ভাল অর্থবোধক শব্দে নাম রাখা বৈধ। তবে তা রাসূল স. কর্তৃক নিষিদ্ধ বা অপছন্দনীয় নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

নামের ভাষা

মুসলিমের নামকরণ সাধারণভাবে আরবীতেই চলে আসছে সাহাবীদের যামানা থেকে। তবে কিছু সংখ্যক শব্দ, যা অন্যভাষার হলেও এগুলো দীর্ঘদিন আরবীতে ব্যবহৃত হওয়ায় আরবী রূপ লাভ করেছে (মুআর্রাব)[৪৭] এমন শব্দেও নামকরণ করা হয়ে থাকে। যেমন ইবরাহীম, ইসরাঈল ইত্যাদি। এ ব্যাপারে আরবী ব্যতীত অন্য যে কোন ভাষায় নামকরণের ব্যাপারে রাসূল স. থেকে সরাসরি কোন অনুমোদন বা নিষেধাজ্ঞা আমার জানা নেই। তবে উমর রা. তাঁর রাষ্ট্রীয় যে ফরমান বিজিত অমুসলিমদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন তাতে মুসলিমদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নাম অমুসলিমদের অনুসরণের নিষেধাজ্ঞা বুঝায়। তার ফরমানে তিনি এ বলে অমুসলিমদের থেকে

---

[৪৩] আবু দাউদ সুলাইমান ইবনু আশআ'স আস-সিজিস্তানী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : ফি তাগ্ইরিল আসমা', পৃ. ৯২৫, হাদীস নং ৪৯৫০; تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ

[৪৪] ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *হাদীসের নামে জালিয়াতি*, ঝিনাইদহ : আস্ সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৮, পৃ. ২০৯

[৪৫] বুখারী, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : মান সুম্মিয়া বি ইসমিল আম্বীয়া, খ. ২, হাদীস নং ৫৯৫৫;

[৪৬] ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ তাবরিযী, *মিশকাত শরীফ ব্যাখ্যাংশ*, নূর মুহাম্মদ আজমী ও আফলাতুন কায়সার অনূদিত ব্যাখ্যাসহ, ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৮, খ. ৯, পৃ. ৫৩

[৪৭] যে বিদেশী শব্দকে হুবহু রূপে অথবা আরবী শব্দ গঠন কাঠামোতে পরিবর্তন করে আরবী ভাষায় রূপান্তর করা হয়েছে। এরূপ শব্দকে মু'আর্রাব বলে। দ্র. আহমদ মুখতার উমর, *মু'জামুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ আল-মুআ'সারাহ*, কায়রো : আ'লিমুল কুতুব, ২০০৮, খ. ৩, পৃ. ১৪৭৭

অঙ্গীকার আদায় করেন যে, 'আমরা মুসলিমদের সম্মান করব...। আমরা তাদের নাম ও উপাধির মত উপাধি ব্যবহার করব না।'[৪৮] এ থেকে মুসলিম অমুসলিম নামকরণের পার্থক্য থাকার আবশ্যকীয়তা বুঝা যায়। ইমাম ইব্‌নে তাইমিয়্যাহ্ রহ. কেবল অমুসলিমদের নাম নয়; বরং জাতীয়তা বোধক নামকেও মাকরূহ বলেছেন। তিনি দলীল হিসাবে রাসূল স. এর দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। যে ব্যক্তি জাতীয়তার দিকে ডাকে সে আমার দলভুক্ত নয়।[৪৯] এ হাদীসে পারস্পরিক যে ডাকার কথা বলা হয়েছে তা জাতীয়তাবোধক নামের ক্ষেত্রে। কেননা এরূপ জাতীয়তাবোধক সম্মন্ধবাচক শব্দ দ্বারা ব্যক্তির পরিচয় দেয়া হয়। আর জাতীয়তাবোধক এরূপ সম্বন্ধবাচক শব্দ আল্লাহ্‌র রাসূল স. অপছন্দ করেছেন। যেমন রাসূল স.-এর এক সাহাবী কর্তৃক আমি ফরাসী যুবক বলার প্রতি উত্তরে তিনি বলেন, তুমি কেন বললে না আমি আনসারী যুবক। এর দ্বারা রাসূল স. শারয়ী' সম্বন্ধবাচক শব্দকে গ্রহণ করা পছন্দ করেছেন।[৫০] এছাড়া রাসূল স. এর হাদীস وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ "যে ব্যক্তি অন্য কোন জাতির সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়"।[৫১] এ হাদীস দ্বারাও বুঝা যায়, অমুসলিমদের অনুশীলনকৃত নিজস্ব ভাষায় তাদের নামকরণের ধারায় মুসলিমদের জন্য অনুসরণ করা উচিত নয়। তাই নামকরণ আরবী ভাষাতেই হওয়া উচিত।

ফিরিশ্‌তাদের নামে নামকরণ

অধিকাংশ আলিম ফিরিশতাদের নামে নামকরণ জায়িয বলেছেন। তবে ইমাম মালিক রহ. বিষয়টি মাকরূহ বলেছেন। আবার হারিস বিন মিসকীন রহ. এরূপ নামকরণকে উত্তম বলে মত প্রকাশ করেছেন।[৫২] তবে এক্ষেত্রে জমহুরের বক্তব্যই অগ্রগণ্য।

যে সব নামে নামকরণ হারাম

আল্লাহ তা'আলার সাথে খাস নামসমূহ দ্বারা অন্য কারো নামকরণ করা হারাম। যেমন- খালিক, কুদ্দূস, রাহমান, অথবা এমন কোন উপাধি যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয়, তাও হারাম। যেমন- রাজাধিরাজ। রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

---

৪৮. ক্বারী মুহাম্মদ তাইয়েব, *আত্-তাশাববুহ ফিল ইসলাম*, মাওলানা কারামত আলী নিযামী অনূদিত, ঢাকা : আল-হিকমাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৭, পৃ. ৭৭-৭৮

৪৯. আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : ফিল আসাবিয়্যাহ, পৃ. ৯৫৬, হাদীস নং ৫১২১; لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ

৫০. আহমদ বিন আবদুল হালীম ইবনু তাইমিয়্যাহ, *ইক্বতিযাউস সিরাত্বিল মুসতাকীম*, কায়রো : দারুল হাদীস, ২০০২, পৃ. ৬৯

৫১. আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আল-লিবাস, পরিচ্ছেদ : ফি লুবসিস্ শুহরাহ, পৃ. ৭৫০, হাদীস নং ৪০৩১; ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন। *ইক্বতিযাউস সিরাত্বিল মুসতাকীম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

৫২. *ইসলামী ফিক্‌হ বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৪

أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٍ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاكِ

কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট নামসমূহের মধ্যে সবচেয়ে ক্রোধ উদ্রেককারী ও বিরক্তিকর হবে সেই ব্যক্তির নাম, যার নাম রাখা হয়েছে মালিকুল আমলাক অর্থাৎ রাজাধিরাজ।[৫৩]

তবে যে সকল নাম বহু অর্থবোধক আল্লাহ্ তা'আলা ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় তা দ্বারা নামকরণ জায়িয। যেমন আলী, রাশীদ ও বাদী' ইত্যাদি। আল-হাস্কাফী বলেন- আমাদের ক্ষেত্রে তা এক অর্থে ব্যবহৃত হবে এবং আল্লাহর ক্ষেত্রে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হবে।[৫৪] যেমন আল্লাহ নিজেই রাহীম শব্দ দ্বারা রাসূল স. কে গুণান্বিত করেছেন।[৫৫]

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো সাথে সম্মন্ধবাচক দাসসূচক নামকরণ হারাম। এ ব্যাপারে সকল ফকীহ্ একমত পোষণ করেছেন। যেমন আবদুল উয্যা, আবদু আমর, আবদুল কা'বা, আবদুদ্ দার, আবদু ফুলান (অমুকের দাস) ইত্যাদি।[৫৬] হাম্বলী মাযহাব মতে নবী সা. এর সাথে নির্দিষ্ট এরূপ নাম রাখাও হারাম। যেমন-(سيد ولد ادم) আদম সন্তানের নেতা, (سيد الناس) মানবজাতির নেতা, (سيد الكل) সকলের নেতা, (خير البشر) মানবজাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ইত্যাদি।[৫৭]

যে সকল নাম অপছন্দনীয়:

ইসলামী শরী'আতে এমন সব শব্দ দ্বারা নামকরণ অপছন্দ করা হয়েছে যার (নামের অর্থ) অবিদ্যমানতাকে অপছন্দ করা হয়। যেমন- রাবাহ (লাভ), আফলাহ (সফল), নাফি' (উপকারী), ইয়াসার (স্বচ্ছলতা) ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, তোমার সন্ত ানের নাম ইয়াসার, রাবাহ, নাজীহ বা আফলাহ রাখবে না । কারণ তুমি অবশ্যই বলবে অমুক কি আছে? উত্তরে সে না থাকায় (উত্তর দাতা) বলবে, নেই।[৫৮]

---

৫৩. বুখারী, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : আবগাদুল আসমাই ইলাল্লাহ, খ. ২, পৃ. ৯১৬, হাদীস নং ৫৯৬৪;

৫৪. *ইসলামী ফিক্হ বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫

৫৫. আল-কুরআন, ৯ : ১২৮

৫৬. *ইসলামী ফিক্হ বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫

৫৭. প্রাগুক্ত

৫৮. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, আস-*সহীহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : কারাহিয়াতুত্ তাসমিয়াতি বিল আসমাইল ক্বাবিহাতি ওয়া বি নাফি' ওয়া নাহ্ওয়াহু, পৃ. ১০৭৬, হাদীস নং ৫৪৯২;

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ : أَفْلَحَ وَرَبَاحٍ وَيَسَارٍ وَنَافِعٍ

আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী, *আল-জামি'*, দেওবন্দ : মাকতাবা আশরাফিয়া, তা.বি., অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : মা যাআ' মা ইউকরাহু মিনাল আসমা, খ. ২, পৃ. ১১১;

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ رَبَاحٌ وَلَا أَفْلَحُ وَلَا يَسَارٌ وَلَا نَجِيحٌ ؛ يُقَالُ : أَثَمَّ هُوَ ؟ فَيُقَالُ :

অবশ্য এরূপ নিষিদ্ধতা মাকরূহ তানযিহী ধরনের। কেননা ওমর রা. এর পরবর্তী বংশধর বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন "রাবাহ"। যার নিকট থেকে ইমাম বুখারী রহ.ও হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৫৯] ইবনে উমর রা. এর আযাদকৃত একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস দাস ছিল যার নাম ছিল নাফি'। এছাড়া আরো কয়েকজন সাহাবী ও বিখ্যাত মুহাদ্দিস তাবিয়ীও এ নামে ছিলেন বলে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন।[৬০]

আর সেসব নামও অপছন্দনীয়, যা থেকে বিরক্তির উদ্রেক হয়। যেমন হারব (যুদ্ধ), মুর্‌রা (তিক্ত), কাল্‌ব (কুকুর), হায়্যাতুন (সাপ) ইত্যাদি। মালিকী মাযহাব মতে, মন্দ সকল নাম রাখা নিষিদ্ধ। যেমন হারব (যুদ্ধ), হুয্‌ন (দুঃশ্চিন্তা), যিরার (ক্ষতি) ইত্যাদি। শাফিয়ী মাযহাব মতে, মন্দ নাম রাখা মাকরূহ। যেমন- শয়তান, জালিম (অত্যাচারী), শিহাব (অগ্নিশিখা), হিমার (গাধা) ইত্যাদি। হাম্বলী মাযহাব মতে, অহংকারীদের নামানুসারে নামকরণ মাকরূহ। যেমন- ফেরাউন ও শয়তানের নামসমূহ।[৬১]

এছাড়া রাসূলুল্লাহ স. যে নাম দ্বারা স্বীয় পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রশংসা বুঝায় এরূপ নাম অপছন্দ করেছেন। যেমন- বাররাহ (নেককার)।[৬২] আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. উল্লেখ করেছেন যে, এভাবে তাক্বী, মুত্তাক্বী, মুখলিস, আবরার ইত্যাদি যে সকল শব্দ দ্বারা ব্যক্তির পরিশুদ্ধতা ও প্রশংসা বুঝায় এরূপ শব্দ দ্বারাও নামকরণ মাকরূহ।[৬৩]

নাম পরিবর্তন ও সুন্দর করা

নাম পরিবর্তন করা সাধারণত জায়িয। তবে খারাপ নাম পরিবর্তন করে ভাল নাম রাখা, নাম সুন্দর করা সুন্নাহ। রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيامَةِ بِأَسْمائِكُمْ وأَسْماءِ آبائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْماءَكُمْ

কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নাম ও পিতার নামানুসারে ডাকা হবে। তাই তোমাদের নামসমূহ সুন্দর করো।[৬৪]

---

৫৯. শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে নাসিরুদ্দিন আল-কাইসী আদ্-দামিশক্বী, *তাওযীহুল মুতাশাবিহ*, দামিশ্‌ক : দারুর রিসালাতিল আম্মাহ, ২০১০, খ. ১, পৃ. ৮৭৬

৬০. ওয়ালিউদ্দিন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল খতিব আত্ তাবরিযী, *মিশকাতুল মাসাবিহ*, ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি., পৃ. ৬২১; সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২, খ. ১৪, পৃ. ৭২৭-৭৩৪

৬১. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, দামিশক্ : দারুল ফিক্‌র, ১৯৮৯, খ. ৩, পৃ. ৬৪২-৬৪৩; *ইসলামী ফিক্‌হ বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২/২৩

৬২. বুখারী, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : তাহমীলুল ইসমি ইলা ইসমিন হুয়া আহসানু মিনহু, খ. ২, পৃ. ৯১৪, হাদীস নং ৫৯৫১

৬৩. শামসুদ্দিন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবী বকর ইবনুল কাইয়িম, *যাদুল মাআ'দ*, বৈরুত : মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৮, খ. ২, পৃ. ৩১৪

৬৪. আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : ফি তাগ্‌ইরিল আসমা', পৃ. ৯২৫, হাদীস নং ৪৯৪৮;

রাসূলুল্লাহ স. এরূপ অনেক সাহাবীর মন্দ নাম পরিবর্তন করে ভাল নাম রেখেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ স. উমর রা. এর এক কন্যার নাম 'আসিয়া (অবাধ্যা নারী) পরিবর্তন করে জামীলা (সুন্দরী) রেখেছেন।[৬৫]

এছাড়া নবী সা. আল-আস, আযীয, 'আতালা, শয়তান, আল-হাকাম, গুরাব, হুবাব নাম পরিবর্তন করেছেন এবং শিহাব নাম পরিবর্তন করে হিশাম রেখেছেন। তিনি হারব (যুদ্ধ) এর পরিবর্তে সিল্ম (শান্তি), মুদতাজি' (অস্থির) এর পরিবর্তে মুনবাইছ (সক্রিয়), আফরা (মরুভূমি) নামক ভূমিকে খাদিরাহ (সবুজ), শিয়াবুদ দালালাহ (ভ্রষ্ট জনপদ) কে শিয়াবুল হুদা (হিদায়েতের জনপদ), জারজ ও কুলভ্রষ্ট সন্তানকে কুলপুত্র ও সুপুত্র নামে নামকরণ করেছেন।[৬৬]

এক নাম পরিবর্তন করে অন্য নাম রাখা জায়িয হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণ একমত। বরং খারাপ নাম পরিবর্তন করে শরীয়ত সম্মত নাম রাখাই বাঞ্ছনীয়।

একাধিক নামকরণ, উপনাম (কুনিয়্যাত[৬৭]) ও উপাধি[৬৮] গ্রহণ

ইসলামে একাধিক নামকরণ বৈধ। যেমন- আমাদের নবী সা. এর নাম পবিত্র কুরআনেই মুহাম্মাদ ও আহমাদ দু'ভাবে এসেছে।[৬৯] তবে অবশ্যই সবগুলো নামই ইসলামী শরী'আহ্ অনুমোদিত ও অর্থবোধক হওয়া উচিত।

তবে একাধিক নামের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় নামটি কুনিয়্যাত বা উপনাম হিসেবে গ্রহণ করা ইসলামী শরী'আহ্ সম্মত। যেমন, রাসূলুল্লাহ স.-এর উপনাম আবুল কাসিম। এটি আমাদের পূর্ববর্তী সাহাবী, তাবিয়ীদের অনুশীলিত ধারা। কখনো তাঁরা নিজের নাম, কখনো তার সন্তান, পিতা বা তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্মন্ধিত করে এটি

---

৬৫. আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : ফি তাগ্ইরিল ইসমিল কাবিহ, পৃ. ৯২৬, হাদীস নং ৪৯৫২; أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ ، قَالَ : أَنْتِ جَمِيلَةُ

৬৬. আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২৭, হাদীস নং ৪৯৫৬;
وَغَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ الْعَاصِ وَعَزِيزٍ وَعَتَلَةَ وَشَيْطَانٍ وَالْحَكَمِ وَغُرَابٍ وَحُبَابٍ وَشِهَابٍ فَسَمَّاهُ هِشَامًا وَسَمَّى حَرْبًا سَلْمًا وَسَمَّى الْمُضْطَجِعَ الْمُنْبَعِثَ وَأَرْضًا تُسَمَّى عَفِرَةَ سَمَّاهَا خَضِرَةَ وَشَعْبَ الضَّلَالَةِ سَمَّاهُ شَعْبَ الْهُدَى وَبَنُو الزِّنْيَةِ سَمَّاهُمْ بَنِي الرِّشْدَةِ وَسَمَّى بَنِي مُغْوِيَةَ بَنِي رِشْدَةَ

৬৭. ব্যক্তির মূল নাম ব্যতীত যে নাম বা উপাধি দ্বারা ব্যক্তি পরিচিতি লাভ করেন। এটি পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন, চাচা, ফুফু, মামা, খালা ইত্যাদির সাথে সম্বন্ধিত হয়ে ব্যবহৃত হয়। যেমন- আবল হাসান (হাসানের পিতা), উম্মুল খাইর (খাইরের মা)। *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০২

৬৮. ব্যক্তির নামকরণের পর পরিচয়, মর্যাদা বা অহংকারের জন্য যে নাম গ্রহণ করা হয়। অবশ্য অহংকারের জন্য এরূপ নাম গ্রহণ অবৈধ। *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩৩

৬৯. আল কুরআন, ৪৮ : ২৯; আল-কুরআন, ৬১ : ৬

ব্যবহার করতেন। যেমন নবী সা. আয়িশা রা. কে তাঁর বোনের ছেলের নামের সাথে সম্মন্বিত করে উম্মু আবদিল্লাহ উপনাম দিয়েছেন। আবু হুরায়রা রা. কে তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট বিড়ালের সাথে সম্মন্বিত করে আবু হুরায়রা উপনাম দিয়েছেন। সাহাবীগণ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কে তাঁর পিতার সাথে সম্মন্বিত করে ইবনু আব্বাস উপনামে ডাকতেন। কিন্তু অনারবগণ, বিশেষ করে উমাইয়া খিলাফতের সময়ে এ ধারাকে বিলুপ্ত করেছে। তারা তখন দীন, মিল্লাত, হক ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত করে অহংকারবশত তাদের উপনাম গ্রহণ শুরু করে। যেমন- ইয্যুদ্দিন (দীনের সম্মান), ইয্যুল মিল্লাত (জাতির মর্যাদা) ইত্যাদি। অথচ সংশ্লিষ্ট নামের অর্থের বিপরীত নামই তার কর্মের আলোকে তার জন্য যথার্থ।[৭০]

আর অহংকার ব্যতীত ব্যক্তির কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ অথবা ব্যক্তির পরিচিতির জন্য উপাধি গ্রহণও ইসলামে বৈধ। সাহাবী, তাবিয়ী ও পূর্ববর্তী মুহাদ্দিস, ফকীহ্গণের মধ্যে এ ধারা চালু ছিল।

নাম সংক্ষিপ্তকরণ

সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ইসলামে নাম সংক্ষিপ্তকরণ বৈধ। কোন সম্বোধিত ব্যক্তির নামের শেষাংশ থেকে দু-একটি অক্ষর বিলুপ্ত করে এ সংক্ষিপ্তকরণ করতে হয়। আরবী ব্যাকরণের ভাষায় এটিকে তারখীম[৭১] বলে। এ পদ্ধতিতে রাসূল সা. তাঁর স্ত্রী আয়িশা রা. কে সম্বোধন করার সময় স্নেহ করে يَا عَائِشُ (হে 'আয়িশু) বলেছেন।[৭২] আবু হুরায়রা রা. কে يا أَبَا هِرٌّ (হে আবু হির্) বলেছেন।[৭৩] অবশ্য আল্লামা ইবনে বাত্তাল রহ. রাসূল স.-এর এ ব্যবহারকে তারখীম বলতে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ স. আয়িশা ও হুরায়রা আরবী স্ত্রীবাচক শব্দদ্বয়ের পুংলিঙ্গ রূপ 'আয়িশু ও হির্ ব্যবহার করেছেন।[৭৪] তবে তারখীম হোক অথবা স্ত্রীবাচক শব্দের পরিবর্তে পুংলিঙ্গ

---

৭০. আহমদ বিন আবদুল হালীম ইবনু তাইমিয়্যাহ, *মাজমুউ'ল ফাত্ওয়া*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০০, খ. ২৬, পৃ. ১৩৭-১৩৮

৭১. তারখীম হচ্ছে সহজতার জন্য সম্বোধিত ব্যক্তির নামের শেষাংশের একটি অক্ষর বিলুপ্তকরণ। যেমন- মালিককে হে মালু, মানসুরকে হে মানসু ও উসমানকে হে উসমু বলা। সিরাজুদ্দিন ওসমান চিশতী, *হেদায়াতুন্ নাহ্*, মাওলানা আবদুস সামাদ ও অন্যান্য অনূদিত ব্যাখ্যাসহ, ঢাকা : আল বারাকা লাইব্রেরী, তা.বি., পৃ. ৬৯

৭২. বুখারী, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : ফাদা'য়িলুস সাহাবাহ, পরিচ্ছেদ: ফাদলু 'আয়িশাহ র., হা.নং: ৩৫৫৭

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما **يا عائش** هذا جبريل يقرئك السلام .

৭৩. বুখারী, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আল গুসল, পরিচ্ছে: আল জুনুব ইয়াখরুজু, হা.নং: ২৮১

فقال (أين كنت **يا أبا هر**) . فقلت له فقال (سبحان الله **يا أبا هر** إن المؤمن لا ينجس) .

৭৪. আহমদ ইবনু হাজর আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, কায়রো : মাকতাবাতুস সাফা, ২০০৩, খ. ১০, পৃ. ৬৭৯

বাচক শব্দ ব্যবহার হোক উল্লেখিত দু'টি পদ্ধতি ব্যতীত নাম সংক্ষিপ্তকরণে আর কোন পদ্ধতি রাসূল স. ও সাহাবীদের থেকে পাওয়া যায় না। অতএব, এ পদ্ধতিদ্বয়ের বাইরে নাম সংক্ষিপ্তকরণে আর কোন পদ্ধতি ইসলামে বৈধ নয়।

ব্যক্তির উপর নামের প্রভাব

ব্যক্তির নামের অর্থ ব্যক্তির জীবনাচরণে প্রভাব বিস্তার করে থাকে যা হাদীস দ্বারা স্বীকৃত। ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ্ স. ও কাফিরদের মধ্য প্রচণ্ড উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে দু'পক্ষের মধ্যে দূত আগমন-প্রস্থান চলছিল। এ ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ কাফিরদের পক্ষ থেকে সুহাইল (অতি সহজ) বিন আমর আগমন করলে তার সাথে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। তার আগমন প্রত্যক্ষ করে রাসূল সা. বলেন, তোমাদের কাজ সহজ হয়ে গেল।[৭৫] এখানে সুহাইলের নামের অর্থের প্রতি রাসূল সা. ইশারা করেন।

এছাড়া সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তার দাদা হায্ন রাসূলুল্লাহ্ স.-এর নিকট আগমন করলে তিনি তার নাম জিজ্ঞাসা করেন। তার নাম হায্ন (দুঃশ্চিন্তা) শুনে রাসূল সা. তার নাম পরিবর্তন করে বললেন, তোমার নাম সাহল (সহজ, স্বাভাবিক)। তিনি তার পিতার দেয়া নাম পরিবর্তন করতে চাইলেন না। ফলে তার নাম হায্নই থেকে গেল। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ. বলেন, আমাদের পরিবারে এখন পর্যন্ত দুঃশ্চিন্তা, বিষণ্নতা লেগেই আছে।[৭৬] তাই ব্যক্তির নাম রাখার সময় ভাল অর্থবোধক নাম রাখা উচিত।

নাম ধরে ডাকা

সাধারণভাবে ব্যক্তিকে তার নাম ধরে ডাকা বৈধ। তবে ব্যক্তির মর্যাদা হানি হয় এমনভাবে ডাকা বৈধ নয়। হানাফী মাযহাব মতে, কোন ব্যক্তি তার পিতাকে বা স্ত্রী তার স্বামীকে সরাসরি নাম ধরে ডাকা মাকরূহ। বরং এমন শব্দে ডাকা উচিত, যাতে সন্তান ও স্ত্রীর উপর তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। শাফিয়ী মাযহাব অনুযায়ী কোন ব্যক্তির সন্তান, ছাত্র ও সেবকের জন্য সুন্নাত হলো তাকে নাম ধরে না ডাকা। আবার গর্ব-অহংকার প্রকাশ পায় এরূপভাবে আমার দাস, আমার মুনিব বলা হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী নিষিদ্ধ।[৭৭]

---

৭৫. বুখারী, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আশ-শুরুত্ব, পরিচ্ছেদ : আশ-শুরুতু ফিল জিহাদি ওয়াল মুসালাহাতু মাআ' আহলিল হারবি ওয়া কিতাবাতিশ শুরুতি মাআ'ন নাসি বিল কাওলি, খ. ১, পৃ. ৩৭৭, হাদীস নং ২৬৫১; لَمَّا جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ

৭৬. বুখারী, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : ইসমিল হুয্ন, খ. ২, পৃ. ৯১৪, হাদীস নং ৫৯৪৯; عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ حَزْنٌ- قَالَ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ لا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي- قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتْ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ

৭৭. *ইসলামী ফিক্হ বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৮

নাম নিবন্ধন

সরকারী বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নাম নিবন্ধন ইসলামে বৈধ। ইসলামে ইবাদত ও মুআ'মালাত দু'ভাবে শরয়ী বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। পারস্পরিক লেনদেন, পার্থিব কার্যক্রম সাধারণত মুআ'মালাতের অন্তর্ভুক্ত। আর এক্ষেত্রে শরয়ী' নিষিদ্ধতা ব্যতিরেকে সকল কার্যক্রমই বৈধ।[৭৮] নাম নিবন্ধন যেহেতু এরূপ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত তাই এটি জায়েয।

বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে অনুশীলন

ইসলাম নির্দেশিত বিধানের আলোকে বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিমের মধ্যে নামকরণের এ প্রক্রিয়া পূর্ণরূপে অনুশীলিত হচ্ছে না। কেউ পূর্ণরূপে, কেউ আংশিক, কেউ বা বিকৃতভাবে তা অনুশীলন করছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

মুসলিম সমাজে ইসলামী নামকরণের ধারা

এদেশে এক সময় মানুষ সনাতন বা হিন্দু ধর্মের অনুসরণ করত। পৃথিবীতে ইসলামের আগমনের পর মাত্র পাঁচ দশকের ব্যবধানে বিশ্বব্যাপী ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে। এ ধারাবাহিকতায় খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের আগে-পরে এ অঞ্চলে ইসলামের আগমন ঘটেছে বলে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন।[৭৯] এখানে যারাই ইসলাম গ্রহণ করেছেন তারা নিজেদেরকে ইসলামের বিধানাবলীর আলোকে ঢেলে সাজাতে চেষ্টা করেছেন। নিজেদের হিন্দু-ধর্মীয় নাম পরিবর্তন করে ইসলামী নামকরণ এ প্রক্রিয়ারই একটি অবিচ্ছেদ অংশ ছিল। তবে পূর্ণরূপে তা অনুশীলিত হতে দীর্ঘদিন লেগে যায়। গবেষকদের মতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেও কিছু মুসলিমের নামে হিন্দুয়ানী নামের অস্তিত্ব পাওয়া যেত। ১৯১১ সালে প্রকাশিত নোয়াখালীর ডিস্ট্রিক গেজেটে উল্লেখ করা হয়, জেলাটির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আদিবাসী উপজাতীয় বংশীয় এবং চাঁদ, পাল ও দত্ত পদবীধারী (মুসলমানদের) এখনো এ জেলায় দেখা যায়।[৮০]

কিন্তু মুসলিম সংস্কারক কারামত আলী জৈনপুরী রহ. (মৃ. ১৮৯৪ খ্রী.) সহ তৎকালীন আলিম-ওলামার প্রচেষ্টায় তা দূরীভূত হয়। পরবর্তীতে অন্য গবেষণায় তা ফুটে উঠে। ১৯৫৬ সাল নাগাদ দেখা যায়, উক্ত জেলার মুসলিমদের মধ্যে উল্লেখিত ধরনের নাম

---

৭৮. ইবনে তাইমিয়্যাহ, *ইক্বতিজাউস সিরাত্বাল মুসতাক্বিম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১

৭৯. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ২১

৮০. রিচার্ড এম. ইটন, *ইসলামের অভ্যুদয় এবং বাংলাদেশ ১২০৪-১৭৬০*, হাসান শরীফ অনূদিত, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ৩৩৪

বাস্তবেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। আর সংস্কারক আলিমদের প্রভাবের কারণে তা আরবী পদবীতে রূপান্তরিত হয়েছে।[৮১]

তবে মুসলিমগণ এখানকার স্থানীয় মর্যাদা ও সামাজিক অবস্থার আলোকে শেখ, ভূঞা, খান ইত্যাদি উপাধি গ্রহন করতেন এবং দীর্ঘ দিন নামের সাথে ব্যবহারের ফলে তা তাদের পরিচয় বহনে নামের অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়। একটি বিখ্যাত প্রবাদ, যা বাংলা ও উভয় ভারতে ব্যাপকভাবে পরিচিত এবং হাসিমুখে বলা হয়, যা ইসলামে বৈধ পদবীর সাথে সামাজিক মর্যাদাকে ফুটিয়ে তোলে:

'প্রথম বছর আমি ছিলাম শেখ, দ্বিতীয় বছর খান
ধানের দাম যদি কমে এই বছর, আমি হব সৈয়দ'।[৮২]

এভাবে আরবী নাম ও স্থানীয় উপাধি মিলে মুসলিম পরিচয় সমাজে বিকশিত হয়। যা ইসলামেও অনুমোদিত।

নামের শুরুতে মুহাম্মদ যুক্তকরণ

ইংরেজ শাসনামলে (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রী.) এ অঞ্চলে মুসলিমগণ দারুণভাবে নিষ্পেষিত হতে থাকে। হিন্দুগণ ইংরেজদের সাথে সখ্যতা তৈরি করে তাদের আনুগত্য করে একদিকে যেমনি নিজেরা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা নিতে থাকে, অপরদিকে নেপথ্যে থেকে ইংরেজদের মাধ্যমে এবং কখনো কখনো নিজেরাই মুসলিমদের উপর নানা ধরনের অত্যাচার চালাতে থাকে। এ ধারায় উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে এ অঞ্চলের মুসলিমদের উপর হিন্দুদের সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় তারা মুসলিমদেরকে তহবন্দের পরিবর্তে ধূতি পরা, সালামের পরিবর্তে আদাব-নমস্কার বলা, নামের আগে শ্রী ব্যবহার, মুসলমানী নাম রাখতে জমিদারের অনুমতি ও খারিজানা প্রদান, দাঁড়ির জন্য ট্যাক্স প্রদান, গরু জবাই করলে হাত কেটে নেয়া ইত্যাদি নানা ধরনের জুলুম-নির্যাতন মুসলিমদের উপর চালাতে থাকে। ফলে অনেক মুসলিম নামের পূর্বে শ্রী ব্যবহার করতে শুরু করে। যার প্রেক্ষিতে গড়ে উঠে ফরায়েজী আন্দোলন, তিতুমীরের আন্দোলন।[৮৩]

এ আন্দোলনের ফলে মুসলিমদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি হয়। ফলে অনেকে নামের পূর্বের শ্রী বর্জন করে, আবার অনেকে শ্রী এর পরিবর্তে মুহাম্মাদ ব্যবহার করতে শুরু করে। এভাবে নামের শুরুতে মুহাম্মাদ সংযুক্তি ইসলামের ধর্মীয় সংস্কৃতির রূপ ধারণ করে।

---

৮১. A.K. Nazmul Karim, *Changing Sciety in India and Pakistan: A study in social change and social stratification,* Dacca: Oxford University press, 1956, p. 132

৮২. রিচার্ড এম. ইটন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২

৮৩. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা,* ঢাকা : দারুস সালাম পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮, পৃ. ১০০-১০২

নামকরণে ইসলামী রূপের বিকৃতি ও অবলুপ্তির ধারা

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যায়ে যেখানে মুসলিমদের মধ্যে হিন্দুয়ানী নামের অস্তিত্বই পাওয়া যেত না, সেখানে বর্তমানে তা অনেকাংশেই অবলুপ্তির দিকে এগিয়ে চলছে। মুসলিমগণ আজ পাশ্চাত্য ও হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির আগ্রাসনে নিজেদের আত্মপরিচয় ভুলতে বসেছে। মুসলিমগণ হিন্দুদের নাম গ্রহণ করছে। কিন্তু কোন হিন্দু-খ্রীস্টান মুসলিমদের নাম গ্রহণ করেনি। বাংলাদেশের মুসলিমগণই প্রথম আগ্রহ সহকারে হিন্দু নাম গ্রহণ করেছে।[৮৪] বাংলাদেশের প্রয়াত একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক দুঃখ করে বলেছেন, একাল আর সেকাল, মাত্র ৪০/৫০ বছরের ব্যবধান। তখন মুসলমান মা-বাবারা সন্তানের নাম রাখতেন আল্লাহর নামের সাথে মিলিয়ে অথবা নবী-রাসূলের নামে বা ইসলামের ইতিহাসের সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রাত স্মরণীয় মনীষীদের নামানুসারে। এমন নাম তারা রাখতেন যে সব নামের মধ্যে ইসলামের সৌন্দর্য, গৌরব বা ঐতিহ্য সৃষ্টির সার্থক পরিস্ফুটন ঘটত। কিন্তু সে ধারা আজকাল প্রায়ই রক্ষা করা হচ্ছে না।[৮৫]

নিম্নে এ সম্পর্কিত কিছু দিক উল্লেখ করা হল-

মুহাম্মাদ নাম বর্জনের আহ্বান

যে হিন্দুয়ানী জুলুমের প্রতিবাদে মুসলিমদের নামে 'মুহাম্মাদ' শব্দের সংযুক্তি; বর্তমানে তাদেরই অনুজ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের ব্যানারে মুসলিমদের নামের মুহাম্মাদ শব্দ বর্জনের ডাক দেয়া হচ্ছে। ২০০০ সালের ৬ জুন শহীদ মিনার থেকে এ আহ্বানের সূচনা হয়।[৮৬] কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের এ আহ্বানে এদেশের মুসলিম নামধারী কিছু বুদ্ধিজীবীও একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। সাংবাদিক জহুরী তাদেরকে নিজেদের মুসলিম নাম পরিবর্তন করে তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী বাঙ্গালী হবার আহ্বান জানিয়েছেন।[৮৭] বর্তমানে এধারা আরো শক্তিশালী হচ্ছে এবং মুসলিমদের উপর ক্রমান্বয়ে প্রভাব বিস্তার করছে বলে মনে হয়।

মুহাম্মাদ শব্দের সংক্ষিপ্তকরণ

মুহাম্মাদ শব্দের বানান পূর্ণরূপে আমাদের দেশে সাধারণত দু'ভাবে লেখা হয় মুহাম্মদ ও মোহাম্মদ। কেউ 'ম' তে ওকার দিয়ে লেখেন, কেউ হ্রস্ব উকার দিয়ে লেখেন। দু' নিয়মেই চলছে। যদিও 'মু' দিয়ে লেখাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কিন্তু একশ্রেণির লোক 'মোঃ' সংক্ষিপ্তাকারে লেখেন। অথচ তারা তাদের নামের অন্যান্য শব্দ সংক্ষেপ করে লেখার চিন্তা করেন না। খণ্ডিত নাম অর্থহীন হয়ে পড়ে। 'মোঃ' এর কোন অর্থ নেই,

---

৮৪. জহুরী, *শব্দ সংস্কৃতির ছোবল*, ঢাকা : তাসনিয়া বই বিতান, ২০০০, পৃ. ৯
৮৫. জহুরী, *অপসংস্কৃতির বিভীষিকা*, ঢাকা : উতলু প্রকাশন, ১৯৯৯, খ. ১, পৃ. ৭৬
৮৬. আবুল আসাদ, *হিন্দু-মুসলিম মানষ*, ঢাকা : দি ইনডিপেন্‌ডেন্ট স্টাডি ফোরাম, ২০১৪, পৃ. ৮২
৮৭. জহুরী, *অপসংস্কৃতির বিভীষিকা*, ঢাকা : রিদোয়ান প্রাকশন, ২০০৩, খ. ৩, পৃ. ১০১

অর্থবোধক শুধু মোহাম্মদ শব্দ।[৮৮] আবার অনেকে মু., মোঃ, মোহাং ইংরেজীতে M., Md., Mohd ইত্যাদি লেখেন। এরূপ শব্দ একটি অর্থহীন শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব এটিকে সংক্ষিপ্তকরণ, এ শব্দটির প্রতি একধরণের অবজ্ঞা প্রদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নয়। যা নিঃসন্দেহে নবী সা. এর প্রতি বেয়াদবী ও গুনাহের কাজ।[৮৯]

মুহাম্মাদ, আহমাদ সহ আরবী নামের বিকৃত বানান

প্রচলিত মুহাম্মদ শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ মুহাম্মাদ হওয়া উচিত। বাংলা ভাষায় দীর্ঘ দিন মোহাম্মদও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তাই বলে তা মহামেদ হতে পারে না। ১৯৮৪ সালে মারা যাওয়া বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আবু মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহর উপর একটি দৈনিকে নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল- আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহঃ শ্রদ্ধাঞ্জলী। ভক্তের হাতে পড়ে মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ হয়ে গেলেন মহামেদ হাবীবুল্লাহ। তাও আবার মৃত্যুর পরে। এমনকি প্রবন্ধের ভিতরে যতবার তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে ততবারই মহামেদ উল্লেখ করা হয়েছে। এটি উদ্দেশ্যমূলক বানান বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়।[৯০]

আবার যত গণ্ডগোল নামের আহমাদ শব্দ নিয়ে। কেউ লেখেন আহমেদ, কেউ লেখেন আহামেদ, আবার কেউ লেখেন আহম্মেদ, আহাম্মদ, কিংবা আহাম্মেদ। অজ্ঞতার কারণে কেউ লিখলে তা শোধরানোর চেষ্টা করা দরকার। কিন্তু জেনে শুনে লিখলে তাকে বারণ করবে কে? আহমাদ 'ম'-এর সাথে আকার যুক্ত করে উচ্চারণই শুদ্ধ উচ্চারণ। তবে আহমদ উচ্চারণও দীর্ঘদিন শুদ্ধের কাছাকাছি হিসেবেই ধর্তব্য হচ্ছে। কিন্তু আহমেদ, আহম্মেদ, আহাম্মদ লেখার কোন অবকাশ নেই।[৯১]

ইংরেজী স্টাইলে মুসলিম নাম নূরুদ্দীন হয়ে যায় নূরেডীন। বিলেতের এ নূরেডিন পরে আর নূরুদ্দীন হতে পারে না। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ইবনে সীনা এবসীন ছিলেন। ভ্রান্ত বিকৃতির এভাবে বেড়াজাল সৃষ্টি করে খ্রীস্টানগণ আমাদের অনেক মুসলিম মনীষীদেরকে শত শত বছর আটকে রেখে মুসলিমদের পরিচিতির সূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে।[৯২] এক্ষেত্রে হিন্দুদের ষড়যন্ত্রও কম দায়ী নয়। তারা কখনো মুসলিম নেতাদের নাম, ইসলামী নাম শুদ্ধ করে লেখেন না। হিন্দু লেখকগণ সোহরাওয়ার্দিকে লেখেন সুরাবর্দী, জেনারেল ওসমানীকে লেখেন ওশমান, মুসলমান তাদের কাছে

---

৮৮. জহুরী, *অপসংস্কৃতির বিভীষিকা*, খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭

৮৯. মুহাম্মদ ইউসুফ লুধিয়ানাবী, *আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব*, মুহাম্মদ খলিলুর রহমান অনূদিত, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০১, খ. ১, পৃ. ৪৮

৯০. জহুরী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৫-৬৬

৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

৯২. জহুরী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১১

মুচলমান, ইসলাম হয়ে যায় এচলাম। কিন্তু মুসলিমদের মধ্যে যারা তাদের প্রিয় তাদের কঠিন নামও তারা বানানে ও উচ্চারণে কখনো ভুল করেন না।[৯৩] আবার অনেকে আছেন নামের রহমান শব্দকে বিকৃত বানানে রেহমান লেখেন। রহমান যেহেতু আল্লাহর নাম, তাই এ নামের বিকৃত বানান আইন করে হলেও বন্ধ করা উচিত।[৯৪] একইভাবে হুসাইন শব্দের বানান হোসেন লেখা হয় ভুলভাবে প্রায়ই। এসব থেকে প্রত্যেক মুসলিমই বিরত হওয়া প্রয়োজন।

নাম বিকৃতি

মুসলিম সমাজে আবার পুরো নামকে বিকৃত করেও উচ্চারণ করা হয়। এ ধরনের বিকৃত উচ্চারণকারীগণ তিন ধরনের। ১ম শ্রেণী: এরা সাধারণত অশিক্ষিত। এরা আদর করেও প্রিয় সন্তানের নাম চাঁন্দুমিয়া হলে তাকে চাঁন্দু, শামসুদ্দিনকে শামসু ডাকেন। অনেক সময় সংশোধনের কোন প্রচেষ্টায়ও তারা কর্ণপাত করেন না। ২য় শ্রেণী: এরা কম-বেশী লেখা পড়া জানেন। এদেরকে ভুল ধরিয়ে দিলে এরা সংশোধিত হন। ৩য় শ্রেণী: এরা শিক্ষিত বা উচ্চ শিক্ষিত। এরা ফ্যাশন বা আভিজাত্য হিসেবে বিকৃত উচ্চারণ করেন এবং লেখেন। এমনকি সংশোধনের উদ্যোগও তারা গ্রহণ করেন না। এরাই মুহামেদ, রেহমান, করিমকে ক্যারিম উচ্চারণ করেন ও লেখেন।[৯৫] তবে পূর্বোল্লেখিত আরবী তারখীম পদ্ধতিতে ১ম প্রকার বৈধ এবং এটি বিকৃতির আওতায় পড়বে না।

আরেক ধরণের বিকৃতি রয়েছে যারা সাধারণভাবে নামকে বিকৃত করেন। যেমন হাসানকে হাসান্যা বা হাসু বলা। আবার আল্লাহর দাসত্বসূচক নামগুলোকে আল্লাহর নামে ডাকাও মারাত্মক ধরণের বিকৃতি। আবদুর রহমান, আবদুর রায্যাক এরূপ নাম গুলোকে আব্দুল বাদ দিয়ে রহমান বা রায্যাক ইত্যাদি নামে ডাকা হয়। এ বিকৃতি মারাত্মক, কঠিন গুনাহ এবং অনেক ক্ষেত্রে ঈমানের পরিপন্থী।[৯৬] একইভাবে ফজলে রাব্বী, আশেক এলাহীকে, ফজলে ও আশেক বাদ দিয়ে রাব্বী, এলাহী ডাকাও ঈমান পরিপন্থী।

নামকরণের প্রক্রিয়া ও অনুষ্ঠান

নামকরণের ইসলাম স্বীকৃত অনুষ্ঠান হচ্ছে আকীকা। যা জন্মের সপ্তম দিনে করা সুন্নাহ্। কিছু মুসলিম পরিবারে সুন্নাহ্ সম্মতভাবেই তা পালিত হয়। কিন্তু অনেক মুসলিম পরিবারেই তা সঠিকভাবে পালিত হয় না। প্রাচীন বাঙ্গালী মুসলিম সমাজে জন্মের দিন আনন্দ উল্লাস করা হত। মুগল আমলে মীর্জা নাথানের পুত্র সন্তনের জন্ম

---

৯৩. জহুরী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৮-৬৯

৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৬৫

৯৬. ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *খুতবাতুল ইসলাম*, ঝিনাইদহ : আস্ সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৮, পৃ. ২১৬

উপলক্ষ্যে এরূপ রাত্রি ব্যাপী অনুষ্ঠান হয়েছে। হাতির লড়াই, নৃত্যগীত অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন। ইতালীয় পর্যটক মানুচি উল্লেখ করেছেন, সন্তান জন্মের পর থেকে ছয় সাত দিন উৎসব হত। এটিকে উৎসব ছট্টি (ষষ্ঠ দিবসের কৃত্য) নামে অভিহিত করা হত।[৯৭] এভাবে মুসলিমদের মাঝে বিকৃত উৎসবের ধারা তৈরি হয়। আবার কোথাও নামকরণের দিন হিসেবে জন্মের একাদশ বা দ্বাদশ দিনকে পালন করা হয়। এটি হিন্দুদের অনুশীলিত একটি রীতি। যা হিন্দু শাস্ত্র মনুর মতে এ কাজের প্রশস্ত সময়।[৯৮]

তবে বর্তমানে বাংলাদেশে সপ্তম দিনে নামকরণের পরিবর্তে চল্লিশতম দিনেও নামকরণ করা হচ্ছে এবং অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে শরী'আহ্র অনুমোদনহীন অনেক কাজও অনুশীলিত হচ্ছে।[৯৯] আবার নামকরণের প্রক্রিয়ায় মুসলিমদের মধ্যে একটি প্রক্রিয়া এমনও অনুশীলিত হয় যে, একজন মৌলভী ডাকা হবে। তিনি পুস্তক বন্ধ করে সুচ বা কাঁটা পুস্তকের পাতার মধ্যে ঢুকাবেন। তারপর সুচবিদ্ধ জায়গাটা খোলা হবে এবং সে পাতার প্রথম অক্ষরটি তিনি গ্রহণ করবেন ও এর অর্থানুসারে শিশুর নামকরণ করবেন।[১০০] অথচ ইসলামে এরূপ পদ্ধতি গ্রহণের কোন বিষয় বর্ণিত হয়নি। এটি বিদ্আত ও পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাংলা ভাষায় নামকরণ

সাধারণত ইসলামের নির্দেশনা হচ্ছে নামের ভাষা হবে আরবী। সারা পৃথিবীতে এটি অনুশীলিত রীতি। আমাদের দেশে অনেকে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষায় নামকরণের কথা বলে থাকেন। বাঙ্গালী মুসলিমের নাম বাংলা ভাষায় হওয়ার ব্যাপারে প্রখ্যাত ভাষাবিদ সুধী ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মত প্রকাশ করলে তার সমকালীন বাংলা ও উর্দু ভাষাবিদ, সাহিত্যিক হেকিম হাবিবুর রহমান তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছিলেন। একই অনুষ্ঠানে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহকে হেকিম হাবিবুর রহমান 'কবিরাজ বলি নারায়ণ' বলে কয়েকবার সম্বোধন করলে তিনি হতচকিত হয়ে যান। পরে কথোপকোথনে হেকিম হাবিবুর রহমান এর ব্যাখ্যায় বলেন, তার মতে ডক্টর শব্দের বাংলা অর্থ কবিরাজ, শহীদ শব্দের অর্থ বলি, আল্লাহ্ শব্দের অর্থ নারায়ণ। অতএব ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর উচিৎ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে এফিডেবিট করে নিজের নাম বাংলা করে এ দর্শন বাস্তবায়নে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করা। তার এ জবাবে ড.

---

৯৭. ড. এম.এ. রহীম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৮, পৃ. ২০৭

৯৮. *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪১৯

৯৯. ড. শেখ মোঃ ইউসুফ, *বাংলাদেশের মুসলিম সংস্কৃতি*, ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন, ২০০১, পৃ. ৬৪

১০০. ড. এম. এ. রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এ মত পরিত্যাগ করেন।[১০১] এভাবে বাংলা অর্থ করলে আবদুল্লাহর অর্থ হবে ভগবান দাস, শহীদুল্লাহর অর্থ করলে হবে বলি নারায়ণ। তাহলে আমরা কি এরূপ বাংলা শব্দে নামকরণ করব? (নাউযুবিল্লাহ)

দীর্ঘ নামের ধারা

বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকের নাম বহু শব্দে প্রণীত। দু'শব্দে বা এক শব্দে ইসলামী নাম হতে পারে। কারণ শব্দের এ দীর্ঘ নামের ঐতিহ্য আমরা পেয়েছি মূলত আরবদের থেকে। আরব দেশে সাত, আট বা ততোধিক শব্দে এক ব্যক্তির নাম হয়। প্রথম এক বা দুই শব্দ ব্যক্তিটির নাম, তার পরের শব্দগুলো হলো তার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ বা বংশের নাম। আরবদের দীর্ঘ নাম দেখে বাঙ্গালী মুসলিমদেরও সখ হল কয়েক শব্দে নাম রাখার। আরবী না জানা এবং আরব ঐতিহ্যের সাথে পরিচয় না থাকার কারণে মুসলিমগণ তাদের নাম দীর্ঘ করল আরদের লম্বা নামের তাৎপর্য উপলব্ধি ছাড়াই।[১০২] মূলত নাম হবে এক বা দু'শব্দে। এজন্য মুহাম্মদ সা. ও তাঁর সাহাবী আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী রা. সহ প্রায় সকল সাহাবীর নাম এক বা দুই শব্দেই নামকরণ করা হয়েছে। আবার অনেকে এরূপ লম্বা নাম সংক্ষেপে লেখেন। যেমন এ.কে.এম.এইচ.এম.ভি. রহমত উল্লাহ চৌধুরী (টুকু মিয়া)। কেন এরূপ লম্বা নাম? যা উচ্চারণ করাও যায় না, আবার লেখতে গেলেও কয়েক ডজন অক্ষর লাগে।[১০৩] হালকা পাতলা ও সহজে উচ্চারণ করা যায় এরূপ নাম রাখাই উচিত।

একাধিক নামকরণ

আমাদের সমাজে সাধারণত একজনের দু'টি নাম থাকে। একটি ডাক নাম এবং অপরটি আসল নাম। আজকাল অনেকে আসল নামের সাথে ডাক নামও জুড়ে দিয়েছেন। কোন কোন মুসলিম ছেলে-মেয়ের ডাক নাম শুনে শত দুঃখের মাঝেও হাসি পায়। যেমন ঝাড়ু, ঝাড়ন, পঁচা, ভেটকু, মাখন, চিনি, ক্ষুদ, জগা, মগা, কলা, ধলা, পেছন, বচন, রচন, চাঁদ, সুরুজ ইত্যাদি। আমেরিকার এ্যাপলো আর রাশিয়ান লুনাও বাদ যাচ্ছে না। উদ্ভিদ জগত, প্রাণী জগত, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, মাঠ-ঘাট, অলি-গলি অর্থাৎ যা স্মরণে আসছে তাই নাম রাখা হচ্ছে।[১০৪]

আমার মনে হয় একটি আসল নাম, একটি ডাক নাম এ দু'টো নামের ধারা এদেশে মুসলিমদের মধ্যে এসেছে হিন্দুদের ধারা থেকে। হিন্দু শাস্ত্র মতে শিশুর দু'টি নামের

---

১০১. এ. জেড. এম. শামসুল আলম, *বাঙ্গালী সংস্কৃতি*, ঢাকা : মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০৮, পৃ. ১৩০-১৩১

১০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-১২৭

১০৩. জহুরী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৬

১০৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৩-৭৪

বিধান আছে। একটি প্রকাশ্য, অপরটি গুপ্ত, শুধু পিতা-মাতার জ্ঞাতব্য।[১০৫] যার ফলে আমাদের দেশে ডাক নামে ডাকা হয়, এটি হয় প্রকাশ্য। আর আসল নাম পরিবারের লোকেরা জানেন অথবা শিক্ষা ক্ষেত্রে সদনপত্রে বা নিবন্ধন পত্রে লিখা থাকে। তবে উপনাম (কুনিয়্যাত) বা উপাধি হিসেবে শরী'আহ্সম্মত একাধিক নামও অনেকে গ্রহণ করে থাকেন। এতে কোন অসুবিধা নেই।

ভিনদেশী ও হিন্দুয়ানী নামকরণ

আমাদের সমাজে মুসলিমদের মাধ্যে দু'ধরনের লোক রয়েছে যারা ভিনদেশী ও হিন্দুয়ানী নামের চর্চা করেন। একদল শহুরে মুসলিম সমাজের টপ সোসাইটি বলে তারা পরিচিত। বিদেশী নামের প্রতি তাদের মোহ্ অত্যাধিক। যেমন- লিলি, রোজী, ডেইজী, মিন্টু, রিন্টু, সেন্টু, জন্টু, চম্পা, পপি, বিউটি, লাভলী, এলবার্ট, এলবাম, এডোয়ার্ড, চার্লি, লেলিন, স্টালিন, রুশো ইত্যাদি। গরিবের মধ্যেও কেউ ভদ্রলোক সাজার প্রবণতায় বাচ্চাদের এন্সী, ফেন্সী, ডেন্সী রেখে সমাজের বড় লোকদের কাতারে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। আবার অন্য দলের মধ্যে অতিমাত্রায় স্বদেশী হওয়ার বাতিক সৃষ্টি হয়েছে। তাদের রাখা নাম শুনলে বুঝার মাধ্যম নেই যে, তারা মুসলিম না হিন্দু সন্তান। যেমন- স্বাধীন, বিন্দু, সিন্ধু, তরঙ্গ, পদ্মা, বিপ্লব, বিপুল, সৌরভ, গৌরব ইত্যাদি। অপর দিকে অন্য আরেক ধারা রয়েছে যারা বাংলা আর আরবী মিশ্রিত করে জগাখিচুড়ী এক ধরনের নাম রখেন। যেমন- কৌশিক আহমদ, অনীক ইসলাম, অম্লান দেওয়ান, পার্থ আহমেদ, সুহৃদ ইসলাম, শুভ রহমান, ঋষি উল্যাহ্, হেনরী আমীন, সুমন হোসেন, সাজু আক্তার, শিখা আখতার ইত্যাদি। অনেকে আবার এরূপ নাম দেখে মনে করেন ওরা বোধ হয় নও মুসলিম। কিন্তু আসলে তা নয় বরং এরা মুসলিম পিতামাতার সন্তান।[১০৬] আবার হিন্দুদের দেব-দেবী, দূর্গা, লক্ষ্মী, স্বরস্বতী ইত্যাদির নামেও মুসলিম সন্তাদের নাম রাখা হচ্ছে। কেউ কেউ আবার রাখছেন এমন শব্দে যার কোন অর্থ নেই। যেমন- দু'পুত্রের নাম রাখা হয়েছে তন্ময় ও উন্ময়। উন্ময়ের অর্থ সন্তানের বাবাও হয়তো জানেন না।[১০৭]

নাম ধরে ডাকা

ইসলামে নাম ধরে ডাকতে নিষেধ নেই। তবে পিতা-মাতা, বড়দের সম্মান নষ্ট হয় এরূপ সম্বোধন ইসলামে নিষিদ্ধ। বর্তমান বাংলাদেশের সমাজে বহু স্ত্রী তার স্বামীকে আপনি করেই সম্বোধন করেন। তবে এ ধারা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। এখন অনেক স্ত্রী তার স্বামীকে নাম ধরে বাসার চাকর-বাকরের মত ডাকেন। শিশু সন্তানরা

---

১০৫. *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪১৯

১০৬. জহুরী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৪-৭৫

১০৭. এ.জেড.এম. শামসুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১-১৩২; জহুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

পিতা-মাতাকে তুমি সম্বোধন করেন। এছাড়া ব্যক্তি ব্যক্তিকে পারস্পরিক নাম ধরে ডাকার মধ্যেও একটি শিষ্টাচারিতা রয়েছে। কোন সম্মানিত ব্যক্তির উপস্থিতিতে তাকে স্যার স্যার বলে সম্মান দেখানো হচ্ছে অপর দিকে তার অনুপস্থিতিতে যেনতেন ভাবে তার নাম ধরে তার সম্পর্কে বলা হচ্ছে। আবার আজকাল এক ধরনের নাম ধরে ডাকার শিষ্টাচার চালু করেছে বিবিসি। যা তারা তাদের প্রতিনিধির সাথে কথা বলার সময় বলে থাকে। যেমন- বলুনতো আনিস, ঢাকায় কেমন হরতাল দেখলেন ইত্যাদি। বলুনতো, দেখলেন ইত্যাদি শব্দে যথেষ্ট শিষ্টাচারিতা থাকলেও কিন্তু সম্বোধনে না আছে মি., না আছে জনাব।[১০৮] এভাবে সম্মানহীন এক ধরনের নাম ধরে ডাকার সংস্কৃতি আমাদের সমাজে চালু হচ্ছে।

এসব বিকৃত অনুশীলনের কারণ

নামকরণ ও নাম ধরে ডাকার ইসলামী রীতির অনেকাংশে বিকৃত অনুশীলন আজ মুসলিমদের মধ্যে চালু হয়েছে। এর কারণ অনুসন্ধান করলে যে বিষয়গুলো ফুটে উঠে সেগুলো হলো,

ক. অজ্ঞতা

আমাদের মুসলিম সমাজের অনেকে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সাদৃশ্যের ভয়াবহতা সম্পর্কে অজ্ঞ। এছাড়া অনেকে সন্তানের নামকরণের ইসলামী নীতি সম্পর্কেও অজ্ঞ। ফলে তারা নানা বিকৃত ধারা চর্চা করছে। যার স্পষ্ট উদাহারণ হচ্ছে- আমাদের সমাজে একদল মুসলিম পবিত্র কুরআনে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এতটুকু বুঝেই আবেগে সন্তানের নাম রাখা শুরু করেছেন। অথচ শব্দটির অর্থ খুবই খারাপ। যেমন, তুকায্যিবান (মিথ্যাচারিতা), খিনজীর (শুকর), জাহান্নাম (নরক), আযাবুন আলীম (যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি) ইত্যাদি। এটি অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়।[১০৯] এছাড়া সমাজে মফিজ, আবুল বলে একে অপরকে গালি দেয়। অথচ এটি ইসলামী নামের অংশ। এটিও অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ।

অমুসলিমদের ষড়যন্ত্র

অমুসলিম লেখক, সাহিত্যিকগণ কর্তৃক মুসলিম নামের বিকৃতি ও মুসলিম নামকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রবণতাও মুসলিমদেরকে এ ধরনের বর্জনে প্রলুব্ধ করেছে। যেমন- কলকাতা থেকে ছাপানো বাংলা কবিতার বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে,

> "র-তে রাম রাম, রমণ ও স্বপন স্কুলে যায়।
> রহিম, করিম ও বকর চুরি করে আম খায়।"

---

১০৮. জহুরী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৬ ও ১২৪

১০৯. মো. আতাউর রহমান আতহারী, *ইসলামী সংস্কৃতির ধারা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, অপ্রকাশিত এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ২০০৪, পৃ. ১৩২

এবং এ পাঠ্যটি সচিত্র। যেখানে রাম, রমন ও স্বপন নামের হিন্দু বাচ্চাদেরকে স্কুলে গিয়ে মানুষ হচ্ছে আর রহিম, করিম ও বকর টুপিওয়ালা মুসলিম সন্তানরা স্কুলে না গিয়ে আম চুরি করছে, এভাবে চিত্রিত করা হয়েছে।[১১০] এছাড়া হিন্দু লেখকগণ কর্তৃক বিকৃত বানান অনুশীলনের রীতি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

অপসাংস্কৃতিক মিডিয়া আগ্রাসন

আজকের প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, ওয়েব মিডিয়া প্রভৃতিতে মুসলিম নামসমূহকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে হেয় করা হচ্ছে। অপরদিকে সূর্য, তূর্য, কান্তা, জ্যোতি, নির্মল প্রভৃতি নামসমূহকে খুব কদর করা হচ্ছে। অভিনয়, উপস্থাপনা, সংবাদ পাঠ প্রভৃতির ক্ষেত্রে এ নামসমূহ অভিজাত হিসেবে গণ্য হচ্ছে।[১১১] ফলে সমাজে এসব নামের এক ধরনের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হচ্ছে আর মুসলিমগণ এরূপ নাম রাখতে উৎসাহিত হচ্ছে।

স্বীয় আত্মপরিচয়ের শৈথিল্য

মুসলিমগণ তার আদর্শিক পরিচয়ের মাধ্যমে পৃথিবীতে স্বতন্ত্রভাবে পরিচিত হবে। আর নামের মাধ্যমেও যে আলাদা স্বাতন্ত্র্যবোধ, ভিন্নতা, আলাদা সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার প্রকাশ ঘটে তা মুসলিমদের অনেকেই বুঝছে না। সারা পৃথিবীতে মুসলিমগণ সূচনালগ্ন থেকে একই ধরনের নামের মাধ্যমে স্বতন্ত্রভাবে পরিচিত। যেমন ইন্দোনেশিয়ার বাহাশাভাষী প্রেসিডেন্ট আবদুর রাহমান ওয়াহীদ, মালেভাষী মালয়েশিয়ার প্রেসিডেন্ট মাহাথির মুহাম্মদ, দিবেহীভাষী মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল কাইয়ুম, তাঞ্জানিয়ার সোয়াহিলি ভাষী আলী হাসান মাভেনী এর প্রকৃষ্ট উদাহারণ।[১১২] কিন্তু স্বতন্ত্র এ আত্মপরিচয়ের অনুভূতিতে শিথিলতা প্রদর্শিত হচ্ছে।

ঔপনিবেশিক গোলামী

ইংরেজদের দীর্ঘ ২০০ বছরের শাসনে মুসলিমরা তাদের স্বর্ণযুগের আলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে এক ধরণের মুক্তবুদ্ধি চর্চার ধারা তৈরী হয়েছে। যারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়েছে। উইলিয়াম হান্টারের ভাষায়, "ব্রিটিশ শাসনে তারা সব ব্যাপারেই জাতি হিসাবে ধ্বংস হয়ে গেছে।[১১৩] ফলে বাঙালী মুসলিমদের যে হীনমন্যতাবোধ এবং গোলামী স্বভাব জন্মলাভ করেছিল পাকিস্তানের ২৪ বছরে তা কাটেনি, বাংলাদেশের ২৭

---

১১০. মুহাম্মদ ইমদাদুল্লাহ, *সাংস্কৃতিক আগ্রাসন : মুসলমানদের নামের মধ্যে,* ঢাকা : মদিনা পাবলিকেশন্স, ২০০২, পৃ. ৩৬

১১১. মোঃ আতাউর রহমান আতহারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

১১২. মুহাম্মদ ইমদাদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

১১৩. ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার, *দি ইনডিয়ান মুসলমান,* এম. আনিসুজ্জামান অনূদিত, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০২, পৃ.১৩১

বছরেও তেমনি তাকে জিইয়ে রাখা হয়েছে। ফলে আমরা আমাদের স্বর্ণোজ্জ্বল অতীতের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি।[১১৪]

অতি আধুনিক ও অতি বাঙ্গালী হওয়ার প্রবণতা

আবার এদেশের মুসলিমদের মধ্যে বিশেষ করে শহুরে মুসলিমদের মধ্যে দু'ধরনের অনুকরণ প্রবণতা লক্ষণীয়। একদল আধুনিক পাশ্চাত্যের ধারায় নিজেদেরকে গড়ে তোলার প্রয়াসে ইংরেজী শব্দে নামকরণের প্রতি খুবই আগ্রহী। অন্যদল নিজেদেরকে প্রকৃত বাঙ্গালী প্রমাণ করার জন্য বাঙ্গালী সংস্কৃতির নামে হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি অতি আগ্রহী হয়ে বাংলা শব্দে হিন্দুদের নামের মত নিজেদের নামকরণ করে থাকেন।

হিন্দুয়ানী প্রভাব

এদেশে মুসলিমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মাবলম্বী থেকেই মুসলিম হয়েছে। ফলে ইসলামী বিশ্বাস বোধের পরও তারা দীর্ঘদিনের অনুশীলিত রেওয়াজ-রুসুম ছাড়তে পারেনি। অথবা ছেড়ে দিলেও পরবর্তীতে আবার সেগুলো তাদের মাঝে অনুপ্রবেশ করেছে। যেমন- মুসলিম পিতা-মাতা সন্তানদের আদর করে বলে বাবু। অথচ এ বাবু শব্দটি আবহমান কাল থেকে হিন্দু সত্তার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত একটি শব্দ। তবুও বাবু শব্দটি মহাপছন্দের বলে জাতীয়রূপ পরিগ্রহ করেছে।[১১৫]

এসব অনৈসলামিক ও বিকৃত অনুশীলনের রীতি থেকে উত্তরণের উপায়

উল্লিখিত বিকৃত, ভুল ও শরী'আহ্ বিরুদ্ধ বিভিন্ন দিক, যা মুসলিমরা তাদের সন্তানদের নামকরণ ও সম্বোধনে অনুশীলন করছে তা থেকে মুসলিমদের উদ্ধার করা খুবই জরুরী। এ ধারা চলতে থাকলে এক সময় মুসলিমদের স্বতন্ত্র জাতি সত্তাই বিলুপ্ত হবে। এজন্য নিম্নলিখিত দিক সমূহ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে-

- মুসলিম পিতা-মাতা ও সন্তানদের ইসলামী ধারায় নামকরণের গুরুত্ব ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা।
- শিক্ষা ব্যবস্থায় এ ধরণের বিষয় পাঠের অন্তর্ভুক্ত করে স্বীয় জাতির স্বাতন্ত্র্যবোধ সম্পর্কে মুসলিমদের জাগ্রত করা।
- মুসলিমদের পারস্পরিক সাক্ষাতে দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে সবাইকে সচেতন করা।
- সচেতন মুসলিমদের আলাদা মিডিয়া গড়ে তোলা এবং প্রতিষ্ঠিত মিডিয়াসমূহে যথাসম্ভব মুসলিম জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্য চেতনা তুলে ধরা।

---

[১১৪]. আরিফুল হক, *সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও প্রতিরোধ*, ঢাকা : দেশজ প্রকাশন, ২০০০, পৃ. ৭৪

[১১৫]. মোঃ আতাউর রহমান আতহারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

- শিক্ষিত আলেম-ওলামাদের এ ব্যাপারে ওয়াজ-নসিহত ও বই-পত্র লেখার প্রচেষ্টা চালনো।
- রাষ্ট্রীয়ভাবে জন্ম নিবন্ধন ও নাম নিবন্ধনের সময় মুসলিমদের জন্য স্বীয় আত্ম-পরিচয় বহনকারী শরী'আহ্সম্মত নামের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক সরকারী রেজিস্ট্রেশন তথা পি.এস.সি. রেজিস্ট্রেশনে শুদ্ধ করে এমনকি সংশোধন করে নাম রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা।

উপসংহার

ইসলাম নামকরণের যে পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা দিয়েছে তা অনুশীলন না করে মুসলিমগণ অত্যাধুনিক অথবা অতি বাঙ্গালী সাজতে গিয়ে নিজেদের জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্যবোধ আজ বিসর্জন করছে। কোন জাতি ধ্বংস হওয়ার জন্য তার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ হারিয়ে ফেলাই যথেষ্ট। বাংলাদেশের মুসলিমগণ সম্ভবত এক্ষেত্রে বেশি ধাবমান। অথচ এদেশেই মুসলিমদের পূর্ব পুরুষগণ ইসলাম প্রচার ও প্রসারে যেমনি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তেমনি ইংরেজদের গোলামী থেকে মুসলিমদের উদ্ধারে এক অবিস্মরণীয় আত্মত্যাগের নজরানা পেশ করেছেন। যা সকল মুসলিমের জন্য অনুপ্রেরণা ও অনুসরণের পাথেয়। বাংলাদেশের মুসলিমরা সে হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারে এগিয়ে যাবে, নিজেদের প্রকৃত মুসলিম পরিচয়ের মাধ্যমে স্বীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রতিষ্ঠা করবে, ব্যক্তির নামের মধ্য দিয়েই প্রাথমিকভাবে যা ফুটে উঠবে, যে পরিচয় একজন মুসলিমের জন্য আত্মতৃপ্তির। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾

তার কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হতে পারে, যে লোকদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করে ও সৎ আমল করে এবং ঘোষণা করে (নিজের পরিচয়) নিশ্চয়ই আমি মুসলিমদের অন্তর্গত।[১১৬]

---

১১৬. আল কুরআন, ৪১ : ৩৩

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১, সংখ্যা : ৪৩
জুলাই - সেপ্টেম্বর : ২০১৫

রাজনীতি : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

হাবীবুল্লাহ মুহাম্মাদ ইকবাল *

[**সারসংক্ষেপ** : *রাজনীতি মানব জীবনের সবচেয়ে বড় প্রভাব বিস্তারকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এর উপর নির্ভর করে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। রাজনীতি একজন মানুষের চলন-বলন, মানসিকতা, সাহসিকতা, মানবিকতাসহ নানান দিককে নিয়ন্ত্রণ করে। রাজনীতি পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে প্রভাবিত করে। বর্তমান বিশ্ব যেন রাজনীতি ছাড়া অচল। ইসলাম এমন একটি জীবন বিধান, যা মানব জীবনের সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে। কিসে তার কল্যাণ আর কিসে অকল্যাণ তাও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছে। রাজনীতি যেহেতু মানব জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাই ইসলামও এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে। যা আমাদের জীবনের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে রাজনীতির সংজ্ঞা, ইসলামের সাথে রাজনীতির সম্পর্ক এবং ইসলামে রাজনীতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।*]

ভূমিকা

বর্তমান যুগে সভ্য জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কোন না কোন রাষ্ট্রীয় সীমার মধ্যে বসবাস করতে হয়। প্রতিটি মানুষের আকাঙ্ক্ষা থাকে শান্তি, নিরাপত্তা ও সম্মানের সাথে বসবাস করার। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনায় সঠিক নেতৃত্ব ও কল্যাণজনক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অকল্যাণ ও বিশৃঙ্খলা বিরাজমান। কোন রাষ্ট্রকে নেতৃত্ব দেয়ার মাধ্যম হলো রাজনীতি। সেই রাজনীতি যদি ইসলামের আলোকে হয়, তাহলেই সত্যিকার কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব। মানব জীবনের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে রাজনীতির প্রভাব ব্যাপক। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

রাজনীতি বলতে কী বুঝায়?

বর্তমান পৃথিবীতে সর্বাধিক চর্চিত বিষয়াবলির মধ্যে অন্যতম হলো রাজনীতি। রাজনীতি শব্দের অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রশাসন বা পরিচালনার নীতি।[১] রাজনীতি বুঝাতে ইংরেজিতে Politics (পলিটিক্স) শব্দটি বহুল ব্যবহৃত হলেও তত্ত্বগতভাবে শব্দ দু'টি

---

* প্রভাষক, ছেনার্ক, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, ঢাকা ক্যাম্পাস।

১. সম্পাদনা পরিষদ, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১০ খ্রি., পৃ. ১০২৭

দ্বারা মূলত একই বিষয় বুঝায় না। আরবীতে রাজনীতি বুঝাতে سياسة (সিয়াসাহ) শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সিয়াসাহ শব্দটি আরবী سوس শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো আত-তাদবীর (التدبير) বা পরিচালনা করা, আল-ইসলাহ (الاصلاح) বা সংশোধন করা এবং আত-তারবিয়াহ (التربية) বা প্রতিপালন করা।[২] আভিধানিক অর্থে রাজনীতি বলতে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি সংক্রান্ত মতামতকে বুঝায়। যদিও অনেকেই রাজার নীতি থেকে রাজনীতি শব্দের উৎপত্তি বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ রাষ্ট্র (বা রাজ্য) পরিচালনা সম্পর্কে রাজার নীতি কীরূপ হওয়া উচিৎ সে সম্পর্কীয় মতামতকে রাজনীতি বলে।

আরবী অভিধানবিদগণ রাজনীতির (সিয়াসাহ) সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যা লিখেছেন তার সারমর্ম হলো, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করাকে রাজনীতি বলা যেতে পারে।[৩]

আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ (ইসলামী ফিক্হ বিশ্বকোষ)-এ সিয়াসাহ্-এর সংজ্ঞায় লেখা হয়েছে,[৪]

> هي استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل ، وتدبير أمورهم
> রাজনীতি হলো সৃষ্টিকে ইহকাল ও পরকালে মুক্তির পথনির্দেশ দান এবং তাদের কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে তাদের কল্যাণসাধন।

সুলাইমান আল-বুজাইরিমী [১৭১৯-১৮০৬ খ্রি.] প্রদত্ত সংজ্ঞা হলো,

> السياسة : إصلاح أمور الرعية ، وتدبير أمورهم
> রাজনীতি হলো জনগণের কর্মকাণ্ডকে সংশোধন ও পরিচালনা করা।[৫]

"রাজনীতিকোষ" গ্রন্থে রাজনীতির সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে,

> প্রচলিত অর্থে রাজনীতি হল রাষ্ট্র ও তার নাগরিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক, দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কিত বিষয়াদি।[৬]

---

২. *আস-সিহাহ, আল-কামূসুল মুহীত, তাজুল আরূস, লিসানুল আরব, আল-মিসবাহ, আল-মাগরিব, আসাসুল বালাগাহ, আন-নিহায়াহ, আল-মুজামুল ওয়াসীত* সহ প্রায় সকল নির্ভরযোগ্য আরবী অভিধানে এ অর্থগুলো লেখা হয়েছে। দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শু'উনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৪ হি.-১৪২৭ হি., খ. ২৫, পৃ. ২৯৪

৩. আবুল ফাতাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া, *আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইসলাম*, ঢাকা : বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ৬০৩

৪. সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২৫, পৃ. ২৯৫

৫. প্রাগুক্ত, খ. ২৫, পৃ. ২৯৫

৬. হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১১ খ্রি., পৃ. ৩৪১

হ্যারল্ড ল্যাসওয়েলের মতে, “Politics as being concerned with who gets what when and how.”[7]

বিখ্যাত দার্শনিক এরিষ্টটল বলেন, “উৎকৃষ্ট জীবন লাভের জন্য কোন সমাজের সংগ্রামের নামই রাজনীতি।” [৮]

রবার্ট ডল রাজনীতির একটি সুন্দর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন,

> Politics means any persistent pattern of human relationships that involves to asignificant extent, power, rule authority.[9]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (৬৯১-৭৫১ হি.) রাজনীতির বিষয়ে বলেন,

> এমন একটি বিধি-ব্যবস্থা যা রীতিনীতি কল্যাণকর কার্য এবং সামগ্রিক অবস্থার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করার জন্য বিধিবদ্ধ হয়েছে।[১০]

উল্লিখিত উক্তিসমূহ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, যে নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় এবং তার জনগণের সার্বিক অধিকার নিশ্চিত হয় তার নাম রাজনীতি।

পূর্ববর্তী মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাজনীতিকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন, ইমাম আবুল হাসান আল-মাওয়ারদী (৩৬৪-৪৫০ হি.) ও কাযী আবূ ইয়া'লা (৩৮০-৪৫৮ হি.) “আল-আহকাম আস-সুলতানিয়াহ”, ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি.) “আস-সিয়াসাহ আশ-শারঈয়্যাহ”, কাযী আবুল বাকা (৬৬১-৭২৮ হি.) “আস-সিয়াসাহ্ আল-মাদানিয়্যাহ” নামে রাজনীতিকে তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ইসলামের সাথে রাজনীতির সম্পর্ক

ইসলাম আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান । এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ ﴾

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র জীবন বিধান হচ্ছে ইসলাম।[১১]

---

৭. হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল, Politics : Who gets what, when, how, ক্লিভল্যান্ড ওয়ার্ল্ড পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৫৮ ইং

৮. অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশীদ, *নবীদের রাজনীতি*, ঢাকা : মুনীরা প্রকাশনী, ২০০২ ইং, পৃ. ৪৫

৯. রবার্ট ডল, Modern political analysis, ঈগল উড ক্লীফস, এন জে, প্রেনটিস হল, ১৯৭০ ইং, পৃ. ৬

১০. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৫২ ইং, পৃ. ৩৮

১১. আল কুরআন, ৩ : ১৯

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মাজীদেও মানব জীবনের সকল দিক অর্থাৎ রাজনীতি, অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতিসহ সকল বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾

আমি তোমার নিকট কিতাবটি নাযিল করেছি। এটি এমন যে, তা সবকিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, আর এটা হিদায়ত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ স্বরূপ।[১২]

ইসলাম কেবল কয়েকটি বিক্ষিপ্ত মতবাদ, চিন্তা এবং একাধিক কর্মনীতির সমষ্টি বা সমন্বয় নয়।[১৩] এটি একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। সেজন্য ইসলাম ছাড়া অন্য কোন আদর্শকে গ্রহণ করার কোন সুযোগ নেই। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন চায়, তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[১৪]

যুগে যুগে নবী রাসূলগণ মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবনসহ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য দাওয়াতী মিশন চালিয়েছেন এবং জিহাদ করেছেন। নবীগণ কায়েমী সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের সর্বাত্মক সংগ্রাম করেছেন।[১৫] তারা যুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন, মানুষের অধিকার আদায়ের কথা বলেছেন। তারা কীভাবে মানুষের কল্যাণ হতে পারে, কীভাবে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে, কীভাবে মানুষ উন্নত জীবন-যাপন করতে পারে, তার জন্য বিভিন্ন প্রোগ্রাম নিয়ে মানুষের নিকট উপস্থিত হয়েছেন। আল্লাহর নবীগণ যেমনিভাবে মানুষকে নৈতিকভাবে সংশোধন করেছেন, তেমনিভাবে তাদেরকে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার প্রশিক্ষণও দিয়েছেন। আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন,

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ

বনী ইসরাঈলের নবীগণ তাদের নেতৃত্ব দিতেন। একজন নবীর মৃত্যুর পর অপরজন তার স্থলাভিষিক্ত হতেন।[১৬]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী রহ. বলেন,

(تَسُوسهُمْ الْأَنْبِيَاء) أَيْ : يَتَوَلَّوْنَ أُمُورهمْ كَمَا تَفْعَل الْأُمَرَاء وَالْوُلَاة بِالرَّعِيَّةِ ,
وَالسِّيَاسَة : الْقِيَام عَلَى الشَّيْء بِمَا يُصْلِحهُ "

---

১২. আল কুরআন, ১৬ : ৮৯

১৩. সাইয়েদ আবুল আলা, *ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৫ ইং, পৃ. ৭

১৪. আল কুরআন, ৩ : ৮৫

১৫. অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

১৬. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, কায়রো : দারুশ শা'ব, হাদীস নং ৩৪৫৫

তারা তাদের জাতি বনী ইসরাঈলের কার্যাদি পরিচালনা করতেন, যেমন রাষ্ট্রপ্রধান ও গভর্নরগণ তাদের প্রজাদের কার্যাদি পরিচালনা করে থাকেন। আর সিয়াসাহ অর্থ হলো কোন কাজ সুচারুরূপে পালন করা।[১৭]

আর আমাদের প্রিয় নবী স.ও রাজনীতিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান ইসলামকে প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছেন। শুধু তাই নয় তিনি ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে[১৮] প্রতিষ্ঠা করে ইসলামী রাজনীতির সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾

তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীন সহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে সকল দীনের উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা অপছন্দ করে।[১৯]

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, নবী-রাসূলগণ মানুষকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মানুষের দাসত্ব থেকে আল্লাহর দাসত্বে নিয়ে আসার জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, সেটিকে নবীদের রাজনীতি বলা হয়। মূলত এটিই ইসলামী রাজনীতি।

ইসলামী রাজনীতি সম্পর্কে ড. ফাতহে ইয়াকুন বলেন,

النظام السياسي في الإسلام يفسر ب" تنظيم أمور دنيا الناس على أحسن وأرفه وجه

ইসলামে রাজনীতির অর্থ হলো- সুন্দরতম ও সহজতম উপায়ে জনগণের পার্থিব কার্যাদির ব্যবস্থাপনা।[২০]

অতএব আমরা বলতে পারি যে, মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সহ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর দেয়া বিধান ও নবী স.-এর দেখানো পথে জীবন পরিচালিত করার প্রচেষ্টাকে ইসলামী রাজনীতি বলে।

যারা নানাভাবে ইসলামের বিরোধিতা করে তারা এ চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বদা সচেষ্ট যে, রাজনীতির সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই, রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে ইসলাম পরিচিত নয়। অথচ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এর পূর্ণাঙ্গতার ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

---

১৭. আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া নববী, *শরহে মুসলিম*, বৈরূত : দারু ইহ্য়া ইত-তুরাস আল-আরাবী, ১৩৯২ হি.

১৮. *মাওসুআতু নাদরাতিন নাঈম*, অধ্যায় : তাসীস আদ-দাওলাহ আলইসলামিয়্যাহ (সালিহ বিন হুমাইদ সম্পাদিত)

১৯. আল কুরআন, ৯ : ৩৩

২০. উল্লিখিত উক্তিটি প্রফেসর ড. ইয়াসিন উইসাঈ তার *'আন-নিযামুস সিয়াসী ফিল ইসলাম'* নামক গ্রন্থের ২৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾

আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দীন হিসেবে পছন্দ করলাম।[২১]

অপরদিকে রাজনীতি বা রাষ্ট্র পরিচালনা নীতিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করা জীবনের অপরিহার্য অংশ। পৃথিবীতে রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভবের পর থেকেই রাজনীতির চর্চা ক্রমশ বাড়ছে। বর্তমান পৃথিবীতে রাজনীতিহীন জীবন কল্পনা করা যায় না। তাই যেহেতু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা (অর্থাৎ এ জীবন ব্যবস্থায় জীবনের এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই, যা সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া হয়নি); যেহেতু ইসলামের প্রধান উৎস কুরআন ও সুন্নাহতে রাজনীতি সম্পর্কিত বহু বিষয় আলোচিত হয়েছে; যেহেতু ইসলামের সর্বশেষ নবী রাসূলুল্লাহ স. তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন[২২] এবং তাঁর পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশিদা ও মুসলিমগণ সফলভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন; যেহেতু ইসলামের অনেক বিধি বিধান রয়েছে যেগুলোর বাস্তবায়ন রাষ্ট্রক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত; যেহেতু কুরআনে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে মুসলিম উম্মাহকে পৃথিবীতে খিলাফাত বা প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ক্ষমতা প্রদানের ওয়াদা প্রদান করা হয়েছে;[২৩] সেহেতু ইসলামে রাজনীতি আছে এবং জীবনের অন্যান্য দিক ও বিভাগ যেমন সংস্কৃতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদির সাথে ইসলামের সম্পর্ক যেমন রাজনীতির সাথেও ইসলামের সম্পর্কও তেমন। ইসলামে রাজনীতির গুরুত্ব এবং এ দুটির আন্তঃসম্পর্ক অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

উপরোক্ত কারণগুলো ছাড়াও আরো বহু কারণ রয়েছে যার জন্যে রাজনীতিকে কখনো ইসলাম থেকে পৃথক করা যায় না কিংবা ইসলামকে রাজনীতি থেকে পৃথক রাখা যায় না। উল্লেখ্য যে, ইসলাম বিশ্বের অন্যান্য প্রচলিত ধর্মের মতো কিছু নীতি-নৈতিকতা ও অনুষ্ঠাননির্ভর ধর্ম নয়। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। যার মধ্যে ব্যক্তি জীবন

---

২১. আল-কুরআন, ০৫ : ০৩

২২. সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ড. জিয়াউদ্দিন রাইস তার *'ইসলামের রাজনৈতিক তত্ত্ব' (Political theory of Islam)* শীর্ষক গ্রন্থে বলেন : "এতে কোনো সন্দেহ নেই যে রসূলুল্লাহ সা. তাঁর সঙ্গী সাথীদের নিয়ে মদিনায় যে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কেউ যদি এটিকে তার কার্যপ্রণালীর দৃষ্টিতে বিবেচনা করে আধুনিক রাজনীতির সাথে তুলনা করে তাহলে সার্বিক অর্থে একে রাজনৈতিক কার্যকলাপ বলা যেতে পারে। একই সাথে কেউ যদি এটিকে তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও এর আধ্যাত্মিক ভিত্তি যার উপর এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এ দৃষ্টিতে বিবেচনা করে তাহলে একে ধর্মীয় কার্যকলাপ বললে তাতেও কোনো বিধি-নিষেধ থাকতে পারে না।" "পৃষ্ঠা-২৭-২৯

২৩. আল-কুরআন, ২৪ : ৫৫

থেকে শুধু করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান রয়েছে। ইসলাম শুধু ধর্ম নয়; বরং সামগ্রিক বিধান। তাই নির্দ্বিধায় মুসলিমদের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, ইসলামহীন রাজনীতি বা রাজনীতিহীন ইসলাম কোনটিই পূর্ণাঙ্গ নয়। সেজন্য বলা হয় রাজনীতিবিহীন ধর্ম অসম্পূর্ণ।[২৪] আমাদের প্রিয় নবী স. ইমামতি করতেন, সাহাবীদেরকে তালীম তারবিয়াত দিতেন, আবার সৈন্যবাহিনীও পরিচালনা করতেন। তিনি বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেন এবং জননীতি নির্ধারণ করতেন।[২৫] বিশিষ্ট মুফাসসির শিহাবুদ্দীন মাহমূদ আল আলূসী (১২১৭-১২৭০ হি.) রহ. বলেন,

ولهذا قيل : الدين والملك توأمان ففي ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخر لأن الدين أس والملك حارس وما لا أس له فمهدوم وما لا حارس له فضائع .

এ কারণে বলা হয় যে, দীন ও রাষ্ট্র- এ দুটি পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। সুতরাং এ দুটি অংশের যে কোনো একটিকে যদি পরিত্যাগ করা হয়, তবে অন্য অংশও পরিত্যক্ত হয়ে পড়বে। কেননা, দীন হলো ভিত্তি আর রাষ্ট্র হলো প্রহরী ও রক্ষকস্বরূপ। বলাই বাহুল্য, যে ইমারতের ভিত্তি নেই, তা তো ধ্বসে পড়বেই, আর যে ইমারাতের প্রহরী ও রক্ষক নেই, তা তো নষ্ট হবেই।[২৬]

যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে সাইয়িদুনা আবূ বাক্র রা.-এর যুদ্ধ ঘোষণা[২৭] থেকে জানা যায়, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি মুসলিম নাগরিক ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক জীবনেও ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে বাধ্য। বিশ্ববরেণ্য মুসলিম দার্শনিক কবি ইকবাল বলেন, ধর্ম ও রাষ্ট্র দেহ ও আত্মার সমতুল্য।

---

২৪. মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর রহ. বলেন, "রাজনীতিবিহীন ধর্ম অসম্পূর্ণ। পক্ষান্তরে ধর্মবিহীন রাজনীতি ইলহাদ, বেদ্বীনি ও কুফরী। (হাফেজ্জী হুজুর গবেষণা ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত *হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. রচনাসমগ্র*) পৃ. ২৩৮

২৫. আবদুল রশিদ মতিন, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান : ইসলামী প্রেক্ষিত*, ঢাকা : বিআইআইটি, ২০০৮, পৃ. ৩৩

২৬. ড. আহমদ আলী, *ইসলাম ও গণতন্ত্র*, চট্টগ্রাম: রিলেটিভ পাবলিকেশন্স, ২০১৩, পৃ. ৩০

২৭. যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে আবূ বাক্র রা. বলেন,

وَاللّٰهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا

"আল্লাহ তা'আলার কাসম! যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে (অর্থাৎ নামায পড়বে; কিন্তু যাকাত দেবে না), তাদের বিরুদ্ধে আমি লড়াই করবোই। কেননা যাকাত হলো সম্পদের অধিকার। আল্লাহর কাসম! রাসূলুল্লাহ সা.কে তারা যদি যাকাত রূপে কোন মেষ শাবকও আদায় করে থাকত, যদি তারা এখন আমাকে তা আদায় করতে বিরত থাকে, তা হলে আমি তাদের বিরুদ্ধে এর জন্য লড়াই করবো।"

(আল বুখারী, *আস-সাহীহ*, [কিতাবুয যাকাত], হা.নং: ১৩১২; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, [কিতাবুল ঈমান], হা.নং: ২৯)

এদের পারস্পরিক নিবিড় সংযোগ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অপরিহার্য আর এদের পারস্পরিক বিরোধ বিচ্ছেদের নিশ্চিত পরিণতি ধ্বংস। তিনি ধর্মহীন রাজনীতিকে 'ভূতের কন্যা' ও 'পঙ্কিল মনোবৃত্তি'র পরিচায়ক বলে উল্লেখ করেছেন।[২৮] ইমাম গাযালী (রাহ.)ও প্রায় একই রূপ মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন,

الدين والملك توأمان فلا يستغنى أحدهما عن الآخر

দীন ও রাষ্ট্র- এ দুটি পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। সুতরাং এ দুটির একটি অন্যটি ছাড়া চলতে পারে না।[২৯]

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

إن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا .. والدين والسلطان توأمان.. والسلطان ضروري في نظام الدنيا ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين

দীনের ওপর জীবন যাপন দুনিয়ার বিধিবদ্ধ ব্যবস্থাপনা ছাড়া সম্ভব নয়। ... দীন ও রাষ্ট্রক্ষমতা দুটি পরস্পর অবিচ্ছিন্ন।... রাষ্ট্রক্ষমতা দুনিয়ার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার জন্য একান্ত প্রয়োজন আর দুনিয়ার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা দীনের ওপর জীবন যাপনের জন্য একান্ত প্রয়োজন।[৩০]

প্রচুর গবেষণা ও অধ্যয়ন শেষে "রাজনীতি ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ" মর্মে ঘোষণা দিয়ে বর্তমান বিশ্বের প্রখ্যাত মুজতাহিদ প্রফেসর ড. ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন,

"এখানে এ কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা কর্তব্য মনে করছি যে, রাজনীতি ব্যতীত ইসলামের সত্যিকার ও প্রকৃত রূপের (যেভাবে আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন) পরিপূর্ণতা লাভ অসম্ভব। ইসলামকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করলে তা আর ইসলাম থাকবে না, অন্য কোনো ধর্মে পরিণত হতে বাধ্য। বৌদ্ধ ধর্ম বা খ্রিস্ট ধর্ম ইত্যাদিকে হয়তবা রাজনীতি থেকে পৃথক করার চিন্তা করা সম্ভব; কিন্তু ইসলামকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় চিন্তা করা অসম্ভব।"[৩১]

ইসলাম ও রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে বর্তমানে তিন প্রকার মত দেখা যায়। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মত হলো, ইসলাম অন্য ধর্মের মতোই। ইসলামের সাথে মানুষের সম্পর্ক কেবল ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডে। এটি ব্যক্তিগত বিষয়। রাষ্ট্রপরিচালনা ও রাজনীতির সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। ইতিহাসে দেখা যায় যে, ইউরোপে রাষ্ট্র ও গীর্জার দীর্ঘ আটশত বছরের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সৃষ্ট অস্থিরতার ফলে সে

---

২৮. ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০

২৯. *প্রাগুক্ত*

৩০. *প্রাগুক্ত*

৩১. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা : তত্ত্ব ও প্রয়োগ, (মিন ফিকহিদ দাওলাহ ফিল ইসলাম)*, ঢাকা : বিআইআইটি, ২০১৫ খ্রি. পৃ. ১০৬

অঞ্চলের মানুষ যখন বিষিয়ে ওঠেছিল; তখন দুই তরবারীর দর্শন প্রয়োগ করে অর্থাৎ "গীর্জার প্রাপ্য গীর্জাকে দাও আর রাষ্ট্রের প্রাপ্য রাষ্ট্রকে দাও" এই নীতি অবলম্বন করে তারা এই সংঘাতের অবসান করতে সচেষ্ট হয়েছিল। কিন্তু পোপ-পাদ্রীদের প্রভাব থেকে যখন কোনভাবেই বেরিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছিল না, তখন দ্বাদশ শতকের দিকে মারসিলিও এবং চতুর্দশ শতকের দিকে ম্যাকয়াভেলি এগিয়ে আসেন সেকুলারিজম বা ধর্মনিরেপক্ষতার দর্শন নিয়ে। রাষ্ট্র ও গীর্জার দ্বন্দ্বে অতিষ্ঠ এবং পোপ ও পাদ্রীদের অন্যায় নিগ্রহের শিকার ইউরোপের মুক্তিপাগল মানুষ ইসলামের সুমহান রাজনৈতিক দর্শনের সাথে পরিচিত না হওয়ার কারণে ম্যাকয়াভেলির ধর্মনিরপেক্ষতার দর্শনকেই মুক্তির মহাপয়গাম মনে করে আঁকড়িয়ে ধরে। এই দর্শন ইউরোপের রাজনৈতিক অঙ্গনে এত দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, যারাই এর বিরোধিতা করতো তাদেরকে মনে করা হতো প্রগতি বিরোধী, অগ্রগতির পথে অন্তরায়।[৩২]

খ্রিস্টান ধর্মরাষ্ট্রের নির্যাতন-নিপীড়নের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই মতাদর্শ সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর এই মতবাদ সারা বিশ্বে খানিকটা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।[৩৩] সেকুলারিজমের উঠতি প্রোপাগান্ডার শিকার হয়ে এ সময় অনেকেই ইসলামকে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা ও কতিপয় ইবাদতের সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ করে ফেলার তৎপরতায় লিপ্ত হয়। এহেন ব্যাখ্যা পশ্চিমাদের প্রশংসা লাভের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হয় এবং সেকুলারিজমের সমর্থকদের দ্বারা সমর্থনপুষ্ট হয়ে ক্রমান্বয়ে এমন একটি ধ্যান-ধারণা গড়ে ওঠে যে, ইসলাম ব্যক্তি মানুষের উৎকর্ষ বিধানের জন্যই আগমন করেছে। এই চিন্তাধারার অনুসারীরা ইসলামকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের পরিমণ্ডল থেকে নির্বাসন দিয়ে ব্যক্তি-জীবনের ছোট একটি গণ্ডিতে আবদ্ধ করে ফেলে। এরাই এ ধরনের ধ্যান-ধারণা প্রচার করে যে, ইসলাম হলো একটি ধর্ম; রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।[৩৪]

এই মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব পরিবর্তনের জন্য একটি ইসলামপন্থী চিন্তাগোষ্ঠী রাজনীতির মাঠে অবতীর্ণ হন। তাঁরা বলিষ্ঠ যুক্তি প্রমাণের আলোকে এটা প্রমাণ করে দেখান যে, ইসলাম অপরাপর ধর্মের ন্যায় কতিপয় আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব কোন ধর্ম নয়। কিংবা কিছু ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে আবদ্ধও নয়। বরং ইসলামের রয়েছে সর্বজনীন পরিব্যাপ্তি। এর বিধি-বিধান জীবনের সকল কর্মকাণ্ডে পরিব্যাপ্ত, এর হুকুম-আহকাম জীবন জগতের সর্বত্র প্রযোজ্য। ইসলামে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের গুরুত্ব ঠিক ততখানিই যতখানি গুরুত্ব রয়েছে ব্যক্তিজীবনের উৎকর্ষ সাধনের বেলায়।

---

৩২. আবুল ফাতাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০৯

৩৩. মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী, *রাজনীতি : ইসলামী চিন্তাধারা*, অনুবাদ : রেজাউল করিম, ঢাকা : মাকতাবাতুত তামাদ্দুন, ২০১৩ খ্রি., পৃ. ১১৯

৩৪. আবুল ফাতাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১০

সেকুলারিজমের মুকাবেলা করতে যেয়ে ইসলামের সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকটির উপর অধিক গুরুত্বারোপের পরিণতি থেকে একদল নিজেদের অজান্তেই ইসলামের ব্যক্তি জীবনের প্রসঙ্গটির ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করতে থাকে এবং রাজনীতিকেই ইসলামের মূল উদ্দেশ্য বলে মনে করে। তাঁদের বক্তব্য হলো, ইসলামের মূল উদ্দেশ্য দুনিয়াতে একটা ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্র গঠন করা। ইসলামের অন্য বিধানগুলো এই মূল লক্ষ্যের অনুগামী। তাঁদের মতে, এই কারণে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামকে বিজয়ী করার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিই ইসলামের প্রকৃত মর্ম-উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন। অনেকে রাজনীতি থেকে দূরে থেকে আত্মার সংশোধন, ইসলামী শিক্ষার প্রসার, ইসলামের দাওয়াত, সামাজিক সংস্কার ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই। এ ধরনের ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলা হয়, তিনি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারী এবং ইসলামের আসল মর্ম-উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি সচেতন নন।[৩৫]

অপর পক্ষে পাশ্চাত্যের আদর্শ ঘেঁষা কিছু কিছু মুসলিম সেক্যুলার আদর্শ এরূপ ধ্যান-ধারণা লালন করেন যে, ইসলামে রাজনৈতিক দর্শন থাকলেও তা সেকেলে। আধুনিক যুগের ক্রমবর্ধমান সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সাথে তাল মিলিয়ে এগুবার মত পর্যাপ্ত উপাদান ইসলামে নেই।[৩৬]

বস্তুত ইসলামের রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে এই তিন ধরনের ধারণাই অজ্ঞতাপ্রসূত ও বিভ্রান্তিকর। প্রথমত দু'টি দৃষ্টিভঙ্গিই প্রান্তিক। অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি অথবা অতিরিক্ত শিথিল। আর তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি অজ্ঞতাপ্রসূত। রাজনীতির ক্ষেত্রে ইসলামের প্রকৃত অবস্থান উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে এই সব মতাদর্শ গড়ে ওঠেছে। এর কোনটিতেই প্রকৃত অবস্থার সঠিক চিত্রায়ন নেই।

যাঁরা ইসলামকে রাজনীতিহীন মনে করেন বা ইসলামী রাজনীতির বিরোধিতা করেন তাঁদের জবাবে এখানে প্রাচ্যবিদ বুদ্ধিজীবীদের কতিপয় বক্তব্য তুলে ধরা হলো যেখানে তাঁরা ইসলামের সাথে রাজনীতির সম্পর্কের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। কারণ এ সকল প্রগতিবাদী ইসলাম-বিদ্বেষীরা এ দাবি করতে পারবেন না যে, তাঁরা বর্তমান যুগের বিষয়ে তাঁদের চেয়েও বেশি খবর রাখেন, কিংবা এও দাবি করতে পারবেন না যে, তাঁরা জ্ঞান বিজ্ঞান ও বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহের কলাকৌশল তাঁদের চেয়েও বেশি রপ্ত করতে পেরেছেন। তাদের কতিপয় বক্তব্য নিম্নরূপ :

---

৩৫. মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯
৩৬. আবুল ফাতাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১০

১. ড. ভি ফিটজেরাল্ড (V. Fitzgerald) বলেন,

"ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্ম নয়, বরং এটি একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিও বটে। যদিও সমসাময়িক যুগের কতিপয় মুসলিম যারা নিজেদের প্রগতিবাদী বলে পরিচয় দিতে অভ্যস্ত, তারা মনে করেন, উভয়ের মাঝে সীমারেখা জড়িত, একটিকে অপরটির থেকে পৃথক করার কোনো সুযোগ নেই।"

২. অধ্যাপক সি. এ. ন্যালিয়ন (C.A. Nallion) বলেন,

"মুহাম্মদ স. একই সময়ে একটি ধর্ম ও একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা জীবনের প্রতিটি দিককে বেষ্টন করে আছে"।

৩. ড. জোসেফ শ্যাখ্‌ট (J. Schacht)বলেন,

"ইসলাম শুধুমাত্র ধর্ম সর্বস্ব নয়; বরং এটি ধর্ম থেকেও অতিরিক্ত কিছু; এটি শাসন ব্যবস্থা ও রাজনেতিক চিন্তাধারারও প্রতিনিধিত্ব করে। এটি পরিপূর্ণ একটি জীবন ব্যবস্থা, যা ধর্ম ও রাষ্ট্র উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে"।

৪. অধ্যাপক আর. স্ট্রথম্যান (R. Strothmann) বলেন,

"ইসলাম ধর্ম ও রাজনীতির সমষ্টি; কারণ এর প্রতিষ্ঠাতা একজন নবী ছিলেন, সাথে সাথে একজন বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়কও ছিলেন"।

৫. অধ্যাপক ডি.বি. ম্যাকডোনাল্ড (D.B. Machdonald) বলেন,

"এখানে (মদীনাতে) সর্বপ্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ইসলামী আইনের মূলনীতি প্রণয়ন করা হয়"।

৬. স্যার টি. আরনল্ড (Sir. T. arnold) বলেন,

"ইসলামের নবী একই সময় ধর্মপ্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন"।

৭. অধ্যাপক 'গিব' (Gibb) বলেন,

"তখনি স্পষ্ট হলো যে, ইসলাম শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসের নাম নয়; বরং এটি একটি স্বতন্ত্র সমাজ ও রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার দাবি রাখে। ইসলামে রয়েছে স্বতন্ত্র শাসন পদ্ধতি, এর রয়েছে নিজস্ব আইন কানুন ও বিশেষ রাষ্ট্র ব্যবস্থা"।[৩৭]

---

৩৭. উল্লিখিত ১-৭ পর্যন্ত উক্তিসমূহ প্রফেসর ড. ইউসুফ আল-কারযাভী তার *"ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা : তত্ত্ব ও প্রয়োগ"* গ্রন্থে মূল বইয়ের রেফারেন্স সহ উল্লেখ করেছেন। পৃ. ২১-২২। (মূল বইটি আরবীতে *"মিন ফিকহিদ দাওলাহ ফিল ইসলাম"* নামে প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছে বিআইআইটি, ঢাকা, ২০১৫)

প্রকৃত সত্য হলো, ইসলাম একটি সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা। মানব জীবনের সামগ্রিক দিকের একটি পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা এতে রয়েছে। এখানে মানুষের বিশ্বাস ও ঈমানের পরিশুদ্ধির দিক-নির্দেশনা যেমন রয়েছে, তেমনি ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের নির্দেশনাও রয়েছে, আবার মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ লাভের পন্থাও নির্দেশ করা হয়েছে। ব্যক্তি জীবনের উন্নয়নের কর্মসূচী যেমন এতে রয়েছে, তেমনি মানুষের জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের এমনকি আন্তর্জাতিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ পথ নির্দেশনাও এতে রয়েছে। এই সামগ্রিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামের পূর্ণাঙ্গ প্রাসাদ। এখানে একটিকে গ্রহণ করা একটিকে বর্জন করা, একটিকে উপেক্ষা করে অন্যটিকে আঁকড়ে ধরার কোনই অবকাশ নেই।

এর অর্থ হলো ইসলামের জীবনব্যাপী দিক নির্দেশনার একটি দিক হলো রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা। রাজনৈতিক দিক নির্দেশনাই ইসলামের একমাত্র উদ্দেশ্য এরূপ নয়। আবার প্রত্যেককে রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হবে এমনও নয়। বরং এ দায়িত্ব উম্মতের উপর ফরযে কিফায়ারূপে আরোপিত। একটি দলকে এ দায়িত্ব পালনে সদা তৎপর থাকতে হবে এবং ইসলামের রাজনৈতিক দিক নির্দেশনাগুলো রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে প্রতিফলিত ও বাস্তবায়িত করার জন্য জোর তৎপরতা চালিয়ে যেতে হবে। অন্যথায় সকলেই এ দায়িত্বে অবহেলার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে।[৩৮]

ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গতার মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, পরিবেশ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সম্ভাব্য মাত্রা পর্যন্ত এই পূর্ণাঙ্গতার প্রতিফলন দাবি করে মুসলিম উম্মার নিকট সঙ্গত কারণে কোথায়ও পূর্ণাঙ্গ মাত্রায় বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হলে যেখানে যতটুকু সম্ভব ততটুকু অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে। সুতরাং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধি-বিধান এবং রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনাকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র কতিপয় ইবাদত আনুষ্ঠানিকতার গণ্ডিতে আবদ্ধ করে ইসলামকে ব্যাখ্যা করা যেমন প্রান্তিকতা, তেমনি ব্যক্তিক উৎকর্ষ, নৈতিক উন্নয়ন, আধ্যাত্মিক অগ্রগতির প্রচেষ্টা, ঈমান-আকীদা, আমল-আখলাকের দিকগুলোকে পাশ কাটিয়ে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের ব্যাখ্যা করতে যাওয়া এবং ইসলামকে রাজনীতি সর্বস্ব একটি মতবাদরূপে তুলে ধরাও তেমনি প্রান্তিকতা। এতে অবশ্যই কোন সংশয়ের অবকাশ নেই যে, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে ইসলামের একটি পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা রয়েছে। মানুষের সামাজিক জীবনকে ভারসাম্যপূর্ণ করে তোলা, সুখে দুঃখে মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানো, সমাজের সেবা করা, সমাজে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা, রাষ্ট্রীয়ভাবে মানুষের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালনা করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ

---

৩৮. আবুল ফাতাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১০

ব্যাপারে ইসলামের সুনির্ধারিত বিধি-বিধান রয়েছে; যা মানুষের জীবনের সর্বোচ্চ শান্তি ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেয়। কিন্তু কথাটাকে যদি এভাবে বলা হয় যে, ধর্ম মূলত রাজনীতিরই অপর একটা নাম অথবা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে ধর্মের মূল উদ্দেশ্য তাহলে অবশ্যই এটি প্রান্তিকতার দোষে দুষ্ট হতে বাধ্য। এটা ইসলামের ভাবমূর্তি বিকৃতিরই নামান্তর।

বস্তুত সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের যে নিয়মনীতি রয়েছে তা সর্বজনীন ও সর্বকালীন। কেননা এ সকল ক্ষেত্রে ইসলাম উদারনীতি গ্রহণ করেছে। একটি নির্ধারিত চৌহদ্দির মাঝে অবস্থান করে মানুষ যাতে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে অগ্রসর হতে পারে এবং প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন করে নিতে পারে এতটা সুযোগ এক্ষেত্রে রেখে দেয়া হয়েছে। যে চৌহদ্দি বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে তা সর্বজনীন ও কালজয়ী অর্থাৎ সর্বযুগে সকল দেশে সকল রং ও বর্ণের মানুষের ক্ষেত্রে সেগুলো প্রযোজ্য। কতিপয় চিরন্তন বিষয়ের বিধি-বিধান নির্ধারণ করে দেয়ার পর মানুষের গবেষণা ও ইজতিহাদের দরজাকে এক্ষেত্রে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। অতএব যারা বলেন যে, ইসলামের রাজনৈতিক দর্শন থাকলেও আধুনিক কালে তা প্রযোজ্য হওয়ার মত নয়, তারা মূলত অন্ধের রাজ্যে বাস করেন। ইসলামের জীবনধারা ও বিধি বিধানের সাথে তাদের পরিচয় নেই বললেও ভুল হবে না। এধরনের প্রান্তিক বিশ্বাসের অধিকারীদেরকে মাওলানা মুশাহেদ আলী রহ. "ফাতহুল কারীম ফী সিয়াসাতিন নাবীয়্যিল আমীন" গ্রন্থে মুলহিদ[৩৯] বলে অভিহিত করেছেন।[৪০]

ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো ইবাদত

আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনায় বলেছেন,

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ﴾

আমি জ্বীন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি এই জন্য যে, তারা আমার ইবাদত করবে।[৪১]

ইবাদতের অর্থ হলো আনুগত্য। আনুগত্যের প্রতিটি বৈধ রূপই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য করাই হলো আল্লাহর মানবসৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। ইবাদত দুই প্রকার:

এক. একমাত্র আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যসূচক ইবাদত। সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত, কুরবানী ইত্যাদি এই প্রকার ইবাদত। এগুলো প্রত্যক্ষ ও মৌলিক ইবাদত।

---

৩৯. স্বধর্মত্যাগী, নাস্তিক, অবিশ্বাসী।

৪০. আবুল ফাতাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১২

৪১. আল-কুরআন, ৫১ : ৫৬

দুই. আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে আল্লাহর বিধান মতে সম্পাদিত বৈষয়িক কল্যাণপ্রসূত কর্মকাণ্ড। এগুলো পরোক্ষভাবে ইবাদতে পরিণত হয়। এর উদাহারণ হলো ব্যবসা-বাণিজ্য। আল্লাহর তা'আলার বিধান মতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করা হলে সেই ব্যবসা-বাণিজ্যও তাৎপর্যের দিক থেকে ইবাদতে পরিণত হয়। এই ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে সাওয়াবও পাওয়া যায়। কিন্তু এটা পরোক্ষ ইবাদত। আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান মেনে চলা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তের কারণে ইবাদতে পরিণত হয়।[৪২]

রাজনীতি : পরোক্ষ ইবাদত

রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালনা পরোক্ষ ইবাদত। আল্লাহর বিধান মোতাবেক ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালনা করা হলে তা ইবাদতে পরিণত হবে। কিন্তু তা পরোক্ষ ইবাদত। ব্যবসা-বাণিজ্যের মতই রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা প্রত্যক্ষ ইবাদত নয়। আল্লাহর আনুগত্য ও ভালো নিয়তের কারণে রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনা ইবাদতে পরিণত হয়। আল্লাহ তা'আলা এই উভয় প্রকার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই মানুষ সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যক্ষ ইবাদতের গুরুত্ব পরোক্ষ ইবাদতের গুরুত্ব অপেক্ষা বেশি। কিন্তু পরোক্ষ ইবাদতের সংখ্যা বেশি। পরোক্ষ ইবাদতের একটিকে আল্লাহ কর্তৃক বান্দাকে সৃষ্টি করার মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিবেচনা করা যাবে না। পরোক্ষ ইবাদত প্রত্যক্ষ ইবাদতের সাথে সমন্বিত হয়ে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন করে।

আরেকটি বিষয় বিবেচনা করা উচিত। সব পরোক্ষ ইবাদতের গুরুত্ব সমান নয়। একেক পরোক্ষ ইবাদতের গুরুত্ব একেক রকম। এই গুরুত্ব নির্ভর করে পরোক্ষ ইবাদতের ফলাফলের ব্যাপকতা ও গুরুত্বের উপর। কোন পরোক্ষ ইবাদতের প্রভাব অনেক বেশি ব্যাপক এবং গুরুত্ববহ হলে সেই পরোক্ষ ইবাদতের গুরুত্বও অনেক বেশি হয়। রাজনীতির গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলা যায়, প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে সেই রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে সকল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইবাদত সম্পন্ন করা সহজ হয়। ইবাদতের পরিধি বৃদ্ধি পায়। এই কারণে অন্য সকল পরোক্ষ ইবাদতের তুলনায় রাজনীতির গুরুত্ব অনেক বেশি। এই দিক বিবেচনা করে রাজনীতির উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা দূষণীয় নয়। কিন্তু এটিকে ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করা হলে গুরুত্বের ক্রমবিন্যাসই লঙ্ঘিত হয়। কেননা, রাজনীতি ও রাষ্ট্র-পরিচালনা ইসলামের মূল লক্ষ্য এই মনোভাব মানুষের মন-মগজে প্রাধান্য লাভ করলে অন্য অনেক জরুরী বিষয় গৌণ হয়ে পড়ে। ফলে অনেক সমস্যার উদ্ভব ঘটতে পারে।[৪৩]

---

৪২. মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

৪৩. প্রাগুক্ত

রাজনৈতিক উদাসীনতা ইসলাম সম্মত নয়

ইসলামকে কেবল সালাত-সিয়ামের মাঝে সীমাবদ্ধ বিবেচনা করে রাষ্ট্রপরিচালনার বিষয়টিকে উপেক্ষা করাও অনেক বড় ভুল। প্রকৃত বাস্তবতা হলো ইসলামের অনেক দিক রয়েছে। রাজনীতিও ইসলামের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। রাজনীতি বিমুখ হয়ে রাজনীতিকে দীনের বহির্ভূত মনে করাও বড় ভ্রান্তি। ইসলামের উপর চলতে হলে ইসলামের সকল বিধি-বিধান মেনে চলা আবশ্যক। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾

তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আলাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন।[৪৪]

নবীগণ কায়েমী সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের সর্বাত্মক সংগ্রাম করেছেন।[৪৫]

ইসলামের পক্ষে চেষ্টা-পরিশ্রম

এক ব্যক্তিই ইসলামের সব বিভাগে কাজ করতে পারে না। এই জন্যে কর্মবণ্টন অত্যাবশ্যক। কিছু ব্যক্তি এক বিষয়ে কাজ করবে। কিছু ব্যক্তি আরেক বিষয়ে চেষ্টা-পরিশ্রম করবে। কুরআনেও এ নীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে,

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾

আর মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হবে। অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দীনের গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং আপন সম্প্রদায় যখন তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা (গুনাহ থেকে) বেঁচে থাকে।[৪৬]

কোন ব্যক্তি নিজের জন্যে দীনের একটা ক্ষেত্র বেছে নিবে এবং সেক্ষেত্রেই সে নিজের সময়-শ্রম অধিক পরিমাণে ব্যয় করবে। সেই বিষয়ে অধিক মনোযোগী হবে। আরেক জন আরেকটি ক্ষেত্র নির্বাচন করবে এবং সে সেই ক্ষেত্রে নিজের সময়-শ্রম ব্যয় করবে। সেই বিষয়ে অধিক মনোযোগ নিবিষ্ট করবে। এটি দীনের দিক থেকে

---

৪৪. আল-কুরআন, ২ : ৮৫
৪৫. অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
৪৬. আল-কুরআন, ৯ : ১২২

আপত্তিকর নয়। অনেকেই নিজের নির্বাচিত ক্ষেত্রকেই দীনের মূল লক্ষ্য বলে মনে করেন। এখানেই আপত্তি। কেননা, তার নির্বাচিত শাখা দীনের বিভিন্ন শাখার একটি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কেউ যদি মনে করেন তিনি রাজনীতিতে অধিকতর দক্ষতার সাথে সময়-শ্রম দিতে পারবেন। তিনি এটা করতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি মনে করেন যে, রাজনীতি হলো দীনের মূল লক্ষ্য তাহলে সেটি হবে ভ্রান্তি।

ইসলামের রাজনৈতিক বিধি-বিধানের স্বরূপ ও প্রকারভেদ : স্থায়িত্ব ও পরিবর্তনশীলতার সমন্বয়

রাজনীতি সম্পর্কে ইসলাম বিস্তারিত বিধি-বিধান উল্লেখ করেছে। কিন্তু ইসলাম রাষ্ট্র ব্যবস্থার নির্দিষ্ট কোন কাঠামো স্থির করে দেয়নি। কেবল রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল নীতি-কৌশলগুলো ইসলামে উল্লেখ করা হয়েছে। নীতি-কৌশলগুলো কার্যকরের পদ্ধতি, প্রায়োগিক রূপ ও শাখা-প্রশাখাগত বিষয়গুলোকে প্রতিটি যুগের আলিম ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামী শরী'আহ্র মাধ্যমে কিছু অপরিবর্তনশীল নীতি প্রদান করেছেন। এ সব নীতিতে কোন পরিবর্তন আনা যাবেনা। এ সব নীতিতে বর্ণিত দিক নিদের্শনা সকল যুগের জন্যে প্রযোজ্য। এই সব মৌলিক নীতিকে ভিত্তি ধরে এবং মৌলিক নীতিগুলোকে পুরোপুরি অনুসরণ করে মুসলিম চিন্ত াবিদদের পরামর্শক্রমে যুগোপযোগী কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা বৈধ।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আল-কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে,

﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ﴾

তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী প্রস্তুত রাখবে।[৪৭]

এই আয়াতে প্রস্তুতি গ্রহণের মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। শরী'আহ্য় প্রস্তুতি গ্রহণের কিছু উদাহরণও উল্লেখ রয়েছে। প্রতিটি যুগের শাসক, আলিম ও সমরবিদদের উপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। তারা অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনীয়তার আলোকে সর্বোচ্চ শক্তি অর্জনের চেষ্টা করবেন। অনুরূপভাবেই রাজনীতির ক্ষেত্রেও ইসলাম মৌলিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে। কিন্তু প্রশাসন, ক্ষমতা-বণ্টন, মন্ত্রী-পরিষদ, আইন-সভা, পরামর্শ-পরিষদ এ সব বিষয়ে ইসলাম কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা আরোপ করেনি। এগুলো সমকালীন মুসলিম নেতৃবর্গের কল্যাণধর্মী বিবেচনা সাপেক্ষ কাজের আওতাভুক্ত। প্রতিটি যুগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এই সব বিষয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তাই প্রাচীন ফকীহ্দের আলোচনায় আইন-সভা, মন্ত্রী-পরিষদের সদস্য-সংখ্যা ইত্যাদি শাখা-প্রশাখা বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট কাঠামো পাওয়া যায় না। শাখা-প্রশাখার ক্ষেত্রে সর্বযুগে প্রযোজ্য কাঠামো নির্দিষ্ট করা যৌক্তিকও নয়।

---

৪৭. আল-কুরআন, ০৮ : ৬০

মানুষ সব বিষয়ে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। অনেক বিষয়ে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা মত সিদ্ধান্ত নিলে ভুল হয়। এ সব বিষয়ে শরী'আহ্ নিজস্ব বিধান প্রদান করেছে। কিন্তু মুবাহ বিষয়গুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মোটকথা, রাজনীতি সংক্রান্ত ইসলামী মৌল-নীতিগুলো অপরিবর্তনীয়। তবে এই সব মূলনীতির ভিত্তিতে স্থান-কাল-বাস্তবতার আলোকে যুগোপযোগী বিধি-বিধান প্রণয়নের সুযোগও রয়েছে। এই সব বিধি-বিধান স্থান-কালভেদে পরিবর্তিতও হতে পারে। তবে শর্ত হলো, মূলনীতি বর্ণিত সীমারেখার মাঝে অবস্থান করতে হবে। সুতরাং ইসলামী রাজনীতি প্রসঙ্গে কিছু বলার অর্থ সকল যুগে, সকল স্থানে প্রযোজ্য বাধা-ধরা বিধি-বিধানের বর্ণনা করা নয়। ইসলামী রাজনীতি সংক্রান্ত আলোচনার উদ্দেশ্য হলো মৌলিক দর্শন, নীতি ও সূত্রগুলো আলোচনা করা। এগুলো কুরআন-সুন্নাহতে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে।[৪৮]

ইসলামে রাজনীতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন আদর্শ, যা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পক্ষ হতে বিশ্বমানবতার জন্য প্রেরিত হয়েছে। যার মধ্যে সকল যুগের সকল মানুষের সত্যিকারের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। ইসলাম মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য সুস্পষ্ট ও স্থায়ী মঙ্গলের পথনির্দেশ দান করেছে। কতগুলো ব্যক্তিগত নীতি-আদর্শ ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে ইসলাম সীমাবদ্ধ নয়। বরং মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক বিধিবিধানসহ তার ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের সকল মৌলিক বিষয়ে এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি ব্যবহারিক বিষয়েও ইসলাম চিরস্থায়ী হেদায়ত পেশ করেছে। অতএব ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা এ কারণে যে, যাতে পূর্ণ নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততার মধ্যে ইসলামী বিধানসমূহ যথাযথভাবে পালন করা সহজ হয় এবং মানবকল্যাণ নিশ্চিত হয়।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মুসলিম তার ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম পালনে স্বাধীন থাকলেও বৈষয়িক জীবন অনৈসলামী আইনে শাসিত হয়। সুদ-ঘুষের পুঁজিবাদী অর্থনীতি কিংবা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের সমাজবাদী অর্থনীতি অনুসরণের ফলে মুমিনের রুযী হারাম রুযীতে পরিণত হয়। অন্যদিকে দেশের আদালতগুলোতে ইসলামী বিধান অনুযায়ী বিচার ব্যবস্থা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে নিরপরাধী দণ্ডিত হয় আর অপরাধী খালাস পেয়ে যায়। ফলে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অবিচার এবং সামাজিক অস্থিতিশীলতা ব্যাপকতা লাভ করে। এ সকল কারণে একজন মুমিনকে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠায় সাধ্যমতো চেষ্টা করতে হয়। কারণ ইসলামী খিলাফত শুধু মুসলিমের জন্য নয়, বরং খিলাফতের অধীনে বসবাসরত সকল নাগরিকের জন্য সমানভাবে কল্যাণকর। ইসলাম যেমন কোন দল বা

---

৪৮. আবুল ফাতাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১২

সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট নয়, ইসলামী খিলাফতও তেমনি নির্দিষ্ট কোন সম্প্রদায়ের নিজস্ব বিষয় নয়। বরং আল্লাহর বান্দাদের জন্য আল্লাহ প্রেরিত বিধান সর্বজনীন, যা সকলের জন্য মঙ্গলময় ও সকলের প্রতি সমানভাবে প্রয়োগযোগ্য। যেমন আল্লাহর সৃষ্ট আলো বাতাস, মাটি ও পানি সবার জন্য কল্যাণময়।[৪৯]

মানব জীবনের উন্নতি অগ্রগতির সাথে রাজনীতির সম্পৃক্ততা বিবেচ্য হয়। সমাজ ও দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজনীতি প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। এজন্য ইসলাম বিশেষভাবে এর প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে।

১. আদর্শ বাস্তবায়ন করার জন্য রাজনীতি অপরিহার্য

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান পরিপালন করতে হলে রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োজন। ইসলামের কিছু বিধান রয়েছে যা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত ছাড়া পালন করা সম্ভব নয়। যেমন হত্যা ও অঙ্গহানির বিধান, চুরি ও ব্যভিচারের শাস্তি ইত্যাদি। সেজন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণও আল্লাহর দীন কায়েমে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾

তিনি তোমাদের জন্য দীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; যে বিষয়ে তিনি নূহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমি তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি এবং ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হল, তোমরা দীন কায়েম করবে এবং এ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। তুমি মুশরিকদেরকে যেদিকে আহ্বান করছ তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়; আল্লাহ যাকে চান তার দিকে নিয়ে আসেন। আর যে তাঁর অভিমুখী হয় তাকে তিনি হিদায়াত দান করেন।[৫০]

২. রাজনীতি সমাজের বিভিন্ন নীতি-বিধি পরিবর্তনকারী শক্তি

সমাজ থেকে অপসংস্কৃতি, কুসংস্কার, অন্যায় অবিচার দূরীভূত করার জন্য অন্যতম শক্তি হলো রাজনৈতিক শক্তি। এজন্য আমাদের প্রিয় নবী একটি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিয়ে সাহায্য করার জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করেছিলেন। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾

আর বল, 'হে আমার রব, আমাকে প্রবেশ করাও উত্তমভাবে এবং বের কর উত্তমভাবে। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান কর'।[৫১]

---

৪৯. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, *ইসলামী খিলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন*, রাজশাহী : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ খ্রি., পৃ. ৯-১০

৫০. আল-কুরআন, ৪২ : ১৩

৫১. আল-কুরআন, ১৭ : ৮০

৩. রাজনীতির মাধ্যমে যা সম্ভব অন্যভাবে তা সম্ভব নয়

রাজনীতি এমন একটি শক্তি যার মাধ্যমে এমন অনেক কল্যাণকর কাজ করা সম্ভব, যা অন্য কিছু দিয়ে সম্ভব নয়। এ জন্য তৃতীয় খলিফা উসমান রা. বলেন,

إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা রাষ্ট্র-শক্তির সাহায্যে এমন অনেক কাজ সম্পন্ন করেন, যা কুরআন দ্বারা করান না।[৫২]

৪. পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য রাজনীতি প্রয়োজন

পরাধীন কোন জাতি সফল হতে পারে না। কোন জাতি রাজনীতি থেকে দূরে থাকলে তাকে পরাধীনতা এবং ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। নবী মুসা আ. তার জাতিকে পরাধীনতার হাত থেকে বাঁচার জন্য যে আহ্বান করেছিলেন তা সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾

হে আমার কওম, তোমরা পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য বরাদ্দ করেছেন এবং তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে যেয়ো না, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে।[৫৩]

৫. ইসলামী রাজনীতি আল্লাহর শাস্তির বিপরীতে রক্ষাকবচ

সমাজ ও রাষ্ট্রে যখন অন্যায় কাজ ব্যাপকভাবে চলতে থাকে, গোনাহর কাজে কোন বাধা দেয়া না হয় তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে লানত ও বিভিন্ন গজব নেমে আসে। তাই অন্যায় ও গোনাহর কাজ প্রতিরোধ ও ন্যায় ও কল্যাণ কর্মের প্রবৃদ্ধির জন্য ইসলামী রাজনীতি চর্চা অপরিহার্য। যেমনিভাবে বনি ইসরাঈলদের উপর এসেছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ - كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾

বনী ইসরাইলের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে দাউদ ও মারয়ামপুত্র ঈসার মুখে (ভাষায়) অভিশাপ দেয়া হয়েছে। কারণ, তারা অবাধ্য হয়েছে এবং সীমালঙ্ঘন করত। তারা পরস্পরকে মন্দ থেকে নিষেধ করত না, যা তারা করত তা থেকে। তারা যা করত তা কতই না মন্দ![৫৪]

---

৫২. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, *মাজমূউল ফাতাওয়া*, মদীনা : মাজমা আল-মালিক ফাহদ লি-তবাআতিল মাসহাফিশ শরীফ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি., খ. ১১, খ. ৪১৬

৫৩. আল-কুরআন, ৫ : ২১

৫৪. আল-কুরআন, ৫ : ৭৮-৭৯

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট মুফাসসির ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

أي كان لا ينهى أحدٌ منهم أحداً عن ارتكاب المآثم والمحارم ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يرتكب مثل الذي ارتكبوه

গোনাহ ও হারাম কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য তাদের কেউ নিষেধ করত না। তারা যে ধরনের পাপে লিপ্ত ছিল তা থেকে বিরত রাখার জন্য তাদেরকে নিন্দা করা হয়েছে।[৫৫]

সমাজে যখন পাপাচার, খারাপ কাজ চলতে থাকে, আর কোন ভাল কাজের আদেশ দেয়ার মত লোক না পাওয়া যায় তখন সবার উপর আল্লাহর গজব নেমে আসে। সেখান থেকে কেউ রক্ষা পায় না। এ বিষয়ে হাদীসে এসেছে,

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي ، هُمْ أَعَزُّ مِنْهُمْ وَأَمْنَعُ ، لاَ يُغَيِّرُونَ ، إِلاَّ عَمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ

উবাইদুল্লাহ ইবন জারীর রা. তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যখন সমাজে অন্যায় ও পাপাচার চলতে থাকে, তখন যদি ক্ষমতাধর ব্যক্তিরাও তাতে বাধা না দেয়. তবে আল্লাহ তাআলা সকলের উপর শাস্তি দেন।[৫৬]

৬. সর্ব প্রকার জুলুমের হাত থেকে মুক্তির জন্য রাজনীতি

রাজনীতি না থাকলে সমাজের বিভিন্ন স্তরে জুলুম-নির্যাতন ব্যাপকতা লাভ করে। এমতাবস্থায় সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিরা অসম্মানিত ও লাঞ্ছিত হন এবং জুলুমের শিকার হন। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা জালিমদের থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন,

﴿ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴾

আর যারা জুলম করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না; অন্যথায় আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক থাকবে না। অতঃপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।[৫৭]

﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

---

৫৫. ইমাম ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, বৈরূত : দারুল মারিফাহ, ১৯৯২ খ্রি., খ. ৩, পৃ. ২৩৭

৫৬. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, তাহকীক : মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায় : আল-ফিতান, পরিচ্ছেদ : আল-আমরু বিল মারূফ ওয়ান নাহয়ু আনিল মুনকার, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি., হাদীস নং-৪০০৯; হাদীসটির সনদ হাসান।

৫৭. আল-কুরআন, ১১ : ১১৩

আর তোমরা ভয় কর ফিতনাকে[৫৮] যা তোমাদের মধ্য থেকে বিশেষভাবে শুধু জালিমদের উপরই আপতিত হবে না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ আজাব প্রদানে কঠোর।[৫৯]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত মুফাসসির মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানকীতী তার তাফসীরে লিখেছেন,

والتحقيق في معناها أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم وغيره هي أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب، صالحهم وطالحهم وبه فسرها جماعة من أهل العلم والأحاديث الصحيحة شاهدة لذلك.

এ আয়াতে উল্লেখিত ফিতনা (যা যালিম এবং অন্যান্যদেরও গ্রাস করে) দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ যখন কোন অন্যায় কাজ দেখে; কিন্তু তাতে বাধা দেয় না, তখন আল্লাহ্ ব্যাপকভাবে ভালো-খারাপ সবার উপর শাস্তি প্রেরণ করেন। এভাবেই আলিমগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এবং সহীহ্ হাদীসসমূহ এই ব্যাখ্যার পক্ষেই সাক্ষ্য বহন করে।[৬০]

৭. কুরআন-সুন্নাহর সংরক্ষণে ইসলামী রাজনীতি অনস্বীকার্য

ইসলামী রাজনীতির অনুপস্থিতিতে নানাভাবে সমাজে বিপর্যয় ও অশান্তি তৈরি হয়। ইসলামী রাজনীতির অনুপস্থিতি থাকলে নিজের স্বার্থ রক্ষায় শাসকগণ দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর নয় এমন আইন তৈরিতেও দ্বিধাবোধ করে না এবং আইন তৈরি করতেও আর কোন বাধা থাকে না। এমনকি কুরআন-সুন্নাহ্ পরিপন্থী আইন প্রণয়ন করলেও বাধা দেয়ার মত সামাজিক শক্তি থাকে না। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে যে, নিশ্চয় তারা ঈমান এনেছে তার উপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে। তারা তাগূতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে।[৬১]

---

৫৮. ফিতনা (فتنة) একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ; যা বিপদ, কষ্ট, পরীক্ষা, গযব, আযাব, দাঙ্গা, গোলযোগ, সম্মোহন, আকর্ষণ, শির্ক, কুফর, নির্যাতন, ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। দেখুন: তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে ইবনে কাসীর, ফাতহুল কাদীর, তাফসীরুল মানার।

৫৯. আল-কুরআন, ৮ : ২৫

৬০. মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানকীতী, *আযওয়াউল বায়ান ফী ঈযাহিল কুরআন বিল কুরআন*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৪৬২

৬১. আল-কুরআন, ৪ : ৬০

উপর্যুক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, ইসলামে রাজনীতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কুরআন ও সুন্নাহতে অসংখ্য আয়াত-হাদীস রয়েছে যেগুলোতে রাজনীতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণিত হয়েছে।

উপসংহার

যারা নানাভাবে ইসলামের বিরোধিতা করেন তারা "রাজনীতিতে ধর্মের উপস্থিতির" বিরুদ্ধে সরব ভূমিকা পালন করছেন। রাজনীতি থেকে ধর্মকে বিদায় করার চেষ্টার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনীতি থেকে ইসলামকে পৃথক রাখা। অপরদিকে ইসলামে রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গি না জানার কারণে অনেকে এ বিষয়ে নীরব থাকছেন। অথচ কুরআন-সুন্নাহ্ রাজনীতি সম্পর্কে স্পষ্ট ও যুগোপযোগী ধারণা পেশ করেছে যার অনুশীলন প্রতিটি মুসলিমকে সঠিক রাজনীতি চর্চায় উদ্বুদ্ধ করে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে প্রমাণিত হলো যে, ইসলামে রাজনীতি আছে। কিন্তু সে রাজনীতি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, অশান্তির জন্য নয়। ইসলামে কখনোই বাড়াবাড়ি বা চরমপন্থা গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামের রাজনীতি একান্তই কল্যাণচর্চার জন্য। ইসলামের রাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর দেয়া বিধান মোতাবেক তার সৃষ্টিকে পরিচালনা করা। এজন্য ইসলামী রাজনীতি একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জনের প্রচেষ্টা চালায়। মানবতার কল্যাণ সাধনই হচ্ছে ইসলামী রাজনীতির মূল লক্ষ্য। তাই ইসলামী রাজনীতি বা রাজনীতিতে ইসলামের উপস্থিতি সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণা করে সামনের পথে অগ্রসর হওয়া সময়ের দাবি।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১, সংখ্যা : ৪৩
জুলাই - সেপ্টেম্বর : ২০১৫

মানব পাচার প্রতিরোধে প্রচলিত আইন ও ইসলাম : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ*

[**সারসংক্ষেপ :** *মানব পাচার একটি জঘন্যতম অপরাধ ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। এটি এমন এক সহিংসতা যা সভ্যতা, মানবিক মূল্যবোধ ও অধিকারের প্রতি উপহাস এবং বর্বরতার প্রতিচ্ছবি। মূল্যবোধের অবক্ষয়, আইনগত দুর্বলতার সুযোগ, নীতি ও অনুশাসনের অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, দুর্বলতা ও শিক্ষার অভাব এবং তা প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের কমতি এবং সর্বোপরি প্রতিকারের জন্য আইনি সহায়তার সীমিত সুযোগ মানব পাচারের কারণগুলোর অন্যতম। বিশ্বের অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও মানব পাচারের বিষয়টি ব্যাপক আলোচনায় ছিলো না। তবে সাম্প্রতিক মানব পাচার বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে তা প্রতিরোধ ও দমনের কৌশল আলোচনায় তাৎপর্য পায়। বাংলাদেশে অতিসম্প্রতি এ বিষয়ক আইন প্রণীত হলেও মানব পাচার সংক্রান্ত আইন-শৃঙ্খলা অবনতি অতীব আলোচিত বিষয় হিসেবে গোচরে আসে। মানব পাচার যেমন আইন-শৃঙ্খলার অবনতির উল্লেখযোগ্য সূচক, তা রোধ করা তেমনি নিরাপত্তা ও মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত সাংবিধানিক নিশ্চয়তা বিধানের দায়িত্বের অংশবিশেষও বটে। আলোচ্য প্রবন্ধে মানব পাচাররোধে বাংলাদেশের প্রচলিত আইন ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুপারিশমালা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।]*

ভূমিকা

মানব পাচার একটি জাতীয় সমস্যা, যা মানবীয় মর্যাদার প্রতি এক চরম আঘাত। মানব পাচারে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্টতা দেখা যায়। তবে সম্প্রতি মানব পাচার নিয়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা বাংলাদেশ, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত প্রসারিত। বিশ্বব্যাপী এ মুহূর্তে যে সমস্যা মারাত্মকরূপ ধারণ করেছে তা হচ্ছে মানব পাচার। বাংলাদেশের অদক্ষ জনসংখ্যা ও দারিদ্র্য, শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব, সমাজে নারী ও শিশুদের নিরাপত্তাহীনতার বহুমাত্রিক হেতু, পেশা ও কর্মের অবাধ সুবিধাহীনতা, বেশি বেতনে চাকরির প্রলোভন ও উন্নত জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা, মাদক ও যৌন ব্যবসা, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদি বহুবিধ কারণে সম্প্রতি মানব পাচার বৃদ্ধি পেয়েছে।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মানব পাচার রোধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আইন ও ঘোষণা রয়েছে। মানব পাচার যে কারণেই হোক এটি নৈতিকতা, আইন ও ধর্ম কর্তৃক অসমর্থিত। ইসলাম মানুষকে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক অধিকার প্রদানের পাশাপাশি জীবন, সম্পদ ও মর্যাদার নিরাপত্তা প্রদান করেছে। ইসলামের পরিবার ব্যবস্থাও একটি আশ্রয় দুর্গ।

পাচারের সংজ্ঞা ও কারণ

পাচার শব্দের অর্থ গোপনে অপসারণ, চুপি চুপি সরিয়ে ফেলা, চুরি করে নিঃশেষকরণ, সাবাড়, খতম, শেষ।[১] পাচার বলতে দেশের ভেতরে অথবা দেশের সীমানার বাইরে বিক্রয়, বিনিময় বা অন্য কোন অবৈধ কাজে নিয়োগের জন্য নারী, শিশু বা কোন ব্যক্তিকে স্থানান্তর করাকে বুঝায়। মানুষ নিয়ে ব্যবসা ও মুনাফাকারীরা শিশু, নারী বা কোন ব্যক্তিকে ফুসলিয়ে, অপহরণ করে, অবরুদ্ধ করে যে অবৈধ কাজ করে তাকেই পাচার বলে।[২] এছাড়া কোন ব্যক্তিকে ভয়ভীতি প্রদর্শন বা বল প্রয়োগ করে বা প্রতারণা করে ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক বা অন্য কোন অসহায়ত্বকে কাজে লাগিয়ে বা আর্থিক লেন-দেনের মাধ্যমে দেশের বাইরে বিক্রি করাকেও মানব পাচার বুঝায়।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ১৯৯৪ সালের অনুষ্ঠিত এক সভায় পাচার বলতে বুঝানো হয়েছে:

> Trafficking in human beings is the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation.[৩]
>
> অর্থাৎ মানব পাচার হচ্ছে, ভয় দেখিয়ে বা জোর করে অথবা অন্য কোনও ভাবে জুলুম করে, হরণ করে, প্রতারণা করে, ছলনা করে, মিথ্যাচার করে, ভুল বুঝিয়ে,

---

১. বাংলা একাডেমী, *সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২, পৃ. ৩৮৭

২. এ্যাডভোকেট সালমা আলী, *নারী ও শিশু পাচার, বিদ্যমান আইন এবং সুপারিশ,* উন্নয়ন পদক্ষেপ, দ্বাদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, মার্চ-২০০৬, পৃ. ৪৪-৪৫; আফরিনা বিনতে আশরাফ, *নারী ও শিশু পাচার রোধ,* উন্নয়ন পদক্ষেপ, ১০ম বর্ষ, বত্রিশতম সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল, ২০০৪, পৃ. ৩৭

৩. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children which supplements the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted by the General Assembly in its resolution 55/25 (A/RES/55/25)

ক্ষমতার অপব্যবহার করে, দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, অথবা যার উপরে একজনের কর্তৃত্ব আছে অর্থ বা সুযোগ-সুবিধার লেনদেনের মাধ্যমে তার সম্মতি আদায় করে -শোষণ করার উদ্দেশ্যে কাউকে সংগ্রহ করা, স্থানান্তরিত করা, হাতবদল করা, আটকে রাখা বা নেওয়া।

মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনে এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

'মানব পাচার' অর্থ কোন ব্যক্তিকে ভয়ভীতি প্রদর্শন বা বল প্রয়োগ করিয়া; বা প্রতারণা করিয়া বা উক্ত ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক বা পরিবেশগত বা অন্য কোন অসহায়ত্বকে কাজে লাগাইয়া; বা অর্থ বা অন্য কোন সুবিধা লেনদেন-পূর্বক উক্ত ব্যক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে এমন ব্যক্তির সম্মতি গ্রহণ করিয়া; বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে যৌন শোষণ বা নিপীড়ন বা শ্রম শোষণ বা অন্য কোনো শোষণ বা নিপীড়নের উদ্দেশ্যে বিক্রয় বা ক্রয়, সংগ্রহ বা গ্রহণ, নির্বাসন বা স্থানান্তর, চালান বা আটক করা বা লুকাইয়া রাখা বা আশ্রয় দেওয়া।[৪]

বাংলাদেশে মানব পাচার পরিস্থিতি

বাংলাদেশে মানব পাচারের বিভিন্ন পথ রয়েছে। মানব পাচার বর্তমানে আন্তর্জাতিক ও আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে। নারী ও শিশু পাচারকারী অবৈধ ও অনৈতিক ব্যবসার সঙ্গে একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক দলও নিয়োজিত রয়েছে। দেশের মধ্যেও গ্রাম থেকে শহরে, এক শহর থেকে অন্য শহরে, একই শহরে নিজের বাড়ি থেকে নিয়ে অন্য এক জায়গায় পাচার করা হয়। উন্নয়নশীল ও দ্রুত অর্থনৈতিক পরিবর্তনশীল দেশসমূহের জাতীয় সীমানার বাইরে পাচারকারী ও অপরাধীচক্র মুনাফার জন্য নারী ও শিশুদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে এবং জোরপূর্বক অর্থনৈতিক ও যৌন উৎপীড়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করতে পাচার করে থাকে। মানব পাচারের ক্ষেত্রে নারী ও শিশুরাই পাচারের প্রধান বলি। নারীদের পাচার করার উদ্দেশ্য মূলত তাদেরকে দেহব্যবসায়ে কাজে লাগানো; ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌনকর্মে নিয়োজিত করা, পানশালায় নাচানো, অশ্লীল ছবি, চলচ্চিত্র ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করানো। এছাড়া সস্তা শ্রমের জন্য ব্যবহার করা, নেশার দ্রব্য পাচার করানো, তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রি করা, ভিনদেশী পুরুষদের যৌনলালসা মেটানোর জন্য বিয়ের নামে বিক্রি করে দেওয়া ইত্যাদি। শিশুদের ক্ষেত্রে পাচারের উদ্দেশ্য হল- সস্তা শ্রম, ভিক্ষাবৃত্তিতে ব্যবহার, যৌন শোষণের জন্য বিক্রি করা। এছাড়া নেশার দ্রব্য পাচার, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রি ইত্যাদির জন্য শিশুদের পাচার করা হয়।[৫]

---

৪. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ৩ (১)

৫. *Human Trafficking: A Security Concern for Bangladesh*. Dhaka: Bangladesh Institute of Peace and Security Studies, 2011. p. 2; Trafficking in Human Beings' by INTERPOL. Available in full text

বাংলাদেশ থেকে সাধারণত যশোর, সাতক্ষীরা, বেনাপোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, দর্শনা, দিনাজপুর, লালমনিরহাট সীমান্ত ও স্থলবন্দর এলাকা দিয়ে নারী ও শিশু পাচার হয়। তবে এর মধ্যে যশোর ও সাতক্ষীরা শিশু পাচারের প্রধান পথ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।[৬] সম্প্রতি টেকনাফ অঞ্চলের রোহিঙ্গা শরণার্থী নারী ও শিশু, পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় নারী ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত মানুষদের মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় পাচারের জন্য জলপথও ব্যবহৃত হচ্ছে।

ইউএনডিপির তথ্য মতে এক দশকে বাংলাদেশ থেকে ১২ থেকে ৩০ বছর বয়সী প্রায় তিন লাখ নারী ও শিশু পাচার হয়েছে। আর তিন দশকে পাচার হয়েছে দশ লাখ।[৭] বিভিন্ন মানবাধিকার, নারী ও শিশুকল্যাণ সংগঠনের গবেষণা প্রতিবেদনেও এর সত্যতা মিলে। সবচেয়ে বেশি পাচারের শিকার হয়েছে সীমান্তবর্তী জেলার বাসিন্দারা। তবে সম্প্রতি সাগরপথে অবৈধভাবে মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার বাসিন্দাদের ভাল চাকরির আশ্বাস দিয়েও পাচার করা হচ্ছে। জাতিসংঘের উদ্বাস্তুবিষয়ক হাইকমিশন ইউএনএইচসিআর'র বিবৃতিতে বলা হয়, ঝুঁকি সত্ত্বেও অনেক মানুষ এই বিপদসঙ্কুল পথ ব্যবহার করে বিদেশ পাড়ি দিচ্ছেন। যার ফলে ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে প্রায় ২৫ হাজারের মতো বাংলাদেশী এবং রোহিঙ্গা মানব পাচারের শিকার হয়েছে। এ সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় তিনগুণ।

সাগর পথে বেঁচে যাওয়া অভিবাসীদের তথ্যের উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে, ২০১৫ সালের প্রথম তিন মাসে অনাহার, পানিশূন্যতা এবং পাচারকারীদের নির্যাতনে আনুমানিক ৩০০ জন মানুষ সমুদ্রে মারা গেছে। জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৪ পর্যন্ত মালয়েশিয়ার উদ্দেশ্যে বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে পাচার হয় প্রায় ৫৩ হাজার মানুষ; যার পরিমাণ আগের বছর ছিল ৩৩ হাজার। ইউএনএইচসিআর-এর মুখপাত্র এ্যাড্রিয়ান এডওয়ার্ডস জানান, মানব পাচার করা একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। ফলে শিশুদেরও অপহরণ এবং জোর করে মানব পাচারের উদ্দেশ্যে নৌকায় তোলা হয়। ইউএনএইচসিআর রিপোর্টে আরো বলা হয়, ২০১২ সালের জানুয়ারী থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১.৫০ লাখ মানুষ বিভিন্ন দেশে পাচার হয়েছে।[৮] এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের

---

on http://www.interpol.int/Crime-areas/Trafficking-in-human-beings/Types-of-human-trafficking. Accessed on 27.05.15.

৬. Ms. Amrita Biswas, Human Trafficking Scenario in Bangladesh: Some Concerns, *International Journal of Humanities & Social Science Studies* (IJHSSS), Assam: Scholar Publications, 2015, Volume-I, Issue-IV, PP. 87-88

৭. ইউএনডিপি রিপোর্ট ও দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ মে, ২০১৫

৮. ইউএনএইচসিআর রিপোর্ট, এপ্রিল,২০১৫; দৈনিক প্রথম আলো, ৯ মে, ২০১৫

দাবি- বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর ১০-১৫ হাজার মানুষ পাচার হচ্ছে।[৯] রিফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০১৪ সালে পাচারের সময় বাংলাদেশীদের মধ্যে ৫৪০ জন গভীর সমুদ্র পথে মারা যায় এবং নিখোঁজ রয়েছেন অনেকেই।[১০]

বাংলাদেশে মানব পাচার নিরোধমূলক আইন

বাংলাদেশে নারী ও শিশু পাচার নিরোধমূলক পরিপূর্ণ ও সরাসরি কোনো আইন ছিল না। তবে ২০০০ সনের ১৪ ফেব্রুয়ারি সর্বপ্রথম নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক অপরাধসমূহ কঠোরভাবে দমনের উদ্দেশ্যে প্রণীত 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০'-এর কয়েকটি ধারায় নারী ও শিশু পাচারের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। এ আইনের পঞ্চম ধারায় নারী[১১] ও ষষ্ঠ ধারায় শিশু পাচারের শাস্তি[১২] বর্ণিত হয়েছে। ফলে এতো দিন নারী ও শিশু পাচার অপরাধের বিচার উক্ত আইনের দু'টি ধারার মাধ্যমে সমাধান করা হতো যা অপর্যাপ্ত। ২০০৩-এ এই আইনের কিছুটা সংশোধনী দেয়া হয়। এই আইনে বিভিন্ন ধরনের নারী নির্যাতনের মধ্যে পাচারকে বেশ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় এবং পাচারকার্যে নিয়োজিতদের শাস্তি দেয়া হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার "মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২" শিরোনামে এ বিষয়ক চূড়ান্ত আইন প্রণয়ন করেন। আইনটিতে চারটি অধ্যায় ও কয়েকটি ধারা বর্ণিত হয়েছে। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন, সংজ্ঞা, মানব পাচার, আইনের প্রাধান্য এবং ফৌজদারী কার্যবিধি প্রযোজ্যতা, অতিরাষ্ট্রিক প্রয়োগ, মানব পাচার ও এতদসংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহ এবং দণ্ড, মানব পাচার নিষিদ্ধকরণ ও দণ্ড, সংঘবদ্ধ মানব পাচার অপরাধের দণ্ড, অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা, ষড়যন্ত্র বা প্রচেষ্টা চালানোর দণ্ড, জবরদস্তি বা দাসত্বমূলক শ্রম বা সেবা প্রদান করতে বাধ্য করার দণ্ড, মানব পাচার অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে অপহরণ, চুরি এবং আটক করার দণ্ড, পতিতাবৃত্তি বা অন্য কোনো প্রকারের যৌন শোষণ বা নিপীড়নের জন্য আমদানী বা স্থানান্তরের দণ্ড, পতিতালয় পরিচালনা বা কোন স্থানকে পতিতালয় হিসাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের দণ্ড, পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে আহ্বান জানানোর দণ্ড, ভিকটিম বা মামলার সাক্ষীকে হুমকি প্রদানের দণ্ড, মিথ্যা মামলা বা মিথ্যা অভিযোগ দায়েরের দণ্ড, অপরাধের আমলযোগ্যতা, আপোষযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা, অভিযোগ দায়ের এবং তদন্ত, অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে আইনগত অনুমান ও তদন্ত, প্রতিরোধমূলক তল্লাশী এবং আটক, মানব পাচার

---

৯. দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ মে, ২০১৫

১০. দৈনিক প্রথম আলো, ৮ মে, ২০১৫

১১. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০, ধারা ৫ (১)

১২. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০, ধারা ৬ (১)

অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল এবং অপরাধের বিচার, মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল গঠন, ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা, ট্রাইব্যুনালের অধিকতর তদন্ত সংক্রান্ত ক্ষমতা, বিচারকার্য সম্পন্নের সময়সীমা, রুদ্ধ-কক্ষ বিচার, দোভাষী নিয়োগ, সম্পত্তি আটক, অবরুদ্ধকরণ ও বাজেয়াপ্তকরণ এবং অতিরাষ্ট্রিক নিষেধাজ্ঞা, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ, বিদেশী দলিল, লিখিত তথ্য প্রমাণাদি বা উপাদানের গ্রহণযোগ্যতা, ইলেকট্রনিক তথ্য প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা, আপিল, মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিবর্গ এবং সাক্ষীদেরকে সহায়তা এবং তাদের সুরক্ষা ও পুনর্বাসন, মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিবর্গকে বা ভিকটিমদের চিহ্নিতকরণ এবং উদ্ধার, ভিকটিম বা মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিবর্গের প্রত্যাবাসন, ভিকটিম বা মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিবর্গ এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে তথ্য সরবরাহ, আশ্রয় কেন্দ্র এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, নিরাপত্তা বিধান, পুনর্বাসন এবং সামাজিক একাঙ্গীভূতকরণ, ফৌজদারী বিচারের ক্ষেত্রে ভিকটিম বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং সাক্ষীর সুরক্ষা বিধান, শিশু ভিকটিম এবং শিশু সাক্ষীর অধিকার রক্ষা, ক্ষতিপূরণ আদায়ে দেওয়ানী মামলা রুজু করিবার অধিকার, মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান, মানব পাচার দমন ও প্রতিরোধে যৌথ বা পারস্পরিক আইনি সহযোগিতা, মানব পাচার প্রতিরোধ তহবিল, জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা, কোম্পানী বা ফার্ম কর্তৃক অপরাধ সংঘটন, সমতার নীতির প্রয়োগ এবং ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে বিধান এবং বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ইত্যাদি আলোচনা পরিধিভুক্ত হয়েছে। নিম্নে আইনটির উপর একটি সারনির্যাস তুলে ধরা হলো:

আইনের উদ্দেশ্য: মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন এবং মানব পাচার অপরাধের শিকার ব্যক্তিবর্গের সুরক্ষা ও অধিকার বাস্তবায়ন ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়নকল্পে 'মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২'-নামে আইন প্রণয়ন করেছে। আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, যেহেতু মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন এবং মানব পাচার অপরাধের শিকার ব্যক্তিবর্গের সুরক্ষা ও অধিকার বাস্তবায়ন ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বিধান করা আবশ্যক; এবং যেহেতু মানব পাচার সংক্রান্ত সংঘবদ্ধভাবে সংঘটিত আন্তঃদেশীয় অপরাধসমূহ প্রতিরোধ ও দমনকল্পে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়।[১৩] এ আইনে অপরাধ সংঘটনকারী কোন ব্যক্তি অনধিক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[১৪] সংঘবদ্ধ মানব পাচারের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যূন ৫ লক্ষ টাকা জরিমানার বিধান রাখা

১৩. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
১৪. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ৬ (২)

হয়েছে।[১৫] এছাড়া এ অপরাধে প্ররোচনা দিলে অনধিক ৭ বছর এবং অন্যূন ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যূন ২০ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।[১৬]

নিরাপত্তা ও সুরক্ষা : আইন অনুযায়ী পাচার বা অপরাধের শিকার ব্যক্তি উদ্ধার হওয়ার পর তাকে নিজের পরিবারে ফেরত পাঠানো না হলে বা তা সম্ভব না হলে প্রতিষ্ঠিত বা সরকার অনুমোদিত আশ্রয়কেন্দ্র/পুনর্বাসনকেন্দ্রে পাঠাতে হবে। তবে পাচারের শিকার ব্যক্তি আশ্রয়কেন্দ্রে বেশি দিন অবস্থান করতে পারবেন না। তারা চিকিৎসা, আইনি ও মানসিক পরামর্শ সেবা পাবেন।[১৭] পাচারের শিকার ব্যক্তি নিজে বা সাক্ষী যেন এ আইন বা অন্য আইনের অধীনে শাস্তি না পান, তা নিশ্চিত করতে হবে। সাক্ষীকে হুমকি দিলে অনধিক ৭ বছর, অন্যূন ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২০ হাজার টাকা জরিমানা হবে।[১৮] পাচার হওয়া ব্যক্তি বা তার পরিবারের কারও নাম-পরিচয় বা ছবি প্রচার করা যাবে না। লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি ৬ মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[১৯] এ ছাড়া পাচারের শিকার ব্যক্তি বা সাক্ষী শিশু হলে 'শিশুর সর্বোত্তম কল্যাণ' নীতি প্রয়োগ করতে হবে।[২০]

বিশেষ ট্রাইব্যুনাল : অপরাধের দ্রুত বিচারের জন্য সরকার দায়রা জজ পদমর্যাদার বিচারকের সমন্বয়ে প্রত্যেক জেলায় বিশেষ মানব পাচার দমন ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত সরকার প্রত্যেক জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালকে সেই জেলার মানব পাচার দমন ট্রাইব্যুনাল হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারবে। ট্রাইব্যুনালের অধীনে দায়রা আদালতের সব ক্ষমতা থাকবে। বিশেষ করে ট্রাইব্যুনাল 'ন্যায় বিচারের স্বার্থে' কোনো সুরক্ষামূলক আদেশসহ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাঁদের অধীনে বা ব্যবস্থাপনায় থাকা দলিল বা কাগজপত্র উত্থাপন করার নির্দেশ দিতে পারবে।[২১] ট্রাইব্যুনাল কোনো অভিযুক্তকে জামিন দেওয়ার সময় ওই আদেশের সঙ্গে তার নির্দিষ্ট করে দেওয়া দিনে জামিন পাওয়া ব্যক্তিকে পুলিশ বা ট্রাইব্যুনালের কাছে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশনা দিতে পারবে।

অপরাধের আইনি প্রকৃতিঃ এ আইনের আওতায় অপরাধ আমলযোগ্য, জামিন অযোগ্য এবং অ-আপসযোগ্য হবে।[২২] কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী এ

---

১৫. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ৭
১৬. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ৮ (১)
১৭. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ৩৬ (১-২)
১৮. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ১৪
১৯. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ৩৭ (২)
২০. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ৩৮ (১)
২১. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ২২ (১)
২২. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ১৬

আইনে অভিযুক্ত হলে মামলা দায়েরের জন্য সরকারের অনুমতি সংগ্রহ করা হোক বা না হোক ট্রাইব্যুনাল ওই অপরাধ আমলে নিতে পারবে।

বিচার সম্পন্নের সময়সীমা: এ আইনের আওতায় বিশেষ ট্রাইব্যুনাল অভিযোগ গঠনের ১৮০ কার্যদিবসের মধ্যে বিচারকাজ সম্পন্ন করবে।[২৩] ন্যায়বিচারের স্বার্থে ট্রাইব্যুনাল এ আইনের অধীনে কোনো অপরাধের বিচার কাজ কেবল মামলার সংশ্লিষ্ট পক্ষ এবং তাদের নিযুক্ত আইনজীবী বা ট্রাইব্যুনালের অনুমতি সাপেক্ষে রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠানের আদেশ দিতে পারবে। ট্রাইব্যুনাল প্রয়োজনে দোভাষীও নিয়োগ দিতে পারবে।[২৪]

যৌথ আইনি সহায়তা ও বিদেশে পরোয়ানা: মানব পাচারের সঙ্গে যদি অন্য কোনো দেশের সংশ্লিষ্টতা থাকে বা ওই দেশে কোনো সাক্ষী, অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ, বিবাদী বা অপরাধে সহায়তাকারী ব্যক্তি থাকে, তবে সেই দেশের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই করা যাবে।[২৫] তবে চুক্তি সই না হওয়া পর্যন্ত এমন যৌথ আইনি সহায়তা আদান-প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে পারবে। এ ছাড়া বিদেশে বসবাসরত কোনো বিবাদীর বিরুদ্ধে এ আইনের অধীনে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে এ অধ্যায়ে উল্লিখিত বিধানের অতিরিক্ত হিসেবে ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮-এর ৯৩ক, ৯৩খ এবং ৯৩গ ধারায় প্রক্রিয়া যতটুকু প্রয়োগযোগ্য ততটুকু প্রয়োগ হবে।

পতিতাবৃত্তির শাস্তি: কোনো ব্যক্তি কাউকে জোরজবরদস্তি করে বা লোভ দেখিয়ে পতিতাবৃত্তি অথবা অন্য কোনো প্রকারের যৌন শোষণের কাজে নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে দেশের অভ্যন্তরে আনলে অথবা দেশের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠালে তার অনধিক ৭ বছর এবং অন্যূন ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যূন ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড হবে।[২৬] এ ছাড়া কেউ পতিতালয় স্থাপন বা পরিচালনা করলে অনধিক ৫ বছর এবং অন্যূন ৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যূন ২০ হাজার টকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[২৭]

বেশ্যাবৃত্তির আহ্বানও দণ্ডনীয়: কোনো ব্যক্তি রাস্তায় বা জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে, ঘরের ভেতরে বা বাইরে কাউকে বেশ্যাবৃত্তির উদ্দেশ্যে কথা, অঙ্গভঙ্গি বা অশালীন ভাবভঙ্গি দেখিয়ে আহ্বান করলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে অথবা অনধিক ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[২৮]

---

২৩. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ২৪ (১)
২৪. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ২৫,২৬
২৫. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ৪১(১)
২৬. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ১১
২৭. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ১২ (১)
২৮. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ১৩

সম্পত্তি আটক ও ক্ষতিপূরণ: বিচার চলার সময় অপরাধীর সম্পত্তি আটকের আদেশ দিতে পারবে ট্রাইব্যুনাল। এ আইনে কোনো ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হলে ট্রাইব্যুনাল তার দেশে-বিদেশে অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে। এ বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি মানব পাচার প্রতিরোধ তহবিলে জমা হবে। এ ছাড়া কোনো অপরাধী দোষী সাব্যস্ত হলে ট্রাইব্যুনাল তদন্ত করে জরিমানার অতিরিক্ত হিসেবে পাচারের শিকার ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্যও অপরাধীকে আদেশ দিতে পারবে।[২৯]

পাচারকারীর শাস্তি: মানব পাচারে জড়িত থাকার বিভিন্ন পর্যায় তথা পাচার, সংঘবদ্ধ পাচার, প্ররোচনা, ষড়যন্ত্র, জবরদস্তিমূলক বা দাসত্বমূলক শ্রমে বাধ্য করা, পতিতাবৃত্তিতে বা যৌন শোষণের উদ্দশ্যে ইত্যাদি বিবেচনায় শাস্তিরও বহুমাত্রিকতা আইনে বর্ণিত হয়েছে। সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, বিভিন্ন মেয়াদে সশ্রম কারাদণ্ড এবং বিভিন্ন পরিমাণে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে।[৩০] এ ছাড়া আইনের অধীন অপরাধগুলো আমলযোগ্য, অ-আপসযোগ্য এবং অ-জামিনযোগ্য।

সরকারের করণীয়: সরকার পাচারের শিকার ব্যক্তিদের চিহ্নিত ও উদ্ধার করে এ আইনের অধীনে কাজ করবে। সরকার এ জন্য বেসরকারি সংস্থার সহায়তাও নেবে। কেউ বিদেশে পাচার হলে সরকার বাংলাদেশ দূতাবাস এবং পররাষ্ট্র কিংবা প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় তাকে ফেরত আনার উদ্যোগ নেবে। উদ্ধার হওয়া ব্যক্তি সরকার, পুলিশ বা বিশেষ তদন্ত ইউনিটের কাছ থেকে অপরাধীদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা এবং মামলার সর্বশেষ অবস্থার ব্যাপারে মাসে অন্তত একবার অবগত হওয়ার অধিকারী হবে।

আশ্রয়কেন্দ্র ও পুনর্বাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা: পাচারের শিকার ব্যক্তিদের শারীরিক ও মানসিক সেবা, পুনর্বাসন এবং পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার সারা দেশে পর্যাপ্তসংখ্যক আশ্রয়কেন্দ্র বা পুনর্বাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবে। এ ধরনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা সরকারের লাইসেন্স নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনা করতে পারবেন।[৩১]

প্রতিরোধ তহবিল: এ আইনের লক্ষ্য পূরণে বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে ব্যবহারের জন্য মানব পাচার প্রতিরোধ তহবিলও গঠন করা হবে।[৩২]

---

২৯. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ২৭ (১,৩)
৩০. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ৬-৯
৩১. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ৩৫ (১-২)
৩২. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, ধারা ৪২ (১)

মানব পাচার প্রতিরোধে ইসলাম

মানব পাচারের কারণ দেশ-কাল, পাত্র ও সমাজভেদে বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। ফলে এর প্রতিরোধের উপায়ও ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। বাংলাদেশে মানব পাচারের জন্য যে সব কারণ দায়ী সে সব কার্যকারণ সমাজ থেকে উৎপাটনে ইসলাম যে সকল বিধি-বিধান উপস্থাপন করেছে সেগুলো হলো:

এক. ইসলামের নিরাপত্তা ব্যাবস্থা

পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষ তার নিজের জীবনের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা লাভের অধিকারী। অন্যায়ভাবে কেউ কারো ব্যক্তিগত জীবনে হস্তেক্ষেপ করবে না ও হত্যা-নিপীড়ন করবে না। মানুষকে সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার জন্য এ অধিকার অত্যন্ত প্রয়োজন, যা মানবাধিকার সনদে স্বীকৃত। এর বিভিন্ন দিক হলো:

ক. জীবনের নিরাপত্তা: পৃথিবীতে মানুষের সুষ্ঠু-সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য ইসলাম দিয়েছে পূর্ণ গ্যারান্টি। এতে মানুষের জান-মালের নিরাপত্তার ব্যাপারে চমৎকার দিক-নির্দেশনা রয়েছে। এমনকি এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনও করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً﴾

নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের কারণ ব্যতিরেকে কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে হত্যা করল। আর কেউ কারও প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে রক্ষা করল।[৩৩]

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾

আর কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম, যেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার প্রতি আল্লাহর গযব ও অভিসম্পাত এবং তিনি তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।[৩৪]

সমাজে দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষের কারণে মানুষ যেন তাদের সন্তানদের হত্যা না করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ কুরআন মাজীদে কঠোরভাবে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন:

﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾

দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমি তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিযিক দেব।[৩৫]

---

৩৩. আল-কুরআন, ৫ : ৩২

৩৪. আল-কুরআন, ৪ : ৯৩

৩৫. আল-কুরআন, ৬ : ১৫১

বিষয়টি সূরা বনী ইসরাঈলের ৩১ এবং সূরা আন'আমের ১৪০ নং আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে। জাহেলী যুগে আরবরা তাদের কন্যা সন্তান জন্ম হওয়াকে সামাজিকভাবে অবমাননাকর কাজ বলে মনে করত। যার জন্য পিতা-মাতা তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অতি আদরের সন্তানদের জীবন্ত কবর দিতে দ্বিধা করত না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ- بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ﴾

যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?[৩৬]

ইসলাম কন্যা সন্তান হত্যার জঘন্য প্রথা নিষিদ্ধ করেছে। রাসূলুল্লাহ স. বরং কন্যাদের লালন-পালনের ব্যাপারে আরও উৎসাহ প্রদান করেছেন। রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، فَلَهُ الْجَنَّةُ

যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান লালন-পালন করল; তাদের উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দিল এবং বিবাহ দিল; এবং তাদের প্রতি উত্তমাচরণ করল, সে জান্নাতে যাবে।[৩৭]

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে,

مَنْ كَانَ لَهُ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ، يَعْنِي: السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى

যার দু'টি মেয়ে বা দু'টি বোন রয়েছে। অতঃপর সে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে, তাহলে ঐ ব্যক্তি এবং আমি জান্নাতে এভাবে পাশাপাশি থাকবো। একথা বলে তিনি তার তর্জনী এবং মধ্যমা আঙুল দেখালেন।[৩৮]

ইসলাম সকল সামাজিক কুপ্রথাকে পদদলিত করে কন্যাদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদার স্থানে অভিষিক্ত করেছে। ইসলাম কেবল অন্যায়ভাবে অপরকে হত্যা নিষিদ্ধ করেনি; বরং আত্মহত্যাও নিষিদ্ধ করছে। আত্মহত্যা সম্পূর্ণ অমানবিক ও অপ্রত্যাশিত, যা কুরআনে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

---

৩৬. আল-কুরআন, ৮১ : ৮-৯

৩৭. আবূ দাউদ সুলাইমান ইবন আল-আশয়াস ইবন ইসহাক আল-সিজিসতানী, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আবওয়াব আন-নাওম, পরিচ্ছেদ: ফী ফাযলে মান' আলা ইয়াতিমান, সিরিয়া: দারুল ফিকর, তা.বি., হাদীস নং ৫১৪৭, পৃ. ১৩৯৩; হাদীসটির সনদ যঈফ; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানি আবী দাউদ*, হাদীস নং-৫১৪৭

৩৮. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুসান্নাফ*, অধ্যায় : আল-আদব, পরিচ্ছেদ : আল-'আতফ আলা আল-বানাত, বৈরূত : আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১৪০৩ হি. হাদীস নং, ২৪৮৫০, খ. ৮, পৃ. ৩৬১; হাদীসটির সনদ সহীহ; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছিস সহীহাহ*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তা.বি., হাদীস নং-১০২৬

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾

তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না।[৩৯]

এ সম্পর্কে আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন:

الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ، وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ

যে ব্যক্তি ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে সে জাহান্নামে অনুরূপভাবে নিজেকে ফাঁস লাগাতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি বর্শার আঘাতে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে অনুরূপভাবে বর্শা বিঁধতে থাকবে।[৪০]

মানব ইতিহাসে হত্যার সূচনা হয় আদম আ.-এর পুত্র কাবীল কর্তৃক হাবীলকে হত্যার মধ্য দিয়ে। এ হত্যা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এসেছে:

﴿ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾

তুমি যদি তোমার হাত আমার দিকে প্রসারিত কর আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে, আমি কিন্তু আমার হাত তোমার দিকে তোমাকে হত্যা করার জন্য প্রসারিত করব না। কেননা আমি বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।[৪১]

এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে পৃথিবীতে সংঘটিত সকল হত্যার একটি অংশ কাবীল পাবে।[৪২]

ইসলাম একটি শান্তি, সম্প্রীতি ও মানবজাতির জন্য কল্যাণকামী পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ।[৪৩]

---

৩৯. আল-কুরআন, ৪ : ২৯

৪০. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-জানায়িয, পরিচ্ছেদ : বাবু মা যাআ ফী কাতলি আন-নাফস, বৈরুত : দারু ইবন কাসীর, ১৪০৭ হি., হাদীস নং ১২৯৯, পৃ. ৩৮৪

৪১. আল-কুরআন, ৫ : ২৮

৪২. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-দিয়াত, পরিচ্ছেদ : কাওলুল্লাহ ওয়া মান আহইয়াহা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩১০৮, পৃ. ৯৮৪
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عَلَيْه و سلم " :لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

৪৩. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-ঈমান, পরিচ্ছেদ : আল-মুসলিম মান সালিমা আল-মুসলিমুনা মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১০৮, পৃ. ৬

তাই ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি অপরিহার্য কর্তব্য এবং ঈমানি দায়িত্ব। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবনে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত ও সহিংসতাকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে; মানবতাবিরোধী সব ধরনের অন্যায় হত্যাযজ্ঞ, রক্তপাত, অরাজকতা ও অপকর্ম প্রত্যাখ্যান করেছে; সৎ কর্মে সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছে এবং জুলুম-নির্যাতনমূলক কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, দলমত-নির্বিশেষে মানুষের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চেতনা এবং অর্থনৈতিক দর্শন ও অপরাধ দমন কৌশল ইসলামকে দিয়েছে সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা। কিন্তু শান্তির ধারক-বাহক জনগণের বিরুদ্ধে সর্বদাই অশান্তিকামী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী দুর্বৃত্তরা খড়গহস্ত থাকে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾

তারা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, আল্লাহ ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের ভালোবাসেন না।[৪৪]

অতএব, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে মানব পাচার বহুলাংশে কমে আসবে।

খ. সম্পদের নিরাপত্তা: রাসূলুল্লাহ স.-এর আগমনের পূর্বে সম্পদের নিরাপত্তা বিধান ছিল না। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাস সর্বত্রই বিরাজ ছিল। তিনি সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করেছেন। তিনি বলেন:

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِه فَهُوَ شَهِيدٌ

যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করবে সে শহীদ হবে।[৪৫]

রাসূলুল্লাহ স. আরো বলেন:

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

যদি কোন ব্যক্তি জবরদস্তি করে এক বিঘত জমি দখল করে তা হলে রোজ কিয়ামতে সাত স্তর জমি তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে।[৪৬]

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন:

﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

---

৪৪. আল-কুরআন, ৫ : ৬৪

৪৫. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-মাযালিম, পরিচ্ছেদ : মান কাতালা দূনা মালিহি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৪৮০, পৃ. ৭১৭

৪৬. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-মাযালিম, পরিচ্ছেদ : মান যালামা শাইআন মিন আল-আরদি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৯৭৭, পৃ. ৯৪২

তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। **আর জেনে বুঝে** কোন মানুষের ধন, মালের কিয়দংশ অন্যায়ভাবেভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকের নিকট ঠেলে ফেলে দিওনা।[৪৭]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾

আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেছেন তোমরা আমানতসমূহ তার যোগ্য ও পাওনাদার ব্যক্তিদের নিকট পৌঁছিয়ে দাও।[৪৮]

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রাথমিক উপায় হিসাবে প্রাপ্ত সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়। এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার হুকুম হচ্ছেঃ ﴿ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ﴾ "যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়।"[৪৯] সুতরাং ইসলাম সম্পদের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করে।

গ. মর্যাদার নিরাপত্তাঃ ইসলামে সমাজের ধনী-গরিব, উঁচু-নিচু, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, মুসলিম-অমুসলিম সর্বস্তরের মানুষের যথেষ্ট মান-সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার বিধান রয়েছে। কোনো অবস্থায় কাউকে অবমাননা করা চলবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾

তোমাদের কোনো সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে যেন ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে।[৫০]

মানুষের জীবনের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. বিদায় হজ্জের ভাষণে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেনঃ

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا،

তোমাদের জান-মাল, ইয্যত আব্রুর উপর হস্তক্ষেপ তোমাদের জন্য হারাম করা হল। তোমাদের আজকের এই পবিত্র দিন, এই পবিত্র (যিলহজ্জ) মাস, এই শহর (মক্কা) যেমন পবিত্র ও সম্মানিত অনুরূপভাবে উপরোক্ত জিনিসগুলোও সম্মানিত ও পবিত্র।[৫১]

---

৪৭. আল-কুরআন, ২ : ১৮৮

৪৮. আল-কুরআন, ৪ : ৫৮

৪৯. আল-কুরআন, ৫৯ : ৭

৫০. আল-কুরআন, ৪৯ : ১১

৫১. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-হাজ্জ, পরিচ্ছেদ : আল-খুতবা আইয়্যামি মিনাহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৬২৯, পৃ. ৪৯৮

ঘ. বাসস্থানের নিরাপত্তা: ইসলাম বিনা অনুমতিতে কারো গৃহে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ করেছে। কারণ সকলে যেন তার নিজ নিজ গৃহে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে পারে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتاً غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ- فَإِن لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَا أَحَداً فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের বাড়ী ব্যতীত অন্যের বাড়ীতে মালিকের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদের সালাম না দিয়ে প্রবেশ কর না। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর ব্যবস্থা। হয়ত তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে। যদি তোমরা বাড়ীতে কাউকে না পাও তাহলে তাতে প্রবেশ করবে না; যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফিরে যাও, তবে তোমরা ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।[৫২]

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কারো বাড়ীতে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নিতে হবে। আর প্রয়োজন শেষে খোশ-গল্পের জন্য বসে না থেকে বিদায় নিতে হবে। কিন্তু আধুনিক সমাজে এমনকি মুসলিম সমাজেও কোন মেহমান বা আত্মীয়-স্বজন বাড়ীতে প্রবেশ করে বিনা প্রয়োজনে অযথা সময় নষ্ট করে গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টায় লিপ্ত হয়, যা ইসলাম সমর্থন করে না। আল্লাহ্ বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوْا وَلاَ مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ﴾

হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে ভোজনের জন্য নবী-গৃহে প্রবেশ কর না। তবে তোমাদেরকে আহ্বান করলে তোমরা প্রবেশ কর এবং ভোজন শেষে তোমরা চলে যাও; তোমরা কথাবার্তায় মশগূল হয়ে পড় না।'[৫৩]

তবে প্রয়োজন অনুযায়ী গৃহে বা পাশে অবস্থান করা যাবে এবং লেন-দেনও করা যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ﴾

নবী সহধর্মিনীগণের নিকট থেকে কোন বস্তু গ্রহণ করলে পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে নাও।[৫৪]

---

৫২. আল-কুরআন, ২৪ : ২৭-২৮

৫৩. আল-কুরআন, ৩৩ : ৫৩

৫৪. আল-কুরআন, ৩৩ : ৫৩

একইভাকে কারো গৃহে উঁকি-ঝুঁকি মারা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নবী করীম স. বলেন,

مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ

কেউ কারো ঘরের অভ্যন্তরে ঘরের বাসিন্দাদের অনুমতি ব্যতীত উঁকি মেরে তাকায়, তাহলে তার চোখ ফুটো করে দেওয়া তাদের জন্য বৈধ হবে।[৫৫]

দুই. ইসলামের দণ্ডবিধি প্রয়োগ

ইসলাম অন্যায়ের প্রতিরোধ কল্পে বিভিন্ন ধরনের দণ্ডবিধি প্রয়োগ করেছে, যার ফলে সমাজ থেকে অন্যায়, অবিচার, হত্যা, ধর্ষন ইত্যাদি দূরীভূত হবে। এর বিভিন্ন দিক হলো:

ক. জীবনহানী নিষিদ্ধ: প্রাণ রক্ষার স্বার্থেই ইসলামে প্রাণদণ্ডের বিধান। হত্যাকারী যদি নিশ্চিত হয় যে, মানুষ হত্যার শাস্তি হিসেবে তার প্রাণপাত ঘটবে না তাহলে সে মানুষ হত্যা তার রুটিন কাজে পরিণত করবে, হয়তো সামান্য স্বার্থের জন্যও মানুষ হত্যা করে পথের কাঁটা দূর করবে। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনের ঘোষণা:

﴿ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ﴾

আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না।[৫৬]

অন্যত্র বলা হয়েছে, ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

কিসাস বা বিচারিক প্রাণদণ্ডের মধ্যেই (সমগ্র মানবের) প্রকৃত প্রাণ নিহিত, হে বোধশক্তিসম্পন্নরা, যাতে তোমরা সাবধান হও।[৫৭]

আরও বিস্তারিত ও স্পষ্টভাবে আল্লাহ্ বলেছেন,

﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾

আর আমি এতে তাদের ওপর অবধারিত করেছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান ও দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমের বিনিময়ে সমপরিমাণ জখম। এরপর যে তা ক্ষমা করে দেবে, তার জন্য তা কাফফারা হবে। আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করবে না, তারাই জালেম।[৫৮]

---

৫৫. মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আদাব, পরিচ্ছেদ : তাহরিমি আন-নাযর ফী বাইতি গাইরিহি, বৈরূত : দারু ইহইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী, তা.বি., হাদীস নং ৪০২৩, পৃ. ১৫০৪

৫৬. আল-কুরআন, ১৭ : ৩৩

৫৭. আল-কুরআন, ২ : ১৭৯

৫৮. আল-কুরআন, ৫ : ৪৫

আয়াতদ্বয়ে কিসাস তথা হত্যার পরিবর্তে হত্যার বিধান ও নিহত-পক্ষের অধিকারের প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। অন্যান্য সূরা ও আয়াতে এবং হাদীসে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, হত্যা বা প্রাণহরণের প্রতিকার হলো অনুরূপ প্রাণদণ্ড প্রদান।

ইসলামের এ কিসাস বিধানে অমানবিক কিছু নেই; আছে সর্বাধিক মানবিকতা ও নিরেট বিশ্বমানবতার রক্ষাকবচ; যাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অযাচিত রহমত হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কুরআনের ভাষায়,

> ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾
>
> হে মুমিনগণ, নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কিসাস ফরজ করা হয়েছে। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী। তবে যাকে কিছুটা ক্ষমা করা হবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে, তাহলে সততার অনুসরণ করবে এবং তাকে সুন্দরভাবে আদায় করে দেবে। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হালকাকরণ ও রহমত। সুতরাং এরপর যে সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।[৫৯]

রাসূলুল্লাহ স. বিনা কারণে মানুষ হত্যাকে সবচেয়ে বড় গুনাহ্ অর্থাৎ জঘন্যতম অপরাধসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৬০] তিনি মারামারি ও সশস্ত্র ঝগড়া বিবাদ থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। কেননা তাতে অকারণ ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানবহত্যা সংঘটিত হয়ে যেতে পারে, যা কোনক্রমেই কাম্য নয়। এ সম্পর্কে নবী করীম স. বলেন, দুই জন মুসলিম তরবারি (মারণাস্ত্র) সহ পরস্পরের মুখোমুখী হয়ে পড়লে (একজন নিহত হলে), হত্যাকারী ও নিহত উভয় ব্যক্তিই জাহান্নামী হবে। নিহত ব্যক্তির জাহান্নামী হওয়ার কারণ কি? জিজ্ঞেস করা হলে রাসূলে করীম স. বললেন, إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِه কেননা সেও তো প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে উদ্যোগী ছিল। (অন্য জনের নিহত হওয়া তো হঠাৎ ঘটে যাওয়া ব্যাপার। তার পরিবর্তে তারই হাতে সেও নিহত হতে পারত।)[৬১]

---

৫৯. আল-কুরআন, ২ : ১৭৮

৬০. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সাহীহ,* অধ্যায়: দিয়াত, পরিচ্ছেদ: মান আহয়াহা .., হা. নং: ৬৪৭৭

عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال وشهادة الزور

৬১. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : ফিতান, পরিচ্ছেদ : ইযা ইলতাকা আল-মুসলিমানি বি সাইফিহিমা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩১, পৃ. ১৩

খ. অশ্লীলতাঃ মানব সমাজকে পূতঃপবিত্র এবং বিশৃংখলামুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে ইসলামে সকল প্রকার অশ্লীলতাকে হারাম করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾

আপনি বলুন, আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন- যা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গোনাহ, অন্যায়-অত্যাচার, আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোনো সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জান না।[৬২]

আল্লাহ্ তা'আলা সকল ধরনের অশ্লীলতা পরিহারের নির্দেশ প্রদান করে বলেন,

﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন- যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।[৬৩]

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী জাতিসমূহ অশ্লীল কাজ সম্পাদন করে তা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ হিসেবে চালিয়ে দিত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾

তারা যখন কোন মন্দ কাজ করে, তখন বলে আমরা বাপ-দাদাকে এমনি করতে দেখেছি এবং আল্লাহও আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন। আল্লাহ মন্দকাজের আদেশ দেন না। এমন কথা আল্লাহর প্রতি কেন আরোপ কর, যা তোমরা জান না।[৬৪]

আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিম জাতিকে মন্দ কাজ থেকে কেবল দূরে থাকতে আদেশই প্রদান করেননি; বরং এসব অশ্লীল কাজ থেকে জাতিকে দূরে রাখতে যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে নির্দেশও প্রদান করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, নির্দেশ করবে সৎ কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই হল সফলকাম।[৬৫]

---

৬২. আল-কুরআন, ৭ : ৩৩

৬৩. আল-কুরআন, ১৬ : ৯০

৬৪. আল-কুরআন, ৭ : ২৮

৬৫. আল-কুরআন, ৩ : ১০৪

অন্যত্র এ কাজকে মুমিনদের পারস্পরিক দায়িত্ব আখ্যা দিয়ে বলেন,

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের বন্ধু। তারা ভাল কাজের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে। যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।[৬৬]

আর এ ভিন্ন বা উল্টো চরিত্রকে মুনাফিকদের কর্ম হিসেবে চিত্রিত করেছেন। এ সম্পর্কে বলেন,

﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ ﴾

মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী, এরা (স্বভাব-চরিত্রে) একে অপরের মতোই। তারা পরস্পরকে অসৎকর্মের আদেশ দেয় এবং সৎকর্মে নিষেধ করে।[৬৭]

কোন নারীকে কটু কথা বলা, খারাপ ইশারা-ইঙ্গিত করা, হয়রানি করা, গালি দেয়া, ঢিল মারা, পথ রুদ্ধ করা যেমন অশ্লীল কাজ, তেমনি কোন নারী-পুরুষের বিকৃত স্থির ছবি বা নগ্ন ভিডিও ধারণ ও ছড়িয়ে দেয়া কিংবা প্রত্যক্ষ করা অশ্লীল কাজ। রাসূলুল্লাহ স. সবধরনের অশ্লীল কাজকে নিষেধ করে বলেন,

إِنَّ الْفُحْشَ وَالتَّفَاحُشَ لَيْسَا مِنَ الإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ، وَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ إِسْلَامًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

অশ্লীলতা এবং অশ্লীলতার প্রসার কোনটির ইসলামে ন্যূনতমও স্থান নেই। নিশ্চয়ই ইসলামে সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে যার স্বভাব-চরিত্র সবার চাইতে সুন্দর।[৬৮]

খ. ১. ব্যভিচার নিষিদ্ধ: ইসলাম অশ্লীল কাজ হিসেবে ব্যভিচারকে নিষেধ করেছে এবং এ অপরাধকে সব অপরাধের চেয়ে গুরুতর হিসাবে সাব্যস্ত করেছে। এ অপরাধের শাস্তি অন্য অপরাধের শাস্তির চেয়ে কঠোর করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾

ব্যভিচারিণী নারী এবং ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত কর।[৬৯]

---

৬৬. আল-কুরআন, ৯ : ৭১

৬৭. আল-কুরআন, ৯ : ৬৭

৬৮. আহমাদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ,* অধ্যায় : মুসনাদুল আশারাহ আল-মুবাশিশরীনা বিল জান্নাহ, অনুচ্ছেদ : আউয়ালু মুসনাদিল বাসরিয়্যিন, বৈরূত : দারু ইহইয়া আল-তুরাস আল-আরাবী, তা.বি., হাদীস নং ২০৪৩৫, পৃ. ৫২১৩; শু'আইব আল-আরনাউত হাদীসটির সনদটিকে সহীহ লি-গায়রিহী বলেছেন।

৬৯. আল-কুরআন, ২৪ : ২

ব্যভিচার সংক্রান্ত যত ধরনের পাপ কাজ সংঘটিত হয় সব লজ্জাস্থান বা যৌনাঙ্গের মাধ্যমে হয়ে থাকে। তাই রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন,

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

তোমরা দু'টি জিনিস তথা মুখ ও লজ্জা স্থানের দায়িত্ব নাও, আমি তোমাদের জান্নাতের দায়িত্ব নিব।[৭০]

আল্লাহ্ তা'আলা লজ্জাস্থান হিফাজতকারীকে ক্ষমা করার ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন,

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী নারী; আল্লাহর অধিক যিকিরকারী পুরুষ ও যিকিরকারী নারী তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।[৭১]

তাই আল্লাহ্ তা'আলা শুধু ব্যভিচারকে নিষিদ্ধ করেনি; বরং ব্যভিচারের নিকটবর্তী হতেও নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ আরও বলেন,

وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً

ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।[৭২]

রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ .....وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ،

সাত প্রকার লোককে আল্লাহ তা'আলা (কিয়ামতের দিন) তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দান করবেন। সেদিন আরশের ছায়া ছাড়া আর অন্য কোন ছায়া থাকবে না। (সেই সাত শ্রেণীর একজন) যে ব্যক্তিকে কোন সম্ভ্রান্ত বংশের সুন্দরী রমণী ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আহ্বান জানায় আর ঐ ব্যক্তি বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি।[৭৩]

সুতরাং পর্নোগ্রাফি ছবি বা অশ্লীল সিনেমা দেখাও ব্যভিচারের সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ায় নিষিদ্ধ। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন,

لِكُلِّ بَنِي آدَمَ حَظٌّ مِنَ الزِّنَا، فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ، وَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ، وَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ، وَالْفَمُ يَزْنِي، وَزِنَاهُ الْقُبَلُ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ

---

৭০. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-রিকাক, পরিচ্ছেদ : হিফযিল লিসান, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৬৪৭৪, পৃ. ১৯৮২

৭১. আল-কুরআন, ৩৩ : ৩৫

৭২. আল-কুরআন, ১৭ : ৩২

৭৩. মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *আস-সহীহ,* অধ্যায়: আল-যাকাত, পরিচ্ছেদ: ফাযল ইখফাইস সাদাকাহ, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ১০৩৩, পৃ. ৬৪৮

প্রত্যেক আদম সন্তানের যিনার একটি অংশ রয়েছে। চোখ দু'টি যিনা করে, চোখের যিনা দেখা। দুই হাত যিনা করে, হাতের যিনা ধরা। দুই পা যিনা করে, পায়ের যিনা হাঁটা বা চলা। মুখও যিনা করে, মুখের যিনা চুমা দেয়া। অন্তর ইচ্ছা করে এবং আশা করে। যৌনাঙ্গ তা বাস্তবায়ন করে কিংবা বিরত রাখে।[৭৪]

চোখের মাধ্যমে ব্যক্তি তার জন্য দেখা অবৈধ এমন নারীর সৌন্দর্য ও রূপ উপভোগ করে। পরবর্তীতে এরূপ কাজের প্রতি অন্তরে ভাবের সৃষ্টি হয়। আর এ পথ ধরেই শুরু হয় অশ্লীলতা।

খ. ২. পতিতাবৃত্তি ও পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা নিষিদ্ধ: ইসলাম ব্যভিচার, দেহব্যবসা, নগ্নতা, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও দেহপ্রদর্শনীকে নিষিদ্ধ করেছে। নারী পাচারের ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ অপরাধীদের উদ্দেশ্য থাকে পাচারকৃত নারীকে পতিতালয়ে বিক্রি করে দেওয়া। ইসলামে পতিতাবৃত্তি সম্পূর্ণ হারাম এবং কোনো নারীকে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা আরও বেশি অপরাধের শামিল। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾

তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব ধন-সম্পদের আশায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না।[৭৫]

তিনি আরো বলেন,

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾

আর তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয় তা অশ্লীলতা ও খারাপ পথ।[৭৬]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾

আর তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতার কাছাকাছি যেয়ো না।[৭৭]

---

৭৪. আহমাদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, অধ্যায় : মুসনাদুল 'আশারাহ আল-মুবাশিশরীনা বিল জান্নাহ, মুসনাদু আবি হুরাইরা রা., *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৮৩২১, পৃ. ২০৯২; আবুল ফারয আব্দুর রহমান ইবন আবিল হাসান আত-তাইমী (ইবনুল জাওযী), *যাম্মু আল-হাওয়া*, অধ্যায় : যাম্মু আল-হাওয়া, পরিচ্ছেদ : আল-বাবুল খামিসু ওয়াল 'ইসরুন ফি যাম্মিয যিনা, বৈরূত : আল-কিতাব আল-আরাবী, ১৯৯৯, হাদীস নং ৫৪৯, পৃ. ১৫৫; হাদীসটি বিভিন্ন সনদে একাধিক হাদীসগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। কিছু শব্দের পরিবর্তন ও কমবেশি ছাড়া প্রায় সকল সনদই গ্রহণযোগ্য। দ্র. ইমাম আল-আলবানী, *ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজি আহাদীছি মানারিস সাবীল*, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি., খ. ৮, পৃ. ৩৭, হাদীস নং- ২৩৭০

৭৫. আল-কুরআন, ২৪ : ৩৩

৭৬. আল-কুরআন, ১৭ : ৩২

৭৭. আল-কুরআন, ৬ : ১৫১

অতএব ইসলামে বেশ্যাবৃত্তির কোনো স্থান নেই এবং নারীদেরকে পণ্য হিসেবে ব্যবহারেরও কোনো বিধান নেই। বরং এ সবই ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। আর উপার্জনের দিক থেকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট উপার্জন হলো-পতিতাবৃত্তি। অর্থাৎ ঐ উপার্জন যা সে ব্যভিচারের মাধ্যমে তথা দেহ ব্যবসার মাধ্যমে অর্জন করেছে। রাসূলুল্লাহ স. কুকুর বিক্রিত মূল্য, পতিতা ও গণকের উপার্জন হারাম করেছেন।[৭৮]

আবূ জুহায়ফা রা. সূত্রে বর্ণিত, 'আমি আমার পিতাকে দেখেছি যে, তিনি একটি শিঙ্গা লাগানেওয়ালা গোলাম কিনলেন। তিনি তার শিঙ্গা লাগানোর যন্ত্র ভেঙ্গে ফেলতে নির্দেশ দিলে তা ভেঙ্গে ফেলা হল। আমি তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন,

إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْأَمَةِ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ

রাসূল স. রক্তের মূল্য, কুকুরের মূল্য, দাসীর (ব্যভিচারের মাধ্যমে) উপার্জন করা থেকে নিষেধ করেছেন। আর তিনি শরীরে উল্কি অঙ্কনকারী ও উল্কি গ্রহণকারী, সুদখোর ও সুদ-দাতার উপর এবং (জীবের) ছবি অঙ্কনকারীর উপর লানত করেছেন।[৭৯]

অতএব, যারা দেহ ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করে তাদের এ নিকৃষ্ট উপার্জন সম্পূর্ণভাবে হারাম। সুতরাং দেহ ব্যবসা বন্ধ হলে মানব পাচার অনেকাংশেই কমে আসবে।

গ. অঙ্গহানি নিষিদ্ধ: ইসলাম সৃষ্টির মৌলিকতার মাঝে কোনরূপ পরিবর্তনকে স্বীকৃতি প্রদান করে না। পবিত্র কুরআন এ কাজকে শয়তানের পরামর্শ বলে অভিহিত করেছে। আল্লাহ তা'আলা শয়তানের এ বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন,

﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴾

আর অবশ্যই আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, মিথ্যা আশ্বাস দেব এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ দেব, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ করব, ফলে অবশ্যই তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে। আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা তো স্পষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হল।[৮০]

---

৭৮. মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-মুসাকাত, পরিচ্ছেদ : তাহরীমু ছুমুনি আল-কালব, প্রাগুক্ত, হাদীস নং. ১৫৬৭, পৃ. ১০৯০

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ نَهَى عَنْ: ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

৭৯. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-বুয়ূ', পরিচ্ছেদ : ছুমুনি আল-কালব, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২০৯৬, পৃ. ৬৩৮

৮০. আল-কুরআন, ৪ : ১১৯

ইসলাম মানবদেহের কোনরূপ বিকৃতি ঘটানোকে অমানবিক ও গর্হিত কর্মরূপে চিহ্নিত করেছে। রাসূলুল্লাহ স. মুসলিমদেরকে যুদ্ধকালীন সীমালঙ্ঘন, অসদাচরণ, লুটতরাজ, মহিলাদের ইয্যত-সম্ভ্রম নষ্ট করা, অহেতুক কোন কষ্ট দেয়া ও আহতদের অঙ্গচ্ছেদ ঘটানো ইত্যাদি নিষিদ্ধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ স. জিহাদে সেনাপতি নিযুক্ত করে তাকওয়া অবলম্বন, সদ্ব্যবহার, খেয়ানত না করা, ধোঁকা না দেয়া, অঙ্গচ্ছেদন না করা, শিশু হত্যা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করতেন।[৮১]

আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ আনসারী রা. থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ স. লুটতরাজ এবং অঙ্গচ্ছেদ নিষেধ করেছেন।'[৮২] এছাড়াও নারী, শিশু, বৃদ্ধ, আহত ব্যক্তিদেরকে হত্যা, সন্ন্যাসী, নির্জনবাসী ও সন্ধি-প্রিয়দের সাথে বিরোধ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।[৮৩] ইসলাম যুদ্ধে শত্রুর মৃত্যু পরবর্তী কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকৃতিকে স্বীকৃতি প্রদান করেনি। এ বিধানকে 'মুছলা' বা অঙ্গ বিকৃতিকরণ বলা হয়। মুছলা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ এতে আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি ঘটে। ইসলামী শরী'আহয় যুদ্ধকালীন ও শান্তিকালীন উভয় সময়ে উন্নত চরিত্রের পরিচয় দিতে নিদের্শ দেয়া হয়েছে। ইসলাম মানুষকে সৃষ্টিজগতের মাঝে একটি বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্থান প্রদান করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ 'নিশ্চয় আমি আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি।'[৮৪] এ কারণে ইসলামী শরী'আহ মানুষের কোনরূপ অঙ্গ বিকৃতি অনুমোদন করে

---

৮১. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আবওয়াবু আদ-দিয়াত আর-রাসূলুল্লাহ স., *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ১৪০৮, পৃ. ৫৪০; হাদীসটির সনদ সহীহ; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানুত তিরমিযী*, হাদীস নং-১৪০৮;
عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، فَقَالَ: " اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ، اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا "

৮২. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মাযালিম, অনুচ্ছেদ : আন-নুহবা বি গাইরি ইযনি সাহিবী, হাদীস নং ২৪৭৪, পৃ.৭১৫
عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن النهبة والمثلة

৮৩. আবূ দাউদ সুলাইমান ইবন আল-আশয়াস ইবন ইসহাক আল-সিজিসতানী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-জিহাদ, পরিচ্ছেদ : দুআয়ি আল-মুশরিকীন, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ২৬১৪, পৃ.৭১৪; হাদীসটির সনদ যঈফ; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানি আবী দাউদ*, হাদীস নং-২৬১৪
حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ: " انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَغُلُّوا وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

৮৪. আল-কুরআন, ১৭ : ৭০

না। এমনকি ইসলামে পুরুষ ও নারী সবাই মৌলিক মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত। সুতরাং ইসলামের নির্দেশনা অনুসারে অঙ্গহানীর মাধ্যমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবসা থেকে বিরত থাকলে মানব পাচার লাঘব হবে।

তিন. ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধ ও সুবিচার

সামাজিকভাবে মানুষ সম্মান-মর্যদার অধিকারী। কেউ কারো মর্যাদা ক্ষুণ্ন করতে পারে না। ইসলাম মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি না করে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের তাকিদ দেয়। আর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কৌশল হলো সামাজিকভাবে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কেননা এর অভাবে দেখা যায়, অধিকাংশ লোকজন কঠোর পরিশ্রম, সৃজনশীলতা এবং উৎপাদনের জন্য অবদান রেখেও তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। ফলস্বরূপ তাদেরকে উদাসীন হতে হয় এবং তাদের উদ্যোগ, আন্তরিকতা, কঠোর পরিশ্রম এবং কর্মদক্ষতা সবকিছু ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৮৫] সমাজে বসবাসরত মানুষের মাঝে বৈষম্য দূর করে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা উন্নয়নের পূর্ব শর্ত। আল্লাহর বাণী,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচারণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের (এগুলো) মেনে চলার উপদেশ দেন, যাতে তোমরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো।[৮৬]

ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধের কয়েকটি দিক হলো:

ক. শিশুশ্রম নিষিদ্ধ: ইসলামের বিধান অনুযায়ী প্রতিটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য শিশুশ্রম নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا

যে আমাদের শিশুদের প্রতি দয়া-স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের শ্রদ্ধা করে না সে আমাদের মধ্যে গণ্য নয়।[৮৭]

---

৮৫. ড. এম উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, ড. মাহমুদ আহমদ অনূদিত (ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট-বিআইআইটি, ২০০০), পৃ. ৯০

৮৬. আল-কুরআন, ১৬ : ৯০

৮৭. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বির ওয়া আল-সিলাহ আন রাসূলিল্লাহ, পরিচ্ছেদ : মা যাআ আন রাহমাতি আল-সিবয়ান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৯১৯, পৃ. ৭২৩; হাদীসটির সনদ সহীহ; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানুত তিরমিযী*, হাদীস নং-১৯১৯ ·

শিশুরাই হলো দুনিয়ার সৌন্দর্য। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন :

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾

ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি বা শিশুরা দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য।[৮৮]

নারীদের মতো শিশুশ্রমিকদের তুলনামূলকভাবে অনেক কম মজুরি দিয়ে কাজ করানো যায়। এ কারণেই নিয়োগকারীরা শিশুদের কাজে লাগায় এবং বেশি করে খাটায়, যা শিশুদের দেহ-মনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ প্রসঙ্গে রাসূলল্লাহ স. সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন :

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا،

তোমরা সহজ পন্থা অবলম্বন করো, কঠোরতা আরোপ করো না।[৮৯]

ধর্মীয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত পরিবেশ না পেলে শিশুর যথার্থ বিকাশ সাধিত হয় না। রাসূলুল্লাহ স. অবহেলিত শিশুদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ও বিনোদনের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ধর্মে-কর্মে যথার্থ মানুষ হিসেবে গঠন করেছিলেন। তিনি শিশুদের প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। যে কোনো শিশুকে তিনি নিজের সন্তানের মতো আদর করতেন। তাই শিশুদের শারীরিক নির্যাতন না করে তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা অত্যাবশ্যক। রাসূলুল্লাহ স.-এর বাণীতে শিশুর সুন্দর নাম, সুখাদ্য, সুচিকিৎসা ইত্যাদির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সুন্দর নাম তার মর্যাদার প্রতীক, স্নেহ তার সম্মানের প্রতীক এবং সুখাদ্য তার সুস্বাস্থ্যের প্রতীক। সুতরাং একটি শিশুর বেড়ে ওঠা ও বিকশিত হওয়ার এসব উপাদানকে শিশুর অধিকার হিসেবে নিশ্চিত করা অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে ব্যক্তি সন্তান ও তার মায়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার ও তার ঘনিষ্ঠ জনদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাবেন।[৯০]

ইসলামের বিধান অনুযায়ী, প্রত্যেক শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য শিশুশ্রম নিষিদ্ধ। ইসলামের শ্রমনীতিমালা অনুসারে কাউকে তার সামর্থের বাইরে দায়িত্ব প্রদান করা সমীচীন নয়। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

---

৮৮. আল-কুরআন, ১৮ : ৪৬

৮৯. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-আদব, পরিচ্ছেদ : কাওলি আল-নাবী ইয়াসসিরু ওয়ালা তুআসসিরু, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫৬৭৩, পৃ. ১৮৭৭

৯০. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আস-সির আন রাসূলিল্লাহ, পরিচ্ছেদ : কারাহিয়্যাহ আল-তাফরীক আন আল-সাবী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৫৬৬, পৃ. ৬০৭; হাদীসটির সনদ হাসান; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানুত তিরমিযী*, হাদীস নং-১৫৬৬;

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

আল্লাহ কারও ওপর এমন কোনো কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যাতীত।[৯১]

কুরআনের আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ স.-এর হাদীসের শিক্ষা প্রয়োগে মানব পাচার রোধে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

খ. দাস প্রথার প্রতি নিরোৎসাহিত করণ : ইসলাম পরিকল্পিত উপায়ে দাস প্রথার প্রতি নিরোৎসাহিত করেছে, যাতে তা ক্রমান্বয়ে অবলুপ্ত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে দাসদের প্রতি ভদ্রজনোচিত ও সুবিচারভিত্তিক ব্যবহারের শিক্ষা দিয়েছে। দাসদের মনস্তাত্ত্বিক ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং তাদের মধ্যে মানবীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি সৃষ্টির জন্যে এই শিক্ষাই ছিল সর্বোৎকৃষ্ট বিধান। কেননা মানুষ একবার যখন মানবীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে তখন তারা এর দাবি ও দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে আর ভীত হয় না। দাসদের সাথে সদ্ব্যবহার এবং তাদের মানবীয় মর্যাদা ও সম্মান পুনরুদ্ধার পর্যায়ে মুসলিম জাতির ইতিহাস চরম বিস্ময়কর ও প্রশংসনীয় দৃষ্টান্তে ভরপুর। মদীনায় আগমনের পর বিশ্বনবী স. মুসলমানদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন তাতে করে তিনি আরব প্রভুদেরকে আযাদকৃত দাসদের ভাই বানিয়ে দেন। বিলাল ইবনে রাবাহকে ইবনু আবী রুওয়াইহার, যায়িদকে [যিনি স্বয়ং বিশ্বনবী স.-এর আযাদকৃত দাস ছিলেন] হামজার এবং খারিজা ইবনু যায়দ রহ. কে আবু বকরের ভাই বানিয়ে দেন। ভ্রাতৃত্বের এই সম্পর্ক রক্ত সম্পর্কের চেয়ে কোন অংশেই কম ছিল না। কেননা যাদেরকে একে অন্যের ভাই বানিয়ে দেয়া হলো তাদেরকে একে অন্যের উত্তরাধিকার বলেও গণ্য করা হলো।

ইসলাম দাসদেরকে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব এবং জাতীয় অধিনায়কত্বের পদও প্রদান করেছে। বিশ্বনবী স. যখন আনসার ও মুহাজিরদের নিয়ে একটি সেনাবাহিনী গঠন করেন তখন তাঁর সিপাহসালার (Commander in Chief) নিয়োগ করেন তাঁরই দাস যায়িদ রা.-কে। যায়িদের ইন্তিকালের পর তিনি এই দায়িত্বভার তারই পুত্র উসামা রা.-এর হস্তে অর্পণ করেন। অথচ এই সেনাবাহিনীতে আবু বকর রা. এবং উমর রা.-এর ন্যায় মহাসম্মানীয় ও সর্বজনমান্য আরব নেতৃবৃন্দও বর্তমান ছিলেন- যাঁরা তাঁর জীবদ্দশায় সুবিশ্বস্ত পরামর্শদাতা ছিলেন এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁরই স্থলাভিষিক্ত হন। এরূপে বিশ্বনবী স. দাসদেরকে শুধু স্বাধীন মানুষের মর্যাদাই প্রদান করেননি, বরং স্বাধীন সৈন্যদের সুউচ্চ নেতৃত্বের পদও অলংকৃত করার সুযোগ দিয়েছেন। উমর রা. যখন তাঁর স্থলাভিষিক্ত খলীফা পদে লোক নির্বাচিত করার প্রয়োজন অনুভব করেন, তখন বলেনঃ আবূ হুযাইফা রহ.-এর মাওলা (আযাদকৃত

---

৯১. আল-কুরআন, ২ : ২৮৬

গোলাম) সালিম এবং আবূ 'উবায়দাহ রহ. এ দুই ব্যক্তির একজন যদি আমার পর বেঁচে থাকে, তবে আমি এ দায়িত্ব তাকেই দিতাম।[৯২]

এতে করে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম প্রথম পর্যায়ে দাসদেরকে কেবল মনস্তাত্ত্বিক ও মানসিক দিক থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্যে তাদের সাথে উদার ও সহানুভূতিমূলক ব্যবহারের শিক্ষা প্রদান করেছে। এরই অনিবার্য ফলস্বরূপ তাদের মধ্যে মানবীয় মর্যাদার সঠিক চেতনা সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের অন্তরে হারানো স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার ইচ্ছা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। দাসদের এই মানসিক প্রশিক্ষণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাদের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রত করা এবং স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়ের সর্বাত্মক দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। এরূপে তারা যখন স্বাধীনতার জন্যে উপযুক্ততা অর্জন করে ঠিক তখনই ইসলাম বাস্তব ক্ষেত্রেও তাদেরকে আযাদ করে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করে। কেননা ঐ সময়েই তারা স্বাধীনতার জন্যে উপযুক্ত হয়ে উঠে এবং তা রক্ষা করার যোগ্যতাও তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা দাসমুক্তিকে হত্যাকাণ্ড হতে মুক্তির মাধ্যম করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

এটা কোনো মু'মিনের কাজ নয় যে, সে আরেকজন মু'মিনকে হত্যা করবে। অবশ্য ভুলবশত করে ফেললে তা ভিন্ন কথা। যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে ভুলক্রমে হত্যা করে, সে একজন মুমিন ক্রীতদাস (رَقَبَة مُّؤْمِنَة) মুক্ত করবে এবং রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে; কিন্তু যদি না তারা ক্ষমা করে দেয়। অতঃপর যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে মুমিন ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং যদি সে তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে এবং একজন মুমিন ক্রীতদাস মুক্ত

[৯২]. আবূ আব্দুল্লাহ শামছুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, বৈরূত : মুয়াস্‌সাসাতু আল-রিসালাহ, ১৪০৬ হি., পৃ. ৩৭
عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ مُسْتَنِدًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وعنده ابن عمر، وسعيد بن زيد: " اعْلَمُوا أَنِّي لَمْ أَقُلْ فِي الْكَلَالَةِ شَيْئًا في حديثه الطويل ...... ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: لَوْ أَدْرَكَنِي أَحَدُ رَجُلَيْنِ، ثُمَّ جَعَلْتُ هَذَا الْأَمْرَ إِلَيْهِ، لَوَثِقْتُ بِهِ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ

করবে। অতঃপর যে ব্যক্তি না পায়, সে আল্লাহর কাছ থেকে গোনাহ মাফ করানোর জন্যে উপর্যুপুরি দুই মাস সাওম রাখবে। আল্লাহ, মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।[৯৩]

সুতরাং পবিত্র কুরআনের বাণী ও সুন্নাহর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ডান হাতের অধিকারভুক্তদের সাথে তাদের অভিভাবকদের সম্পর্কটাকে অনেক আগেই জাহেলি যুগের দাসত্ব ও প্রভুত্বের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে বন্ধুসুলভ অভিভাবকত্বের পর্যায়ে উন্নিত করার পথনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ফলে দাস প্রথার মাধ্যমে মানুষ ক্রয়-বিক্রয়ের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়েছে। সমাজে এ শিক্ষা বাস্তবায়িত হলে মানব পাচার প্রতিরোধ সম্ভব।

চার. ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শক্তি

ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজের মৌলিক ভিত্তি হলো পরিবার। পরিবার ছাড়া মানুষ সত্যিকার অর্থে বাঁচতে পারেনা। পরিবারে মানুষ আশ্রয় পায়, একে অপরকে শ্রদ্ধা ও স্নেহ করে। পরিবার প্রধান পুরো পরিবারের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পরিবারের সকলের মধ্যে একটি সুদৃঢ় বন্ধন থাকে। ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শক্তির কয়েকটি দিক নিম্নরূপ:

ক. পরিবার একটি আশ্রয় দুর্গ: ইসলামে পরিবার ব্যবস্থা একটি সুরক্ষিত দুর্গের ন্যায়। পরিবারের সদস্যদের সতর্ক প্রহরায় প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গরূপ পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে সর্বপ্রকার অযত্ন, অবহেলা, অযাচিত হস্তক্ষেপ, অনাকাঙ্ক্ষিত অনুপ্রবেশ, নির্যাতন, নিপীড়ন, অভ্যন্তরীণ ও বহিশত্রুর আক্রমণ থেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করে চলে। পরিবার ছাড়া জীবনের যাত্রাপথে কোন নিরাপত্তা থাকে না। সামাজিক, মানবিক এবং আর্থিক ক্ষেত্রে মানুষ পরিবারেই সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা পেয়ে থাকে। পরিবার ছাড়া একটি শিশু নিরাপদ আশ্রয় পায় না। জীবনের শেষ পর্যায়ে যে মানবিক সেবা ও সহানুভূতি মানুষের দরকার তা পরিবারের বাইরে অন্য কোথাও ততটুকু পাওয়া যায় না। পিতৃ-মাতৃহীন এবং নিঃসন্তানদের নিরাপদ আশ্রয় হচ্ছে পরিবার। অসুস্থ, বিকলাঙ্গরা পরিবারে আশ্রয় পায়। পবিত্র কুরআনের নারীগণকে 'মুহসানাত' বলা হয়েছে। 'মুহসানাত' শব্দটির শব্দমূল 'হিসন' যার শাব্দিক অর্থ দুর্গ।[৯৪] পরিবারেই নারী সর্বাধিক নিরাপত্তা পেয়ে থাকে। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে পরিবার নামক দুর্গে মানব সন্তানকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান করা গেলে মানব পাচার কমে আসবে।

খ. দায়িত্ব ও কর্তব্যের সম্পর্ক: ইসলামী সমাজে পরিবার গঠনে স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব, তাদের পারস্পরিক আচার-আচরণ, সন্তানের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে। কারো দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। ইসলামে

---

৯৩. আল-কুরআন, ৪ : ৯২

৯৪. ইবনু মানযূর, *লিসানুল 'আরব*, বৈরূত: দারু সাদির, খ. ১৩, পৃ. ১১৯

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য, শিশু জন্ম হলে তার প্রতি পিতা-মাতার করণীয় সব কিছু নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামে পরিবার শুধু স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পরিবারের পরিসর আরও ব্যাপক। নিকটাত্মীয়স্বজনও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক, দয়া, করুণা এবং সহানুভূতি তো আছেই, বাড়তি দায়িত্বশীলতার প্রশ্নও জড়িত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা ও স্নেহ-ভালোবাসার বন্ধনের ওপর নির্ভর করে পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতি; স্বামী-স্ত্রী নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে চললে পারিবারিক পরিবেশ অনেকাংশে সুখ ও শান্তিতে ভরে ওঠে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারই হল মানুষ গড়ার মূল কেন্দ্র এবং সমাজ গঠনের প্রধান ভিত্তি। এ জন্য পরিবার গড়ার ব্যাপারে ইসলাম বিশেষভাবে যত্নবান হওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে।

ইবন উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ স. কে বলতে শুনেছি,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِه رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِه رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه

তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্ববান এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। তাই শাসক হলেন দায়িত্ববান, তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্ববান এবং তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের সম্পদের দায়িত্ববান, তার সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। গোলাম তার মালিকের ধন-সম্পদের দায়িত্ববান, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।[৯৫]

গ. শ্রদ্ধা ও স্নেহ-মমতা: পারিবারিক জীবনে বড়দের শ্রদ্ধা করা ও ছোটদের স্নেহ করা অতীব গুরত্বপূর্ণ বিষয়। যে পরিবারে বড়কে শ্রদ্ধা ও ছোটকে স্নেহ দেখায় না সে পরিবারে শান্তি বিরাজ করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا

যে আমাদের ছোটকে স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়কে শ্রদ্ধা করে না সে আমার উম্মত নয়।[৯৬]

---

৯৫. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : অসিয়াত, পরিচ্ছেদ : তাবীলু কাওলিহি তা'আলা মিন বা'দি ওয়াসিয়্যাতি ইয়ূসি বিহা আও দাইন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৫৬৪, পৃ. ৭৩৭

৯৬. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বির ওয়া আল-সিলাহ আন রাসূলিল্লাহ, পরিচ্ছেদ : মা যাআ আন রাহমাতি আল-সিবয়ান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৯১৯, পৃ. ৭২৩; হাদীসটির সনদ সহীহ; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানুত তিরমিযী*, হাদীস নং-১৯১৯

পরিবারে অসুস্থ, বিকলাঙ্গরা পরিবারে যতটুকু প্রীতি-স্নেহ পেয়ে থাকে অন্যত্র তা পায় না। এমনকি পরিবারের বাইরের অন্যান্য দরিদ্র-বঞ্চিতরাও পরিবারে উত্তমভাবে স্নেহাশ্রিত হয়। বস্তুত পরিবার গঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে-ভালোবাসা, আন্তরিকতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও স্নেহ ভাগাভাগি করা। আর মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

আর তার নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্যই তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া। চিন্তাশীল ব্যাক্তিবর্গের জন্য এর মধ্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।[৯৭]

পাঁচ. রাষ্ট্রের গৃহীত ব্যবস্থার প্রতি শরী'আহ্র সমর্থন

জগণের জীবন, সম্পদ ও মর্যাদার নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রপ্রধান কখনো কখনো আইনের কঠোরতা, আবার কখনো কখনো আইন প্রয়োগ স্থগিতকরণের অধিকার রাখেন। ইসলামী শরী'আতে তা 'আস-সিয়াসাহ' নামে পরিচিত। আস-সিয়াসাহ শব্দের অর্থ 'জনগণের কর্মকাণ্ডের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করা।' সিয়াসাত হচ্ছে, দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির পথ-প্রদর্শনের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ সাধন করা। সর্বোপরি সিয়াসাত হচ্ছে শাসক কর্তৃক জনকল্যাণের নিমিত্ত কোন বিধান প্রবর্তন করা। এর সপক্ষে কোন একক দলিল-প্রমাণ না থাকলেও তা সিয়াসাতের অন্তর্ভুক্ত।[৯৮] সিয়াসাত আল-আদিল বা ন্যায়পরায়ণ সিয়াসাত প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী শারী'আতে ওয়াজিব। কখনও কখনও এ শাসননীতি কঠোর শাস্তি দান, আবার কখনও কখনও শাস্তি মুলতবী বা লঘুকরণ করা হয়ে থাকে। তবে উভয় অবস্থায় সিদ্ধান্ত নেয়ার ভিত্তি অপরাধের মূলোৎপাটন করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।[৯৯]

ক. রাষ্ট্র-নির্ধারিত দণ্ড প্রয়োগঃ শিশু পাচার একটি সন্ত্রাসমূলক কাজ, যা মারাত্মক দণ্ডনীয় অপরাধ। এটি হত্যার নামান্তর। এটি জাতীয় জীবনে ফাসাদ ও বিপর্যয়ের

---

[৯৭] আল-কুরআন, ৩০ : ২১

[৯৮] আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০২ খৃ. , পৃ. ৩০-৪০

[৯৯] মুহাম্মদ আমীন ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আবদুল আযীয আদ-দামিশ্কী আল-হানাফী (ইব্ন 'আবেদীন), *রাদ্দু আল-মুহতার 'আলা আদ্-দুররি আল-মুখ্তার*, বৈরূত : দারু আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪১২ হি., খ. ৩, পৃ. ২০৩-২০৪

সৃষ্টি করে। আর ইসলাম এ জাতীয় অপরাধের জাগতিক ও পারলৌকিক উভয় জগতের শাস্তি বর্ণনা করেছে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে। ইরশাদ হয়েছে,

﴿ إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

যারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের সঙ্গে লড়াই করে এবং জমিনে ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি হত্যা কিংবা শূলে চড়ানো; অথবা তাদের হাত ও পা উল্টো দিক হতে কেটে ফেলা, কিংবা দেশ থেকে নির্বাসিত করা। এই লাঞ্ছনা ও অপমান হবে এ দুনিয়ায়, কিন্তু পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে।[১০০]

খ. সুবিচার প্রাপ্তির নিরাপত্তা বিধান : ইসলামের অন্যতম শিক্ষা হলো সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং সবাই যেন সুবিচার পায় একজন ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত সকলকেই তা নিশ্চিত করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

হে ঈমাদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তোমাদের চাইতে বেশী। অতএব, বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ কর্ম সম্পর্কেই অবগত।[১০১]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করো তখন ন্যায় পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট! আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।[১০২]

---

১০০. আল-কুরআন, ৫ : ৩৩
১০১. আল-কুরআন, ৪ : ১৩৫
১০২. আল-কুরআন, ৪ : ৫৮

ইসলামের আইন রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, শক্তিমান-দুর্বল, অভিজাত ও সাধারণ সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং পারিবারিক স্নেহ-মমতা, রাষ্ট্র নির্ধারিত দণ্ড প্রয়োগ এবং সুবিচার প্রাপ্তির নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করা মানব পাচাররোধক সূচক হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

মানব পাচার নিরোধক আইন ও ইসলামী দৃষ্টিকোণের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা

২০১২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন এবং মানব পাচার অপরাধের শিকার ব্যক্তিবর্গের সুরক্ষা ও অধিকার বাস্তবায়ন ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়নকল্পে আইনটি পাশ করা হয়। এটি ২০১২ সালের ৩ নং আইন। এ আইন অনুসারে মানব পাচারকারী ব্যক্তি এ অপরাধের জন্য অনধিক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অন্যূন ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যূন ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী এ অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অন্যূন ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যূন ৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এ কাজে প্ররোচনাদানকারী বা সহযোগী অনধিক ৭ বছর অন্যূন ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যূন ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। মানব পাচারের উদ্দেশ্যে কাউকে অপহরণ, গোপন অথবা আটক করে রাখলে অনধিক ১০ বছর অন্যূন ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যূন ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। পতিতাবৃত্তির জন্য কাউকে স্থানান্তর বা আমদানী করলে এ আইন অনুসারে অপরাধী অনধিক ৭ বছর এবং অন্যূন ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যূন ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। মুখের ভাষা বা অঙ্গভঙ্গি বা অশালীন ভাব-ভঙ্গি করে পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে আহ্বান জানালে তিনি অনধিক ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এ আইনের অধীন অপরাধসমূহের দ্রুত বিচারের উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, দায়রা জজ বা অতিরিক্ত দায়রা জজ পদমর্যাদার বিচারকের সমন্বয়ে যে কোন জেলায় মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইবুনাল গঠন করবে। ট্রাইবুনাল ১৮০ কার্যদিবসের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করবে। ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে ৩০ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করা যাবে। সবশেষে মানব পাচার আইনের সপ্তম অধ্যায়ের বিধিতে মানব পাচার প্রতিরোধে তহবিল গঠনের কথা বলা হয়েছে।

ইসলাম মানুষকে সৃষ্টির সেরা হিসেবে মর্যাদা দান করেছে। সে সাথে জীবন, সম্পদ ও বাসস্থানের নিরাপত্তা বিধান করেছে। ইসলাম বিভিন্ন দণ্ডবিধি প্রয়োগের মাধ্যমে জীবনহানী, অঙ্গহানী, অশ্লীলতা, ব্যভিচার, পতিতাবৃত্তি ও পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা এবং শিশুশ্রম ও দাস প্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। রাষ্ট্র ইসলামের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা বা প্রয়োগ করে সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, অশ্লীলতা প্রতিরোধ

করতে পারে। ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থা একে অপরের মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধন, স্নেহ-মমতা, শ্রদ্ধা, সম্মান এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে (যা উপরে আলোচিত হয়েছে)। মানব পাচারের বিরুদ্ধে ইসলামের সরাসরি বিধান না থাকলেও মানব পাচারের যে উদ্দেশ্য যেমন, অবৈধ ব্যবসা, জীবননাশ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রয়-বিক্রয়, পতিতাবৃত্তি, শিশুশ্রম ইত্যাদি সম্পর্কে ইসলামের রয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও নীতিমালা, যার প্রয়োগ এবং প্রতিপালনে মানব পাচারের মত অপরাধ দমন হবে।

অতএব, বাংলাদেশে প্রচলিত মানব পাচার আইন ও ইসলামের শিক্ষার মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে, মানব পাচার ও অপরাধ দমনে ইসলামী আইন, শিক্ষা ও মূল্যবোধের বিকল্প নেই। কেননা ইসলামী মূল্যবোধ মানুষকে অন্যায়-অবিচার থেকে বিরত রাখে। যার মনে আল্লাহ ও আখেরাতের বিন্দুমাত্র ভয় আছে সে কখনও এ ধরনের গর্হিত কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে না। খোদাভীতি ও শেষ বিচারের ভয় মানুষকে যেভাবে তাড়িত করতে পারে সেভাবে কোন আইন মানুষকে তাড়িত করতে পারে না। অপরাধের সকল দুয়ার উন্মুক্ত রেখে শুধু আইন করে অপরাধ রোধ করা যায় না। মানব পাচার রোধে ব্যক্তির মননে ধর্মীয় মূল্যবোধ অভাবনীয় প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষত ইসলামী মূল্যবোধ মানুষকে সকল প্রকার খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখে।

বাংলাদেশে মানব পাচার নির্মূলে সুপারিশমালা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মানব পাচারের বিরুদ্ধে আইনগত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নারী ও শিশু পাচার রোধে বিভিন্ন আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন, পুলিশ সদর দপ্তরে মনিটরিং সেল স্থাপন, স্থল ও বিমান বন্দরে বিশেষ তল্লাশি ব্যবস্থা, জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে কমিটি গঠন এবং উদ্ধারকৃত নারী ও শিশুদের পুনর্বাসনের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা ও কর্মসূচি নেয়া হয়েছে । তবুও এ বিষয়ে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ নেয়া যেতে পারেঃ

এক. মানব পাচার প্রতিরোধে বাংলাদেশে প্রণীত আইনটি সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা।

দুই. মানুষের মধ্যে পূর্ণ সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব । তবে আইনের চেয়ে সবার মধ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি নারী ও শিশু পাচার রোধে ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারে।

তিন. সীমান্তবর্তী এলাকায় শিশু ও নারী পাচার প্রতিরোধে ইলেকট্রনিক মিডিয়া, বিশেষ করে কমিউনিটি রেডিও'র মাধ্যমে জনগণ, স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের দলীয় আলোচনা সভার ফুটেজ তৈরি করে তা প্রচার করা যায় । এ ছাড়াও পথনাটক, ছবি প্রদর্শন, পোস্টার, লিফলেট বিতরণ ও বিলবোর্ড স্থাপন করে ব্যাপক সচেতনতা কার্যক্রম চালানো যায়।

চার. সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন, বই-পুস্তক, চলচ্চিত্র, মুদ্রিত সামগ্রী নানাভাবে নারী ও শিশু পাচারের ওপর জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান ও বাণী নিয়মিতভাবে প্রচার করতে পারে।

পাঁচ. পাচার প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের আওতায় গ্রাম, পাড়া বা মহল্লায় কোন অপরিচিত লোক দেখলে তার সম্পর্কে ভালোভাবে জানা এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় চেয়ারম্যান, মেম্বার, চৌকিদার অথবা থানায় অবহিত করার বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। যেসব সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা প্রতিরোধে কাজ করে তাদের সঠিক তথ্য দেয়া ও সহায়তা করাও কর্তব্য।

ছয়. বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্রের পরিচয় জানা এবং মেয়ের অভিভাবকের ছেলের পারিবারিক অবস্থান সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া প্রয়োজন। পাচারের পরিণতি সম্পর্কে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং পরিবারের সবাইকে সচেতন করা কর্তব্য। কাজের লোক নিয়োগ করার ক্ষেত্রে ছবি তুলে রাখা এবং প্রাক-পরিচয় যাচাই করে নেয়া আবশ্যক ।

সাত. বাড়ির শিশুকে নাম, ঠিকানা ও ফোন নাম্বার মুখস্থ করানো এবং অপরিচিত লোকের দেয়া কোন খাবার বা জিনিস যাতে গ্রহণ না করে সে বিষয়ে পরিবার থেকেই শিশুকে সচেতন করতে হবে ।

আট. স্থানীয় পর্যায়ে মসজিদের ইমামগণও এ ক্ষেত্রে এলাকাবাসীকে সচেতন করতে পারেন।

নয়. বাংলাদেশে মানব পাচারের কারণসমূহ দূরীকরণের লক্ষে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন বিশেষ করে দরিদ্রতা হ্রাস, অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিশীলতা রক্ষা ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো অতীব প্রয়োজন।

দশ. বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী যেহেতু মুসলিম তাই সচেতনতার সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে নাগরিকদের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটাতে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে ব্যবস্থা নেয়া অতিব সঙ্গত। সে লক্ষ্যে মানব পাচার রোধকল্পে জীবন, সম্পদ ও মর্যাদা রক্ষায় ইসলামের কঠোর ও সুস্পষ্ট নির্দেশনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এগার. মানব পাচার প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে কুরআন ও হাদীসসমৃদ্ধ বক্তৃতা, লেখা, সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করা যেতে পারে। সে সাথে জনগণকে শরী'আহ আইন পরিপালনে উদ্বুদ্ধ করা অতীব প্রয়োজনীয়।

উপসংহার

মানব পাচার মানবাধিকারের একটি চরম লঙ্ঘন এবং সভ্যতার প্রতি উপহাস, যা সমাজে দরিদ্রতা, অশিক্ষা, অজ্ঞতা, ইসলামী শিক্ষার অভাব, বিপুল জনসংখ্যা, আবাসন স্বল্পতা ইত্যাদি কারণে ঘটে থাকে। বাংলাদেশে এটি আজ জাতীয় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মানব পাচার প্রতিরোধে আইন প্রণয়ন করেছে এবং কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর জন্য রয়েছে আন্তঃমন্ত্রণালয় ও জেলা কমিটি গঠনসহ বিভিন্ন কর্মসূচী ও কর্মপরিকল্পনা। এতদসত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে, মানব পাচার দিন দিন বহুগুণে বেড়ে যাচ্ছে। মানব পাচার প্রতিরোধে ইসলামের রয়েছে যথার্থ শিক্ষা দর্শন ও দিকনির্দেশনা। ইসলাম মানুষের জীবনের নিরাপত্তা, সামাজিক মূল্যবোধ, পারিবারিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রের আইন-কানূন মেনে চলার প্রতি কঠোর নির্দেশনা এবং দণ্ডবিধি প্রয়োগের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করেছে। এজন্য ইসলামের নির্দেশনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সাধারণ জনগণ, জনপ্রতিনিধি, সমাজসেবী, পেশাজীবী, গণমাধ্যমকর্মী, ব্যবসায়ীসহ দেশের সকল বিবেকবান মানুষের স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসতে হবে। সুতরাং মানব পাচার প্রতিরোধে প্রচলিত আইন ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় নিঃসন্দেহে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১, সংখ্যা : ৪৩
জুলাই - সেপ্টেম্বর : ২০১৫

বুক রিভিউ

The Sharia and Islamic Criminal Justice in Time of War and Peace

(শান্তি ও সংঘাতে শরীয়া এবং ইসলামী দণ্ডবিধির ভূমিকা)

লেখক : এম. শরীফ বাসিউনি, স্কুল অব ল, ডি'পল বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ৩২, এভিনিউ অব দি অ্যামেরিকাস, নিউইয়র্ক, এনওয়াই ১০০১৩-২৪৭৩, ইউএসএ, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩৮৫

ভূমিকা

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন (Human Right Law, IHL) এবং মানবিক আচরণ ও সহায়তা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন (Humanitarian Law, HRL) মানবসমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং জীবন ও সম্পদ রক্ষার অন্যতম হাতিয়ার। মানবাধিকার মানুষের নৈতিক নীতি বা আদর্শের নাম। মানবাধিকার মানুষের আচরণের বিশেষ আদর্শ অর্থাৎ কিভাবে ও কী ধরনের আচরণ করা উচিত তা নির্দিষ্ট করে দেয়। মানবাধিকার সর্বদা মানুষের মৌলিক এবং অবিচ্ছেদ্য অধিকার বলে বিবেচিত এবং দেশীয় বা আন্তর্জাতিক আইনে আইনগত অধিকার হিসেবেও সর্বদা সংরক্ষিত হয়ে থাকে। যে কোন মানুষ কেবল একজন মানুষ হিসেবে এ সব অধিকার তার সহজাত, অবিচ্ছেদ্য ও মৌলিক অধিকার হিসেবে ভোগ করার সুযোগ লাভ করে। এ সব অধিকার জাতি-ধর্ম-নৃতাত্ত্বিক উৎস-ভাষা-স্থান বা অন্য যে কোন অবস্থা নির্বিশেষে সব মানুষের সহজাত অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। সর্বজনীন অধিকার হিসেবে মানবাধিকার যে কোন সময় যে কোন স্থানে কার্যকর বলে বিবেচিত। 'সবার জন্য সমতা'র নীতির ভিত্তিতে এ সব অধিকার সকলের জন্য প্রযোজ্য। তবে এ সব অধিকার সঠিকভাবে ভোগ করার জন্য আইনের শাসন এবং সকলের প্রতি সমানানুভূতি থাকা জরুরি। পাশাপাশি এর জন্য এমন একটি পরিবেশ প্রয়োজন, যেখানে সকলেই অপরের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বা করতে বাধ্য থাকে। এ সব অধিকার ভোগ থেকে কাউকে বঞ্চিতও করা যাবে না।[১]

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মানবিক আচরণ ও সহায়তা সংক্রান্ত আইন (International Humanitarian Law, IHRL) কতগুলো বিধির সমষ্টি। এ

---

১. http://en.wikipedia.com/wiki/Due-_process

সব বিধি সশস্ত্র সংঘাতের ফলাফল বা প্রভাবকে মানবিক স্বার্থে সীমিত রাখতে চায়। যারা শত্রুতা বা সংঘাতমূলক আচরণে (Hostilities) অংশ নেয়নি বা পূর্বে অংশগ্রহণ করলেও তাতে জড়িত থাকতে চায় না এ আইন তাদেরকে রক্ষা করতে চায়। উপরন্তু এ ধরনের আইন যুদ্ধাচরণের উপায় ও পদ্ধতিগুলোকে সীমিত করতে চায়। আন্তর্জাতিক মানবিক আচরণ আইন 'যুদ্ধের আইন' বা 'সশস্ত্র সংঘাত সম্পর্কিত আইন' (Law of armed conflict) হিসেবেও পরিচিত। আন্তর্জাতিক মানবিক আচরণ আইন আন্তর্জাতিক আইনেরই অংশ; আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্পর্ক নির্ধারণের বিধির সমষ্টি। আন্তর্জাতিক মানবিক আচরণ আইন সশস্ত্র সংঘাতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ ও ব্যবহার করা হয়। তবে এ আইন কোন রাষ্ট্র তার শক্তি ব্যবহার করতে পারবে কি না তা নিয়ন্ত্রণ (Regulate) করে না; সেই কাজটি বরং আন্তর্জাতিক আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্র অংশ করে থাকে, যা জাতিসংঘ সনদেরই অংশ। আন্তর্জাতিক মানবিক আচরণ আইন ১৯৪৯ সনের জেনেভা কনভেনশনের চারটি ধারায় পাওয়া যাবে। এ আইন জেনেভা কনভেনশন পরবর্তী আরো দু'ধরনের চুক্তির মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়েছে- যার একটি হচ্ছে যুদ্ধ বা সশস্ত্র সংঘাতের শিকার জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য আনীত ১৯৭৭ সনের অতিরিক্ত প্রটোকল এবং বিশেষ কিছু যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ কৌশল নিষিদ্ধকরণ এবং বিশেষ কিছু জনগোষ্ঠী ও সম্পদের সুরক্ষা দেয়া সংক্রান্ত প্রটোকলসমূহ।[২] আন্তর্জাতিক মানবিক আচরণ আইন মানবিক বোধ থেকে উৎসারিত এবং মানুষের কষ্ট লাঘবের লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে। 'এটি কতগুলো বিধির সমষ্টি, যেগুলো বিভিন্ন চুক্তি বা প্রচলিত রীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠেছে; উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ ও সম্পদকে সশস্ত্র সংঘাতের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা; উপরন্তু সংঘাতে লিপ্ত দু'পক্ষের ইচ্ছেমত যুদ্ধের উপায় ও মাধ্যম এবং পদ্ধতি ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করা'।[৩]

এ ভূমিকা আলোচনার পর মূল আলোচনা শুরু করা যায়। এম. শরীফ বাসিউনি ও তাঁর সহযোগীবৃন্দ শান্তি ও সংঘাতে, বিশেষত সংঘাত-উত্তর এবং অন্তর্বর্তীকালীন (Transitional) বিচারপ্রক্রিয়ায়[৪] আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং আন্তর্জাতিক

---

২ ১৯৫৪ সনের সাংস্কৃতিক সম্পদ সুরক্ষা সনদ, ১৯৯৩ সনের রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সনদ, ১৯৯৭ সনের এন্টি পারসোন্যাল মাইন ব্যবহার নিষিদ্ধ সংক্রান্ত অটোয়া সনদ এবং যুদ্ধ বা সশস্ত্র সংঘাতে শিশুদের জড়ানো সংক্রান্ত শিশু অধিকার সনদ বিষয়ক ২০০০ সনের ঐচ্ছিক প্রটোকল ইত্যাদি। ICRC, Advisory Service, On International Humanitarian Law, What is IHL, pdf, https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/ what_is_ihl.pdf

৩ ICRC, Advisory Service, On International Humanitarian Law, What is IHL, pdf, https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/what_is_ihl.pdfGএবং https://en.wikipedia.org/wiki/International_humanitarian_law

৪ Transitional justice, বা অন্তর্বর্তীকালীন বিচারব্যবস্থা বিচারিক ও অবিচারিক (judicial and non-judicial) এমন কিছু পদক্ষেপকে বলা হয়, যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার-

মানবিক আচরণ আইন এবং এর সাথে ইসলামের অপরাধ আইনের ভূমিকা নিয়ে বিশ্লেষণমূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধমালা তৈরি করেছেন। এ সব প্রবন্ধ বর্তমান গ্রন্থটি সৃষ্টির পেছনে মূল ভূমিকা পালন করে। তবে গ্রন্থটি প্রধানত জনাব শরীফ বাসিউনির অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল।

এম. শরীফ বাসিউনি একজন মিসরীয়-আমেরিকান মুসলিম। তিনি শিকাগোর ডি' পল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ল'-এর প্রফেসর এ্যামেরিটাস। তিনি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ইনস্টিটিউটের সভাপতি এবং ইটালীস্থ ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হায়ার স্টাডিজ ইন ক্রিমিনাল স্যায়েন্সেস-এরও সভাপতি। জনাব শরীফ বাসিউনি আলোচ্য গ্রন্থটি লিখেছেন সাম্প্রতিক বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে, যার পরস্পর বিরোধী দু'টি দিক সবিশেষ লক্ষণীয়। তিনি আলোচ্য গ্রন্থে সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্র অংশের সহিংস তৎপরতা এবং তার প্রতি কিছু কিছু মুসলিম ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ অথবা প্রচ্ছন্ন সমর্থনের সমালোচনা ও প্রান্ত পর্যালোচনা করেছেন। পাশাপাশি তিনি পাশ্চাত্যের ইসলাম ফোবিয়ারও সমালোচনা করেছেন, যারা কিছু মুসলিমের অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের কারণে একে ভিত্তি করে গোটা ইসলাম ধর্মকে খাটো করতে চায়।

"শান্তি ও সংঘাতে শরী'আহ এবং ইসলামী দণ্ডবিধির ভূমিকা" শীর্ষক এ গ্রন্থের মাধ্যমে লেখক সমসাময়িক বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘটিত সশস্ত্র সংঘাতের প্রেক্ষিতে উদ্ভূত বিভিন্ন বিষয়ে ক্ল্যাসিক্যাল সুন্নী মুসলিম আইনি ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি'র প্রয়োগ ঘটাতে চেয়েছেন। গ্রন্থটিতে লেখক বলেছেন, ইসলামের দণ্ডবিধি বা অপরাধ আইন সমসাময়িক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং মানবিক আচরণ ও সহায়তা বিষয়ক (Humanitarian) আইনের আদর্শের সাথে কেবল সামঞ্জস্যপূর্ণই নয়, একই সাথে এ আইন মুসলিম জাতিগুলোর জন্য ব্যবহার উপযোগীও। তিনি এ গ্রন্থের মাধ্যমে সংঘাত ও এর থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন বিষয়ে মুসলিম জাতিগোষ্ঠী এবং পাশ্চাত্য সমাজ, উভয়ের উপলব্ধিতে সমতা আনয়নের মাধ্যমে দুই সভ্যতার মাঝে বিরাজমান দ্বন্দ্ব ও বিরোধ কমিয়ে আনার দিক নিদেশনা দিয়েছেন বলে গ্রন্থটিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিকারের অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয় (redress legacies of human rights abuses)| যেমন, ট্রুথ কমিশন, আইনগত প্রক্রিয়া (criminal prosecutions), ক্ষতিপূরণ বা প্রতিকারমূলক কর্মসূচি এবং বিভিন্ন প্রকারের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার প্রভৃতি। সহিংস ও নিবর্তনমূলক অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে সামাজিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠাকালীন একটি রাজনৈতিক অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে Transitional justice এর উদ্যোগ নেয়া হয়। https://en.wikipedia.org/wiki/Transitional_justice

গ্রন্থটি একটি ভূমিকা এবং পাঁচটি অধ্যায় ও প্রতিটি অধ্যায় অনেকগুলো উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায় পাঁচটি হচ্ছে,

১. শরী'আহ, ইসলামী আইন (ফিক্‌হ) এবং আইনের মূলনীতিবিজ্ঞান (ইলমে উসূলে ফিক্‌হ[৫]);
২. ইসলামে মানবাধিকারের মৌলিক ধারণা এবং ন্যায়বিচারের স্থান;
৩. ইসলামের অপরাধ বিজ্ঞান ও দণ্ডবিধি;
৪. ইসলামের আন্তর্জাতিক আইন এবং মানবিক আচরণ ও সহায়তা বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইন;
৫. শরী'আহ, ইসলামী আইন এবং সমসাময়িক সংঘাত-উত্তর ও অন্তর্বর্তীকালীন বিচারব্যবস্থা।

প্রথম অধ্যায়টি মোট দশটি উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত। এগুলোর মধ্যে প্রথমটি ভূমিকা ও শেষেরটি উপসংহার; বাকিগুলো হচ্ছে,

০১. ফিক্‌হ ও আইনের মূলনীতিবিজ্ঞানের[৬] ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও কাল পরিক্রমা (Historical periods)

এখানে দুটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে,

১.১. ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হে অনারব ও অমুসলিম জাতিগোষ্ঠী এবং তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব এবং
১.২ ইসলামের আরব বৈশিষ্ট্য,

০২. শরী'আহর অর্থ এবং এর উপযোগিতা[৭],
০৩. ইসলামী আইন বা ফিক্‌হের অর্থ এবং এর ব্যবহারের ক্ষেত্র ও সুযোগ,
০৪. আইনের মূলনীতিবিজ্ঞান বা উসূলে ফিক্‌হ (এখানেও দুটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, ১. মাযহাব[৮] এবং ২. ইসলামী আইনের উৎস এবং এর স্তরবিন্যাস[৯],

---

৫. আরবীতে যথাক্রমে فقه এবং علم أصول الفقه
৬. অতঃপর আমরা একে বোঝার সুবিধার্থে 'উসূলে ফিক্‌হ' বলব।
৭. Scope
৮. পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ্‌, আলেমদের ঐকমত্য এবং কিয়াস (Analogy) এ চারটি বিষয়ের ভিত্তিতে ইসলামের ইতিহাসের প্রসিদ্ধ আইন বিশেষজ্ঞ তথা ইমামদের ইসলামী আইনের সবিস্তার ও বিশদ ব্যাখ্যা এবং এ বিষয়ে তাঁদের স্ব স্ব চিন্তাধারাকে পৃথক পৃথক মাযহাব (School of Thought) বলা হয়। ইসলামের ইতিহাসে অনেকগুলো মাযহাবের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে। তবে আলেম সমাজের সমর্থন, তাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা এবং শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতার ফলে এর মধ্যে চারটি এখনও মুসলিমদের মাঝে চালু রয়েছে। বাকিগুলো কালের পরিক্রমায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে।- গ্রন্থ পর্যালোচক
৯. Ranking

REG.NO.DA-6100 :: ISLAMI AIN O BICHAR :: JULY - SEPTEMBER : 2015 : Tk. 100/-